মহা-মিলন।

"বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণ,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।" রবীন্দ্রনাথ।

(১)

মিলিব মিলিব মনে করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই মিলিতে পারিতেছি না। সে আসে আসে, কিন্তু কাছে ঘেঁসে না। সে ভাল করিয়া হৃদয়ে বসিতে না বসিতে কোন্ অন্ধকার রাজ্যে যেন চলিয়া যায়! তাকে আমাতে কতই দূরত্ব রহিয়া গিয়াছে! একটু হাসিয়া, একটু চাহিয়া, একটু মধু ঢালিয়া, সে আবার কোথায় লুকাইয়া যায়। এমন করিয়া কি ঘরকন্না করা চলে?—হায়, এমন করিয়া কি ভালবাসার রাজ্য বিস্তার হয়?—হায়, এমন করিয়া কি খেলা যায়? কিন্তু সে কিছুতেই আমার বশ নয়,—কিছুতেই সে আমার কথা শুনে না! কিন্তু আমি কিছুতেই তার বশ নই। তবে বুঝি মিলন আর পৃথিবীতে ঘটিল না!

আমি বলি, যদি মিলিবে, তবে তুমি তোমার ঐ বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদ, ঐ গৌরব-আস্ফালন, ঐ উঁকি-ঝুঁকি-চাহনি, ঐ লজ্জা-বস্ত্রখানি, ঐ অহঙ্কার-গরিমা, ঐ লজ্জা আর ভয়, সব দূরে ফেলিয়া এস। তোমার মাথার ঐ বিদ্যার বোঝা, তোমার শরীরের ঐ ঐশ্বর্য্য-ভূষণ, তোমার চোখের ঐ কূট চাহনি, সব ফেলিয়া এস—সরল প্রাণে, খোলা হৃদয়ে, উলঙ্গ শরীরে এস। তা সে কিছুতেই শুনে না! পৃথিবীর দিন এমনি করিয়াই শেষ হইতেছে। হতাশ কাহিনী ফুরাইতে না ফুরাইতে,—ভাল করিয়া হৃদয়ে বসাইতে না বসাইতে, কে জানে কেন, প্রাণের প্রতিমাগুলি আঁধারে লুকাইয়া যাইতেছে! হায়, তবে মিলন কেমনে হইবে? হায়, তবে মেশামিশি কেমনে ঘটিবে?—আমি তা কিছুই বুঝি না।

তুমি রাজা, তুমি জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট,—আমি দীন দুঃখী গরিব প্রজা—আমার হৃদয়-ঘরে তোমার পদনিক্ষেপ অসম্ভব। তুমি বিদ্বান, তুমি জ্ঞানী—আমি মূর্খ অজ্ঞান—তুমি এ দরিদ্রের গৃহে আসিবে কেন? তুমি সুন্দর,

তুমি মনোহর, তুমি পুণ্যাত্মা,—আমি কুৎসিৎ পাপাত্মা।—পাপী, আমার দিকে চাহিবে কেন, আমার ঘরে বসিবে কেন? এঁকে, ওঁকে, তাকে, যাকে ধরিতে চাই, যার দিকে চাই, চকিত-হাসি হাসিয়া সেই আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়। বাসনের চাঞ্চল্যের সাধ মিটে নাই, মিটিবে না। চতুর্দিকে বৈষম্যের কোলাহল—কেহ কাকে চায় না,—কেহ কাকে ধরে না, কেহ কাকে ধরে তুলে না, খুঁজিয়া খুঁজিয়া অজ্ঞাত-সঙ্গীত গাইতে গাইতে—তোমার দিকে নয়ন গেল! কি জানি কেন, তোমাকে প্রাণ চাহিল! কি জানি কেন, তোমার জন্য প্রাণ অস্থির হইল! কি জানি কেন, তোমাকে ঘরে আনিবার জন্য সাধ যাইল! কিন্তু তুমি ত তাহা বুঝ না। আমার প্রাণের পিপাসা, হায়, তুমি ত বুঝিলে না; তুমি কিছুতেই দেখিবে না। আসিবে আসিবে বল, কিন্তু এস কই?—তুমি কেবল তুমিই লইয়া এস কই?—তুমি ভিতরে খাঁটি যাহা, তাহা লইয়া এস কই? আমি কপটতা ত চাহি না, পোষাক পরিচ্ছদ ত চাহি না—আমি প্রতারণা, ছলনা, ঠকের অলঙ্কার ত চাহি না। আমি চাই—সরলতা-মাখা ছানার পুতুল, স্বর্গের কুসুম—তোমার হৃদয়খানি। আমি টাকা চাই না, বিদ্যা চাই না, অহঙ্কার চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না—আমি চাই তোমার সরল হৃদয়খানি। কিন্তু তা পাই কই?—তুমি কিছুতেই তোমার আমিত্ব ছাড়িয়া আসিতে রাজি হইবে না। তবে আমি করি কি?

মিলন কি কথার কথা? হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ, শরীরে শরীরের মিলন সোজা কথা নয়। মধুর মিলন দেখ,—নদী মিলিয়াছে সাগরের সহিত;—প্রভাত-কিরণ-মাখা শিশিরবিন্দু মিলিয়াছে—ফুলের হৃদয়ে; সাগর নদীর স্বত্ব ভুলিয়াছে, ফুল সৌরভ ভুলিয়াছে, শিশির নিজত্ব ভুলিয়াছে। দেখ, স্বার্থ গিয়াছে, তাই মধুর মিলন হইয়াছে। আবার ঐ দেখ, শারদ জ্যোৎস্না-মাখা বায়ু মৃদু মৃদু বহিয়া নদীর জলকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ দেখ, অমিয় মধুর প্রভাত মিলনে বসন্ত-কানন কোকিল আত্মহারা হইয়া কেমন গাইতেছে। ঐ দেখ—পাহাড় আপন বুক বিদীর্ণ করিয়া কেমনে ঝরণাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে। এ সকলই যেন আপনাকে ভুলিয়া অপরের জন্য প্রাণ ঢালিতেছে। বায়ু বহিয়া বহিয়া ফিরিতেছে, চাঁদ উঠিয়া উঠিয়া দিতেছে, কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, ঝরণা কুল কুল রবে চলিয়া চলিয়া সাগরে ছুটিতেছে। তাহাদের শান্তি নাই, তাহারও

মান অভিমান নাই, কাহারও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে মন নাই। পরের জন্যই যেন সকলে ব্যস্ত। কিন্তু তুমি, হায়,—তুমি ভ্রমেও তোমার মানটুকু, লজ্জাটুকু, বিদ্যাটুকু, জ্ঞানটুকুর মমতা বিসর্জ্জন দিয়া এ ক্ষুধিত, এ পিপাসিত জনের প্রতি চাহিবে না! হায়, তবে আমি করি কি? তুমি কিছুতেই তোমার উন্নত অবস্থাটুকু, লজ্জাটুকু—পোষাকটুকু, পরিচ্ছদটুকু ছাড়িয়া আসিতে পারিবে না! মিলন কি সোজা কথা? হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ, জীবনে জীবন—মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। সে কি সামান্য কথা? উচু-নীচু-বোধ, দূরে-দূরে-আরো-দূরে-আরো-দূরে রাখে যে প্রবঞ্চনা-পোষাক বা অহংকার, এ সকল থাকিতে মিলন অসম্ভব। তাই ত মিলন নাই। তাই ত জগৎপুরে বিচ্ছেদের হাহাকার! তাই ত মানুষ বসিতে না বসিতে চলিয়া যায়! তাই ত মানুষ অসময়ে মরণকে স্পর্শ করিয়া নিবিয়া যায়! তাই ত আমার প্রাণ আজ অস্থির ও চঞ্চল। মিলনই যদি না ঘটিল, তবে এ পোড়া পৃথিবীতে থাকিয়া ফল কি, লাভ কি? কে বলিবে, ফল কি, লাভ কি?

২

মানুষ মানুষকে বড় ভয় করে। মানুষের নিকট মানুষের বড়ই অবিচার। দীন বৈরাগী, কোন্ কালে রাস্তা দিয়া যাইবার সময় একদিন একজন পথিককে গালিগালাজ দিয়াছিল, তারপর তার কত অনুতাপ অশ্রুপাত হইয়াছে, তারপর সে কত জনকে মিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিয়াছে, কিন্তু আজও দীন বৈরাগীর কথা উঠিলে লোকে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলে—"সেই ত দীনা, তাকে জানি।" মানুষ মানুষের সামান্য অপরাধও ভুলিতে পারে না। আবার অন্য দিকে, একজন লোক জলে ডুবিয়া মরিবার সময়, জগাই সাধু তাহাকে বাঁচাইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে জগাই গোপনে কত লোকের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, গোপনে কত খুন করিয়াছে, কিন্তু আজও জগাই সাধু বলিয়া জগতে পূজিত। এইরূপ, মানুষ মানুষের বাহ্যরূপ দেখিয়া মজে। জগতে সর্ব্বত্রই এইরূপ অবিচার চলিতেছে। প্রকাশ্যে একটী অপরাধ কর—চিরকালের জন্য মানুষের চক্ষে তুমি ঘৃণিত বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। পৃথিবীর বিচার এমনই। একটী সামান্য অবৈধ কাজ করিয়া কত লোক যে চিরকালের জন্য মানুষের নিকট হীনশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—কত লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়া রহিয়াছে, তাহার গণনা হয় না। এই অবিচারের ফলে,

মানুষ মানুষের নিকট অন্তর খুলিতে চায় না। এই অবিচারের ভয়ে সদা মানুষেরই প্রাণ সশঙ্কিত। এই অবিচার সহ্য করিতে না পারিয়া, হায় কত লোক কবি কীট্‌সের ন্যায় অসময়ে জীবন-লীলায় যবনিকা ফেলিতেছে। এই অবিচারের ভয়ে মানুষ কত বাহ্য পোষাক দিয়া অন্তরের সকল চাপা দিয়া রাখিতে চায়। ভিতরে তোমার শত সহস্র গলদ, ভিতরে তুমি পাপের কীট, কিন্তু বাহিরে ধর্মের পোষাক পরিয়া সাবধান থাকিও, তোমার আর কোন ভয় নাই! যাহারা সামাজিক শাসনের পক্ষপাতী, তাহারা প্রকারা-ন্তরে এইরূপে মানুষকে কপটাচারী হইতে পরামর্শ দেয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজের প্রধান কথাই এই—"যাহা ইচ্ছা কর; কিন্তু কাহাকেও জানিতে দিও না।" এই জন্য আজকাল লোক বড়ই চতুর হইয়া উঠিতেছে। লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেই হইল। ফাঁকি দেওয়া এখন-কার দিনে একটা ব্যবসায় মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা নয়, তাহাই অপরের নিকট প্রতিপন্ন করিতে সতত চেষ্টা করিতেছে। এখনকার দিনে, চরিত্র প্রতিপন্ন করিতে হয়, আদালত সাক্ষ্যে। এখনকার দিনে, চরিত্র প্রতিপন্ন করিতে হয়, লোকের খোসা-মুদী দ্বারা। তুমি ভিতরে যাহাই হওনা কেন, লোকে তোমাকে ভাল বলিতেছে ত? তবে আর তোমার কোন ভয় নাই। যেন-তেন-প্রকারেণ লোকের মুখের প্রশংসা পাইলেই হইল! খোসামুদীর বাজার চারিদিকে বসিয়া গিয়াছে; প্রতারণা, ছলনা, চাটুকারিতা, চরিত্র-বিনিময়ে লোকেরা কিনিয়া ঘরে ফিরিতেছে। আজ কালকার দিনে খাঁটী মাল আর বিকায় না। যাদের খাঁটী মালের ব্যবসা, তাহাদের ঘরে হাহাকার, হই চই পড়ি-য়াছে। খুব মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেও, খুব আন্দোলন ঢাক পিটাও, তবেই তোমার পচা মাল চলিয়া যাইবে! খুব খোসামুদী কর—তবেই এযাত্রা তুমি রক্ষা পাইবে! প্রশংসা পাইলেই হইল, তা যদি বড় লোকের হয়, তবে ত আর কথাই নাই। পার্থিব অহঙ্কারের জন্য অযাচিত খোসামুদী, বাহির-চটক্-জাঁক বা প্রতারণা চলিয়াছে। এই সময়ে খাঁটি মাল পাওয়া বড়ই কঠিন। চাপা দেও, সকল চাপা দেও, সবই ঢাকো,—বল, আর চুপ কি? এই জন্যই লোকেরা আসে যায়, কিন্তু বসে না। বসিলেও, যে আসে, ঠিক তাকে পাই না। আসিয়াই সে যেন কেমন হইয়া যায়। সে যেন কি ঢাকিতেছ, কি চাপা দিতেই ব্যস্ত। কি জানি কেন, সে সর্ব্বদা

কি যেন লুকাইয়া আমাকে ফাঁকি দিতেই চায়। তার চাহনিতে কেবলই কপটতা,—তার ভালবাসায় কেবলই স্বার্থকণ্টক বা খোসামুদী। সে কিছুতেই সরল প্রাণ বিনিময় করিবার জন্য সোজা হইয়া, উলঙ্গ হইয়া, পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া আমার হৃদয়ে বসিতে আসিবে না! হায়, তবে আর কি হইল?

একবারের অধিক, লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তুমি মিলনের সভায় যাও না কেন? মিলনের সভা? না—সে ত বৈষম্য বা অমিলের সভা। একটী লোকের সহিত যে প্রাণে প্রাণে মিলিতে পারে নাই, একটী লোক যার প্রাণের জিনিস হইয়া যায় নাই,—একটী সরল প্রাণে যে ডুবিতে পারে নাই;—সে দশ জন, বিশ জন লোকের মধ্যে ঝাঁপ দিবে, ডুবিবে, মজিবে?—অসম্ভব কথা। না, আমি প্রবঞ্চনা করিতে, নাম কিনিতে ঐ প্রবঞ্চনার সভায় যাইব না। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, পুণ্যের নামে পাপ, মিলনের নামে অমিলবাদ, সাম্যের নামে বৈষম্য কিনিতে আমি যাইব না। আসল মত ঢাকিয়া, বাহির-চটক অহং-মত প্রচার করিতে, তোমাদের মনস্তুষ্ট্যর্থ, আমি যাইব না। প্রবঞ্চনা বলিলাম? আমার রক্ত মাংস ছিঁড়িয়া দাও না। প্রবঞ্চনা নহে কি? স্বাধীন মতের যে লোকেরা আদর করিতে পারে না, ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধা বা আস্থা যাহাদের মোটে নাই;—যাহারা লোকের সামাজিক ত্রুটী ভুলিতে পারে না;—যাহারা উল্লাসে পরনিন্দা প্রচার করে বা বিশ্বাসকর্ণে পরনিন্দা শ্রবণ করিয়া লোকের প্রতি বিরক্ত হয়, যাহারা উদার নিষ্কলঙ্ক লোকের নামে কলঙ্ক আরোপণ করিয়াছে; ভ্রান্ত লোকের নামে আতঙ্ক-লজ্জা-ঘৃণা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে, তাহাদের সম্মুখে ঠিক হইয়া দাঁড়াইব?—বরং অপমানিত, গহন বনে একাকী ডুবিয়া মরিয়া যাই, সেও ভাল, তবুও ঐ প্রবঞ্চনায় আমি যোগ দিব না। আত্মার ত্রুটির প্রতি উপহাস করিবার জন্য যে বসিয়া রহিয়াছে, তুমি কখনই আশা করিতে পার না যে, সে তোমার নিকট তার মনের খাঁটী জিনিস বাহির করিয়া দিবে! খাঁটী জিনিষ বাহির করে কয় জন? সরল প্রাণের খাঁটী কথা বলে কয় জন?—কেবল বাহির লইয়া ব্যস্ত, কেবল প্রবঞ্চনায় বিনিময় হইতেছে। মিলনের জন্য চেষ্টা করিতেছ, একথা বলিলে বলিতে পার। চেষ্টা সকলেরই প্রশংসার জিনিস। কিন্তু ইহাকে মিলন-চেষ্টা বলে যে, তুমি অন্যের হৃদয়ে বসিবে না, অন্যকেও

তোমার হৃদয়ে বসিতে দিবে না? অন্যের মতের প্রতি একটুও শ্রদ্ধা করিবে না, অন্যকে একটুও ভালবাসিবে না, অথচ মুখে বলিবে, চেষ্টা করি। এ কিরূপ চেষ্টা? বিশ পঁচিশ বৎসর কেবল একতা-সাধন করিতেছ, কিন্তু কাজের বেলা দেখি—শূন্য।—মিলনের বেলায় দেখি, কেবলই শুষ্ক হাহাকার করিতেছে। বড় মিলনের জন্য বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিও না। একটু দূরে, একটু নির্জনে, একটু অন্তঃপুরে প্রেম-সাধন করিয়া লই, যদি সিদ্ধ হই, তবেই মুখ দেখাইব। বৃথা হই-চই করিতে আমাকে ডাকিতে বলিও না। একটী হৃদয়েও যাহার ফুল ফোটা ঘটে নাই, সে কেমনে ঐ হই-চই, ঐ হুজুগে ভালবাসার বাজারে ফুল কিনিতে যাইবে? না—আমি তা পারিব না।

যাদের দোষ ভুলিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে, তাদের নিকট হইতে একটু দূরে থাকাই ভাল। আমি দূরে দূরে থাকিয়া, তোমাদের ঐ সরল হাসি, ঐ সরল হৃদয়পট অঙ্কিত বিশেষত্বময় মহত্ত্বটুকু গ্রহণ করিব। কাছে মেশিলে তুমি কি যেন চাপিতে, ঢাকিতেই চেষ্টিত হও। ঢাকিবে বা না কেন? পৃথিবীতে যে অবিচার!! আমি ত তোমার মতের সম্মান করিতে শিখি নাই। আমি ত তোমার দোষ ভুলিতে পারি নাই। আবার কাছে বসিলে তোমার মত-শিশুগুলি অযত্নে অনাদরে ঢলিয়া পড়িবে। ছোট কলমের চারা, চায় একটু জল। মানুষের স্বর্গের মতগুলি, চায় একটু মধুর আদর, একটু মধুর উৎসাহ-বারি। তা ভিন্ন মত সজীব হয় না, বাঁচে না, হৃদয়ে থাকে না। উপেক্ষায়, অনাদরে মত বাঁচে না। হায়, আমার কত স্বর্গের মত যে এইরূপে অনাদরে মরিয়া গিয়াছে, তার সংখ্যা হয় না! এইজন্য এখন একটু সাবধান হইয়া বসিয়াছি। তাই এখন যার তার কাছে মন খুলিতে পারিতেছি না। একদিনে একবারেই ত সকলে বন্ধু হয় না! সজীব প্রেম দশ্ কাজেও ত আর বিশ্বপ্রেম রূপ ধরে না! একটু একটু, বিন্দু বিন্দু—শেষে অনন্ত। কেহ যদি মতের আদরই না করিল, তবে বসিয়া থাকিই বা কি? অন্যের উপকার হইবে? আমি তা বুঝি না। আমি বুঝি—কেবল নিজের উপকার। অন্যের উপকার আমি করিব,—এ অহঙ্কার সর্বনাশের মূল। আমি নিজে তাহারও কিছুই করিতে পারি না। আমার সকল মত গুলি মরিয়া যাইলে পৃথিবীর কোন উপকার হইবে বলিয়া আমি ভাবি না। আমি মতগুলিকে সজীব রাখিতে চাই। মতগুলি একটু হাঁস, একটু উৎ-

মত-বাগিচে যদি সজীব থাকে, তবেই মঙ্গল হইবে। আজ হউক, কাল হউক, পাঁচ শত বৎসর পরে হউক—সে বৃক্ষের ফল ভক্ষণে নরনারীর জীবন লাভ হইবেই হইবে। এখন আমি কেবল বাঁচিতে চাই। আমি কেবল অমর হইতে চাই। তোমার মঙ্গল, জগতের মঙ্গল, এসব কল্পনার খেলা লইয়া বড়মানুষ হইতে চাই না। যাহা আমি নই, তাহার বড়াই করিব কেন? আমি না বাঁচিলে এ সব আঁধার, শূন্য। আমি না বাঁচিলে জগতের মঙ্গলসাধন আকাশ-কুসুম। আমার মতগুলিকে রক্ষা করা, এবং আমাকে সজীব রাখা, একই কথা। মত ভিন্ন মানুষ নাই। মত যার আছে, সেই বাঁচিয়া আছে। যাহার স্বাধীন মত নাই, সে শ্মশানে ভস্ম হইয়া গিয়াছে!

কি সর্বনেশে, কি ভয়ানক অহংজ্ঞান!! কি ভয়ানক মান অভিমান-মূলক অহঙ্কার!!!

এই মত গুলিকে সজীব রাখিবার জন্য একটু নির্জন, একটু স্বজন চাই। একটু জীবন, একটু মরণ চাই। একটু আঁধার একটু আলো চাই। একটু সূর্য্যের উত্তাপ, একটু মেঘের বারি চাই। নির্জন ত পাইয়াছি;—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গভীর হইতেও গভীর নিস্তব্ধতাময় হইয়া গিয়াছে,—যে দিকে চাই, হু হু করে কেবল গভীর নিস্তব্ধতা! গভীর হইতেও গভীর! চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিয়া শ্মশানের আগুন-অক্ষরের শেষ-কাহিনী লিখিতেছে। তুমি নাই, সে নাই। কেহ মরিয়াছে, কেহ দূরে পলায়ন করিয়াছে! কিন্তু প্রতারণা-শূন্য স্বজন কিছুতেই পাই না। সে আসে আসে, আসে না; সে কথা বলে বলে, বলে না। কি জানি কেন, সে আমার মতের প্রতি একটুও উৎসাহ-বারি ঢালে, ঢালে, ঢালে না। সে বড়ই অন্যমনস্ক। সে বড়ই চতুরতা শিখিয়াছে। সে বড় মানুষের ভয়ে ভয়ে চকিতের ন্যায় না দেখিয়া, না মজিয়া উড়িয়া যায়। তার প্রাণ সরলতা মাখা পাই না; সে আজও দেহ ঢাকিয়া, প্রাণ ঢাকিয়া আমার কাছে বসিতে চায়। মানুষের এতই ভয়! আমার ভয়ে সে আমার কাছে প্রাণ খুলে না! একজনও খুলে না! কি সর্বনাশ! একজনও প্রাণ-বিনিময় করে না। মত-শিশু গুলিকে বাঁচাইবার জন্য একটু স্বজনের প্রয়োজন, একটু ভালবাসার প্রয়োজন, একটু স্নেহ-বারির প্রয়োজন। তা কিছুতেই পাই না। এই সংসার আঁধার হইয়াছে, তাতে কোনই ক্ষতি নাই, কিন্তু মরুভূমি হইল কেন? এই বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবী নীরব হইল, তাতে একটুও ক্ষতি নাই, কিন্তু একটু সরল স্বজন পাই

না কেন? একটু ভালবাসা চাইই। একখানি পা রাখিবার স্থান চাইই। কেবল একবার দেখিব। কেবল একবার মিলিব। এমন ভাবে মিলিব যে, একবার ডুবিলেই অমনি প্রেমের অনন্ত ধারা উন্মুক্ত-দ্বার হইয়া যায়। যে একটু আবরণ রহিয়াছে, যে একটু প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, ঐটুকু উড়িয়া গেলেই হয়। তবেই আমি জগতের হইতে পারি। তবেই আমাকে জগতে মিলাইতে পারি। আবার প্রেমের চাবি খুলিয়া দিতে, আমার অন্তর্নিহিত গুলিকে বাঁচাইয়া তুলিতে, আমাকে অনন্ত প্রেমসাগরের কূলে লইয়া যাইতে—কেবল একটী প্রেম-প্রতিমা চাই! আমি অনেকক্ষণের জন্য চাই না—একবার, এক মুহূর্ত, তবেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। কিন্তু মানুষ এমনই ভীত এবং চতুর—খোলা প্রাণ লইয়া, স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া, পদ্মপত্রের শিশিরকণার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া, কেহই আদর্শ প্রতিবিম্ব দেখাইতে কাছে ঘেঁসে না। সে আসে বটে, কিন্তু মানুষের ভয়ে ভয়ে সে প্রাণ খুলে না। সামাজিক শাসন, লোকের শাসন, বন্ধুদের কি ভয়ানক অনিষ্ট সাধিতেছে! পৃথিবী প্রবঞ্চনার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে; ভালবাসা—স্বপ্ন, অলীক, আঁধার! মিলন—বিচ্ছেদ-বাণ নিক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত; —সর্ব্বাঙ্গ, হিংসা বিদ্বেষের দাবানলে দগ্ধীভূত। সংসারে তবে আর বুঝি আমার থাকা হইল না! সেও আসিবে না, আমিও যাইব না। আমার অহংজ্ঞান, এবং তার অহংজ্ঞান—বড়ই মিলনের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। মিলনের প্রধান শত্রু অহংজ্ঞান। এইটুকু না ভুলিলে মিলন অসম্ভব।

(৩)

"We must be lovers, and at once the impossible becomes possible."

আয় প্রকৃতি, তবে নিঃস্বার্থ প্রেম লইয়া তুই আমার কাছে আয়। আয় আঁধার, আয় আলোক, আয় চাঁদ, আয় সূর্য্য, আয় তোরা সকলে আমার কাছে আয়! আয় প্রকৃতি, তুই তোর অন্তঃকরণ লইয়া আমার কাছে আয়। আঁধার, তুই আমাকে ঢাক্, আমার অহংজ্ঞান নির্ব্বাণ কর। স্বর্গের জ্যোতি, তুই জগতের উজ্জ্বল রূপ সম্মুখে ধর। আঁধারে আঁখির ডুবাইয়া, আলোকে ইহজগৎ এবং পরজগৎকে দেখিব। দেখিতে দেখিতে, মরণের অতীত হইয়া যাইব! ইহকাল ও পরকাল এক প্রেমে বাঁধা পড়িবে। চাঁদ, তুই তোর ঐ অমিয় ধারা, ঐ প্রেম-জ্যোৎস্নায় আমার হৃদয়কে স্বচ্ছ করিয়া দে! তুই যেমন জগতের, আপন ভুলিয়া

জগতের, আমাকেও তেমনই করিয়া দে! আয় সূর্য্য, তোর ঐ অনন্ত উত্তাপে আমাকে জীবন্ত শক্তিবলে মাতাইয়া তোল্। জীবনী শক্তি— একমাত্র তোরই আছে। বাঁচা, আমাকে বাঁচাইয়া তোল্। জগৎ আমার নাই বা হইল, কেহ আমার ধারে নাই বা আসিল;—আমি তোদের প্রেমে দীক্ষিত হইয়া ঐ জগতে যাইব,—ঐ জগতে নামিব, ঐ জগতে সুধা ঢালিব! ভাল মন্দ সব ভুলিব। বিষ্ঠা চন্দন সমান হইবে। আয় চাঁদ, আয় সূর্য্য, তোদের ঐ আপন-পর-ভুলানে, ভালমন্দ-সমান-জ্ঞানের তত্ত্বসুধায় আমাকে মাতাইয়া দে। সাধে কি প্রকৃতির মিষ্ট হাসি আমার ভাল লাগে?—অবশ্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সাধে কি প্রকৃতি আমাকে টানিতেছে? কে যেন তাকে এমনই করিয়া আমাকে টানিতে ব'লে দিয়াছে! হাসি, হাসি, তোদের ঐ মিষ্ট হাসি শুধুই হাসি নয়। ঐ হাসির মূলে প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ। তোদের ঐ সৌন্দর্য্য, ঐ মধুরিমা উদ্দেশ্য-শূন্য নয়। মানুষকে কোন গভীর তত্ত্বে লইয়া যাইবার জন্যই তোদের এত মুখভরা হাসি! জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য, প্রেম-বিহ্বল করিবার জন্য তোদের এত নাচুনি, আর এত হাসি। গোপালের হাসিভরা সৌন্দর্য্য, চাঁদের সুধামাখা হাসির কোমলতা, পাপীয়ার মধুভরা সঙ্গীতের কমনীয়তা, উৎসের জীবনভরা মৃদু মধুর তান, মেঘ-ভরা আকাশের ক্ষণবিদ্যুৎ—হায়, সকল মিলিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল! আমি কি থাকিতে পারি? —থাকা হইল না। প্রাণ অস্থির হইয়াছে। হৃদয় ছটফট করিতেছে। কি যেন আরো চাই, আরো চাই, কিন্তু পাই না। ইচ্ছা হয়, ছুটিয়া ছুটিয়া ঐ অনন্ত গগনে উঠিয়া, ঐ চাঁদকে, ঐ বিদ্যুৎকে আলিঙ্গন করিয়া এ তাপিত হৃদয়কে শীতল করি। অনন্ত না ছুঁইলে আমার প্রাণ আর বোঝ মানে না। অনন্ত আলিঙ্গনের জন্য প্রাণ পাগল হইয়াছে। আমি প্রকৃতির সহবাসে মজিয়া কি যেন হইয়া গিয়াছি! সাধ, সাধ, অনন্ত সাধ। পিপাসা, পিপাসা, অনন্ত পিপাসা। সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। না—কেবল তাতেও তৃষ্ণা মিটে না। জগতের অতীত স্থানেও প্রাণ যাইতে চায়। জরা মরণের পরপারে ঐ যে আত্মময় জগৎ, ও জগতেও যাইতে চাই। তবে আমি ইহজগতে যাই, তবে আমি পরজগতে ডুবি। তবে আমি অনন্ত জগতে একবিন্দু মিশাইয়া যাই। শিশিরকণা সাগরে মিশিয়া যাউক। ভালবাসা না পাইয়া ভালবাসিব,

রূপ না দেখিয়া মজিব, পরিচয় না লইয়া আত্মদান করিব,—যে মরণের পরপারে, তাকেও সমান ভাবে প্রাণ বাসিব, আমি এই চাই। ভালবাসা পাইয়া যে ভালবাসে, রূপ দেখিয়া যে মজে, পরিচয় লইয়া যে আদর করে, সে স্বর্গীয় প্রেমের মর্ম্ম বুঝে নাই। এ জগতে শ্রেষ্ঠ প্রেমিক—চন্দ্র, সূর্য্য, তারা-ভরা ঐ প্রকৃতি। কেহ তাদের চায় না, কেহ তাদের ভালবাসে না, কিন্তু তাঁরা সকলের,—তাদের রূপ সকলের জন্যই যেন অধীর!! চেয়ে চেয়ে, শুধু চেয়ে চেয়ে সারাদিন, সারা রজনী—আসে আর যায়। এত ভালবাসা, এত উদার প্রেম—আর কার আছে? প্রকৃতিটা অসীম অনন্তে পরিব্যাপ্ত!

কিন্তু লোকে বলে প্রকৃতি জড়! প্রকৃতি কি তবে জড়-প্রেমিক? যদি তাই হয়, তবে আমারও জড় হইবার সাধ। আমি চেতনা চাই না, আমি জীবন চাই না। জীবন-মমতা-মুক্ত না হইতে পারিলে এমন নিঃস্বার্থ প্রেমিক হওয়া যায় না, তাইত প্রকৃতি জড়! আমিও জড় হইয়া আপনাকে জগতের করিব। জড় যদি এত মধুর, এত জীবনপ্রদ, এত প্রেম বিহ্বল, তবে জড় হওয়াই মহত্ব। জড়ই মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠ মহত্ব। কেন বলিতেছি? জড়ের নিজের কোনই ইচ্ছা নাই। তার হাসি, তার ইচ্ছাকৃত নয়। তার ক্রন্দন, ভীতি-প্রযুক্ত নয়। তার নিত্য-বিকাশময়-রূপ, অহঙ্কার-প্রসূত মোটেই নয়। কাহারও ইঙ্গিতে যেন সে চলে, সে হাসে, সে কাঁদে, সে জীবন রূপ ধরে। মানুষের প্রকৃত মহত্ব তখনই, যখন সে ইচ্ছাকে ডুবাইয়া সেই মহতী ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে ও চলিতে পারে। মানুষ ক্ষুদ্র তখনই, যখন নিজের শক্তিতে মত্তায়মান, নিজের ইচ্ছায় চলে; মানুষ মহৎ তখনই, যখন সেই মহতী ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সে দাঁড়ায়, সে চলে। জড়ের ইচ্ছা নাই, তাই জড় মহত্বের খনি। প্রকৃতি জড়, তাই প্রকৃতি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-মহত্বের প্রতিকৃতি! আর মানুষ চেতনা পাইয়াও অতি ক্ষুদ্র, অতি নীচ, যখন সে নিজ ইচ্ছায় চলে। আর যখন ইচ্ছাকে ইচ্ছা মিশাইয়া, জড়ের ন্যায়, মানুষ তাঁর অনুবর্ত্তী হয়, তখন মানুষ মহান হইতেও মহান। মানুষ তখন প্রকৃতির রাজা;—মানুষ তখন জগতের সেরা! ঐ দেখ, ইচ্ছাকে ডুবাইয়া, খ্রীষ্ট, নানক, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য জগতে কি আধিপত্য, কি রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন! ইচ্ছা-বিসর্জ্জিত, অহংজ্ঞান-নির্ব্বাপিত মানবই প্রকৃত প্রেমিক। জড়ের ন্যায় প্রেমিক আর নাই;—না; জড়, জড় নয়!—জড়ের

মূলে, আরো মূলে, আরো মূলে যাও—সেখানে আদিশক্তি অথবা প্রেমরূপিণী মা রহিয়াছেন। জড়, জড় নয়,—জড় মায়েরই শক্তি, মায়েরই রূপ—মায়েরই প্রেমের লীলা! মানুষ যখন অহংজ্ঞান (egotism) বিসর্জ্জন দিয়া, এমনই করিয়া লীলাময়ীর হাতের পুতুলের ন্যায় হয়,—তখন মানুষ,—সমস্ত পৃথিবীর পাদচারণার জন্য, ঐ প্রকৃতির ন্যায়, আপন উদারবক্ষ পাতিয়া দেয়। মানুষ তখন জগতে পরিব্যাপ্ত। মানুষ এবং জগৎ, তখন একই হইয়া যায়। অহং তখন অনন্ত-বিস্তৃত। ইহকাল পরকাল, তখন একাকার। কারণ সবই একে স্থিতি করিতেছে।

জড়-প্রকৃতির দাস হইয়া, ঐ জড়ের ন্যায়, অহংজ্ঞান-বর্জ্জিত হইতে, এবার বাসনা করিয়াছি। ঐ চাঁদ যেমন সারা রাত্রি জগতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শুধু হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়, আমিও সেইরূপ ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শুধু হাসিয়া হাসিয়া আত্মহারা হইয়া চলিয়া যাইব! আমি সাগরে ভাসিব, আমি পাষাণে মজিব, আমি চাঁদে জলিব, আমি ফুলে ডুবিব, আমি বিশ্বজগতে বিসর্জ্জিত হইব। এক মুহূর্ত্ত যদি ডুবিতে পারি, তবে আর কিছু চাই না। আমি সব তুচ্ছ করি—একবার যদি এই প্রকৃতির ভিতরে ডুবিতে পারি, একবার যদি ক্ষুদ্র 'অহংকে' অনন্ত বিশ্বে বিস্তৃত করিতে পারি। প্রকৃতিই জীবন্ত ভালবাসার ছবি। একবার প্রকৃতিতে ডুবিতে পারিলে অমনই গভীর নিঃস্বার্থ প্রেমের উদয় হয়। একটু প্রেম পাইলে—আর চাই কি? এক বিন্দু প্রেমে সব অসম্ভব সম্ভব হইবে। প্রেম ভিন্ন মানুষের আর কি আছে! ভালবাসা, কেবল ভালবাসা ভিন্ন জড় এবং চেতনের প্রাণের আরামের বস্তু আর কিছুই নাই।

(৪)

"চোখ মেলিলে আঁধার দেখি, চোখ বুজিলে সলক হয়।
পাগলা কানাইর স্মরণ করে, নাইকো কোন ভয় ভয়।"

প্রকৃতি ত শুধুই প্রকৃতি নয়। ডুবিতে ডুবিতে, মজিতে মজিতে—এ কোথায় আসিলাম? এ অনন্তপুর। এখানে সব চিদাকাশ, সব অমৃতস্পর্শ। চাঁদের হাসি অনন্ত মিষ্ট, সূর্য্যের রশ্মি অনন্ত জীবনপ্রদ, কোকিলের স্বর অনন্ত মধুর, ফুলের বাস—অনন্ত স্নিগ্ধ, সাগরের জল—অনন্ত শীতল। এ অনন্তপুরে রূপের পরিমাণ হয় না। কালমান ও পরিমাণ-বস্তু এ রাজ্যে মিথ্যার দৈন্য। যে না ডুবিয়াছে, সে পরিমাণ করিতে পারে। কিন্তু যে

প্রকৃতির ভিতরে নিমগ্ন, আত্মবর্জিত, পরিমাণ করাকে সে বাতুলের ক্রীড়া বলিয়া জ্ঞান করে। পরিমাণ কিছুরই হয় না। শারদ পৌর্ণমাসীর রজনীতে আকাশে চাহিয়া দেখিয়াছি—দেখিতে দেখিতে পৃথিবী ভুলিয়াছি, আপনাকে ভুলিয়াছি—সব ভুলিয়াছি, তবুও ঐ জ্যোতির পরিমাণ করিতে পারি নাই। সে সৌন্দর্য্য যেন অনন্তেরই প্রস্রবণ। আর, কোন্ সৌন্দর্য্যের বা পরিমাণ আছে? যার যেমন চোখ, সে তেমনই দেখে। যার যেমন হৃদয়, সে তেমনই ভাবে। বাস্তবিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—সীমাবদ্ধ মোটেই নয়। ক্ষুদ্রের কাছে সে ক্ষুদ্র, মহতের কাছে সে অতি মহৎ। সীমার কাছে সে সীমা, অনন্তের কাছে সে অনন্ত *। সাগরের জল পাত্রে ধর—তাহার আকৃতি আছে; সাগরে ফেলিয়া দেও, সে অকূলে মিশিয়া গিয়াছে! চাঁদের জ্যোতিকে পাত্রে ধর, সে আকৃতি পাইয়াছে; আকাশে ছাড়, সে অনন্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চাঁদের দিকে তাকাও, চাঁদ যেন আকাশে নাই, জ্যোতি নিবিয়াছে; একটু চক্ষু খোল, একটু একটু চাঁদের আলো যেন ফুটিতেছে, দেখিবে। চক্ষুকে আরো ফোটাও, আরো ফোটাও, ঐ দেখ, চাঁদের জ্যোতি আকাশেরও উপরে কোন্ অদৃশ্য জগৎ ছাইয়া অনন্তে জাগিতেছে! † যার যেমন চক্ষু, সে তেমনই দেখে। সীমা দৃষ্টিতে নাই—সবই চিদাকাশ, সবই অনন্ত। অনন্ত—স্বয়ং ঈশ্বর। অনন্ত সুন্দর প্রকৃতি, অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত রূপ। ‡ অনন্তের কাছেই মানুষ প্রেম ভিক্ষা পায়। মানুষকে যখন মানুষ ভালবাসিতে পারে না, তখন অনন্ত প্রকৃতিতে নিমগ্ন হইয়া মানুষ প্রেমিক হইয়া যেতে। অথবা যখন মানুষের হৃদয় অন্ধকারে পতিত, মুখ মলিন, জীবন দুঃখের ভার, তখনই প্রকৃতি মানুষকে ডাকিয়া এই গভীর তত্ত্ব শিক্ষা দেয়।

---

* "Nature always wears the colours of the spirit."—*Emerson.*

† এমারসন বলিয়াছেন—"Standing on the bare ground,—my head bathed by the blithe air, and uplifted into infinite space,—all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball;—I am nothing; I see all; the currents of the Universal Being circulate through me; I am part or particle of God."

‡ Truth and Goodness and beauty, are but different faces of the same All. *Emerson.*

বিশ্বের অন্তরালে যে অনন্ত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তার আবেশে কে জানে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতরে যে প্রেমের অনন্ত উৎস খেলিতেছে, তাহাতে মানুষ ডুবিলে তবে আনন্দ এবং প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া সংসারে ফেরে। প্রকৃতিতে মজিয়া মজিয়া মানুষ যখন প্রেমে মাতোয়ারা হয়, তখন এই সংসার তার নিকটে স্বর্গের ন্যায়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেম-মাতোয়ারা যাঁহারা, তাঁহারাই জগতে পূজ্য। প্রকৃত প্রেমিকের নিকট—ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, জীবন মরণ সমান। ভেদাভেদ সেখানে থাকে না। মায়ের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। মায়ের মঙ্গল ইচ্ছার জয় সতত সে প্রতি ঘটনায় দেখে। তাঁর প্রাণ মরণের ওপারে ছুটিয়াছে;—তাঁর প্রাণ জীবন মরণের অতীত।

প্রকৃতিকে কখনও ভালবাসে নাই, এমন মানুষের কথা শুনা যায় না। অতি অসভ্য জাতিও প্রকৃতির পূজা করে। প্রকৃতিতে মোহিত এবং স্তম্ভিত সকলেই,—অল্প বা অধিক পরিমাণে। ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছেন—"ক্ষুদ্র কারাগৃহের গবাক্ষপথ দিয়া অনন্ত নীলিমাময় আকাশ এবং অনন্ত উর্ম্মিমালাময় সাগর আমার নয়নগোচর হইত, তাহাতেই আমি শান্তি এবং সুখ পাইতাম; এবং মধ্যে মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাখী গৃহে আসিয়া কি যেন অনন্ত বা অনন্তের সংবাদ কানে ঢালিয়া দিয়া আমার চিন্তা-কাতর প্রাণকে মাতাইয়া যাইত।" আমি বলি, কেবল তাহা নয়;—ধীরে ধীরে ঐ অনন্ত প্রকৃতিতে ডুবিয়াই ম্যাট্‌সিনি প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। অস্ত্রাঘাত-শোণিতপাতে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে,—দেশের শত শত লোকেরা চক্রান্ত করিয়া ভিক্টর ইমানিউএলকে সিংহাসনে বসাইতেছে—প্রাণতুল্য গ্যারিবল্ডিও প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছেন—কিন্তু তবুও প্রেমাবতার ম্যাট্‌সিনি দেশের মঙ্গল, স্বদেশী তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। এই গভীর প্রেমের শিক্ষাগুরু,—ঐ অনন্ত আকাশ, ঐ অনন্ত সাগর এবং ঐ অনন্ত সংবাদ-বহনকারী ক্ষুদ্র পাখী, মনে রাখিবে। প্রকৃতি-সেবায় ম্যাট্‌সিনি স্বদেশ-বৎসল। কথিত আছে, প্রকৃতিসাধন-রত লক্ষ্মণ কত কত বৎসর অনাহারে থাকিয়া মেঘনাদ-বধের ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কথাটা প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইবে,—লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর প্রকৃতি-সেবায় রত থাকিয়া সিদ্ধ হইয়া অমর হইয়া গিয়াছেন—ভাতৃপ্রেমের আদর্শস্থল হইয়াছেন। শাক্যসিংহ রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া অনেক বৎসর জঙ্গলে বাস করিয়া

সিদ্ধ বা বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আর খৃষ্ট—ঐ অনন্ত প্রকৃতির নিকট প্রেম-তত্ত্ব শিখিয়া, আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে পারিয়া, নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া তিনি জগতের কল্যাণব্রত গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্ট মরণকালে শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—শত্রুদলের মঙ্গলের জন্য দেহপাত করিয়াছিলেন। ইহাপেক্ষা গভীর প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নাই। এই খৃষ্ট—সর্ব্বদাই পর্ব্বতে, জঙ্গলে বাস করিতেন। অনন্ত প্রকৃতি ইঁহা-রও দীক্ষাগুরু। অনন্ত প্রকৃতির নিকট প্রেম পাইয়াই, যিশু, খৃষ্ট হইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির মূলে এক অনন্ত অবিনশ্বর মহাপুরুষ বিদ্যমান। মানুষ যখনই সংসার-কোলাহল ভুলিয়া প্রকৃতির নিকট যায়, তখনই জড়-প্রকৃতির ভিতর হইতে সেই অনন্ত সুন্দর পুরুষ বাহির হইয়া মানুষকে আলিঙ্গন করেন। মুশা তখন বর প্রাপ্ত হন। জন যখন দীক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করেন, খৃষ্ট তখন আকাশের আলোক পাইয়া প্রেম-দীক্ষিত হইয়া, অরণ্য হইতে ফিরিয়া সংসারের জন্য দেহপাত করিতে সমর্থ হন। তিনি তখন জগতের, জগৎ তখন তাঁহার। জীবন ও মরণ—তখন তাঁহার নিকট উদ্দেশ্যসিদ্ধির রূপান্তরিত দুটী অবস্থা মাত্র। মরিয়াও তখন তিনি জীবিতের ন্যায়, বাঁচিয়াও তখন তিনি মৃতের ন্যায় ইচ্ছাবর্জ্জিত জড়-প্রকৃতিক। তুমি প্রকৃতিতেও ডুবিবে না, মানুষকেও সম্মান করিবে না, অথচ সেই মহাপুরুষকে দেখিবে, প্রেমিক হইবে, এ কেমন কথা? যাও, হৃদয়ে অরণ্য সৃজন কর, পৃথিবীর কোলাহল ভুলাইয়া দেও;—যাও, নির্জ্জন গভীর জীবন্ত প্রকৃতির ভিতরে যাও—সেখানে কেবল বায়ু সোঁ সোঁ করিতেছে, আকাশে কেবল চাঁদ ফুট ফুট জ্বলিতেছে, বৃক্ষে কেবল পাতা মর্ মর্ শব্দ করিতেছে, পাখী কেবল মধুর গভীর তান ধরিতেছে, সাগরে কেবল ঊর্ম্মি-মালা দুলিয়া দুলিয়া তালে তালে উঠিতেছে, পড়িতেছে। যাও, এমন সুন্দর, এমন মন-মুগ্ধকর স্থানে অন্তত একটী রাত্রি বাস করিয়া এস, তারপর দেখিব, তুমি কেমন নাস্তিক, কেমন অবিশ্বাসী, কেমন অপ্রেমিক! প্রকৃতির মধ্যে যে অনন্ত চিৎ-শক্তি বিদ্যমান, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে লোক কখনও বিশ্বাসী হইতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসী না হইলে প্রেমিক হইতে পারা অসম্ভব। অবিশ্বাসী প্রেমিক, একটীও নাই। অবিশ্বাসীর প্রেম, কল্পনা প্রেম; মৃত জীবের শ্মশানের ভস্মের সহিতই তাহা বিলীন হইয়া যায়। বিশ্বাসীর প্রেম অনন্তকালস্থায়ী, অবিনশ্বর—ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া তাহা

জাগে,—তাহা অনন্ত জগতে অনন্ত-বিস্তৃত। এইরূপ প্রেমিকই পূজ্য। এইরূপ প্রেমিকই ধন্য। এইরূপ প্রেমিকই মিলনের মহাশক্তি বুঝিয়াছে। একে প্রেম, একে বিশ্বাস, একে প্রাণ না সঁপিলে কিছুতেই সেরূপ প্রেমিক হওয়া যায় না। প্রকৃতি সাধনে সিদ্ধ হইলে মানুষ সেই প্রেম, সেই বিশ্বাস —সেই অনন্ত, সেই চিদাকাশ, সেই সদানন্দকে বুকে পায়। বুকের ধন বুকে বসে। শাক্য তখন বুদ্ধ হন, যিশু খ্রীষ্ট হন, মুসা যোগী হন, নিমাই চৈতন্য হন। মানুষ মরিয়া তবে বাঁচিয়া উঠে। মরার অর্থ—আপনাকে ভোলা। অহংবোধ তখন উড়িয়া যায়। "আপনার স্থান" তখন বিশ্ব গ্রাস করে। আমিত্বের বীজ তখন জগদ্বৃক্ষে পরিণত। মানুষ তখন আপনা-ভুলিয়া জগতের হইয়া গিয়াছে। জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে; দেশে দেশে তখন মহামিলন হয়। ইহকাল পরকাল, তখন এক সূত্রে গ্রথিত! গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী তখন একই সাগরে মিশিয়াছে! দেশ কাল, আকাশ পাতাল সব একীভূত! সংসার তখন স্বর্গে উঠিয়াছে, স্বর্গ তখন সংসারে নামিয়াছে। প্রেমের অবতার প্রেম বিলাইতে তখন জগতে অবতীর্ণ হয়। মানুষ তখন প্রেমে হাসে, প্রেমে গায়, প্রেমে নাচে, প্রেমে যায়। সুন্দর নাই, কুৎসিত নাই, বিষ্ঠা নাই, চন্দন নাই,—শত্রু নাই, মিত্র নাই—জীবন নাই, মরণ নাই, আপন নাই, পর নাই, —সব একাকার। যাকে পায়, সেই বৈকুণ্ঠবাসী মানুষ, তাহাকেই কোল দেয়। যাকে পায়, তাকেই ধরে। ধরে আর মায়ের রূপ দেখে। মায়ের রূপ দেখে আর সকলকে ধরে। এক রূপ সকল ঘটে—এক রূপ জগন্ময়। জগন্নাথ যখন শ্রীক্ষেত্রে আবির্ভূত। জাতিভেদ তখন উঠিয়া গিয়াছে। বৈষম্য ও ভেদাভেদ তখন ঘুচিয়াছে। বিদ্বেষ তখন তিরোহিত হইয়াছে। অধীনতা-নরক তখন ডুবিয়াছে। সকল ঘটে একের বিরাজমানতা অনুভব করিয়া, প্রেমিক তখন ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া, প্রেম বিলাইয়া, ভক্তি কিনিয়া চলিয়া যায়। তখন সংসারে কেবল মধুর মিলনসঙ্গীত গীত হয়, সাম্যের বিজয় ভেরী নিনাদিত হইতে থাকে,—সংসারে স্বর্গের ভঙ্গী বাজিয়া উঠে! সেইই বৈকুণ্ঠ, সেইই স্বর্গ, সেইই মুক্তি। জগন্নাথের রূপ দেখিয়া মানুষ তখন জন্মান্তর লাভ করে; আমিত্বত্ব তখন শ্মশানে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ঘরে ঘরে মিলন এবং শান্তির পরিবর্ত্তন উঠিতে থাকে! সবই সরল, সবই উদার, সবই তখন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে;—পিতা পুত্রের মিলন হইয়াছে;—ভ্রাতৃ প্রেম,

ভগ্নী প্রেম, বন্ধু প্রেম সব অবতীর্ণ হইয়াছে! সব অসম্ভব সম্ভব হইয়া গিয়াছে। শৃগাল ব্যাঘ্র, সর্প নকুল—একত্রে বাস করিতেছে! হিংসা বিদ্বেষ সব তিরোহিত হইয়াছে! পৃথিবীতে স্বর্গ এবং মিলনের রাজ্য অবতীর্ণ হইয়াছে! মানুষ তখন উন্মাদের ন্যায় অস্থির হইয়া জগতের পরিত্রাণের জন্য ছুটিতেছে! পরস্পর পরস্পরকে তুলিতেছে, আপন পর তখন সমান হইয়া গিয়াছে!!

আপনি সিদ্ধ না হইলে, আপনাকে ডুবাইতে না পারিলে, পরোপকার করা ভণ্ডামী বই আর কিছুই নয়। জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করে নাই, অথচ যে জাতিভেদ তুলিয়া দিতেছে, সে মহাভণ্ড,—প্রকারান্তরে সে এক জাতিভেদের স্থলে অন্য জাতিভেদের সৃষ্টি করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান সময়ে তাহাই হইতেছে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া, নববিধানী, সাধারণী ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করিতেছে। এ সকল ভণ্ডামীরই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই। ভিতরে ভক্তি নাই, অথচ মালা ঝুলী গায় দিলেই যেমন প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না, বিশ্বপ্রেমে রঞ্জিত না হইয়া জাতিভেদ তুলিয়া দিলেই সেইরূপ প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায় না। ভিতরে গলদ থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। সকল চেষ্টা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে—আরো যাইবে, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রেমের অনন্ত আস্বাদ মানুষ লাভ করিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইতে না পারে। শোকে সে অধীর হইবে, শ্মশান দেখিয়া সে ভয় পাইবে,—যে প্রকৃত প্রেম পায় নাই। জাতিভেদের অঙ্কুর তাহার মজ্জায় মজ্জায় নিহিত। ঘৃণা বিদ্বেষ—ভেদাভেদ-বোধ তার শোণিত-বিন্দুতে বিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট। সে কি করিবে? সে পথ-হারা পায় না—সে ভয়ে ভয়ে চলে, ভয়ে ভয়ে আসে। সে মিলনের স্থান তাহার খুঁজিয়াও পায় না। আপনাকে লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত। জগতে এইরূপ ভণ্ডামীপূর্ণ, অমঙ্গল, অপ্রেমের খেলাই চতুর্দ্দিকে। প্রেম নাই —অথচ রাজনীতির আন্দোলন,—ভালবাসা নাই, জাতির গঠনের চেষ্টা। হায়, পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থা! একজন লোকও অন্তত একজন লোকের প্রাণে মজিয়া যাইতে পারিল না!! পারিবে কেন? প্রেমমণির সংস্পর্শ ভিন্ন কখনও মানুষ মহামিলন-সার বুঝিতে পারে না। অবিশ্বাস হাড়ে হাড়ে জড়িত। প্রেমশূন্য, তাই সকলে। যতদিন মানুষ অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার এই প্রকৃতি-সাধনে সিদ্ধ হইবে না, এই প্রকৃতির অন্ত-

স্থানে লুক্কায়িত যে বিশ্বপ্রেম-শক্তি বিদ্যমান, তাঁকে স্পর্শ করিতে না পারিবে, তাবৎ কিছুতেই কিছু হইবে না। অবিশ্বাস যতদিন, অপ্রেম ততদিন। অপ্রেম যতদিন—অন্তরল ও ঘৃণা বিদ্বেষের অধীন মানুষ ততদিন; ঘৃণা বিদ্বেষ যতদিন, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ততদিন; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই যতদিন—জাতিত্ব গঠন অসম্ভব ততদিন;—অধীনতা ততদিন। অধীনতা যতদিন, রাজনীতি বালকের খেলা ততদিন। সেই শক্তিসাধনে জয়ী হইতে না পারিলে সব ব্যর্থ। কোন কালে প্রেম ভিন্ন জাতিত্ব গঠিত হয় নাই। কোন দিন প্রেম ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয় নাই। কোন দেশ প্রেম ভিন্ন উন্নত হয় নাই। মহামিলনের মহাশাস্ত্র—এই প্রেম। প্রেমময়ীকে স্পর্শ কর—দেখিবে—মাটী সোণা হইয়া গিয়াছে,—সব একাকার হইয়া গিয়াছে। হায়, মানুষ আর কতকাল প্রেমময়ীকে ভুলিয়া মরণের কোলে পড়িয়া কাঁদিবে? কে বলিবে, কতকাল!!

বঙ্গের অমর সন্তান।

মানুষের হৃদয় বিষভরা। সুধাভরা হৃদয় পৃথিবীতে নাই, এমন কথা আমরা বলি না; এমন কথা বলিলেও পাপ আছে। সুধাভরা হৃদয় না থাকিলে পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইত। সুধাভরা হৃদয় আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প,—সাগরের বিন্দু, পাহাড়ের রেণুবৎ। এই বিন্দুবৎ সুধা পাইবার আশায় মানুষ মানুষের জন্য লালায়িত, পিপাসিত। আয়, আয়, কাছে আয়, কোলে আয়, এই বলিয়া পিপাসিত মানুষ মানুষকে হৃদয়ে বাঁধিতে চায়। কিন্তু যখন কাছে আসে, প্রাণে ব[illegible]—তখন হায় হায়! মানুষের গুপ্ত গরল ঢালিয়া মানুষ মানুষকে কেবলই কষ্ট দেয়। মানুষের দুর্ব্যবহারে মানুষ তখন ত্যক্ত বিরক্ত—মানুষ তখন জ্বালায় অস্থির। যতদিন মানুষ দূরে, ততদিনই যেন মধুর; যখনই কাছে, অতি কাছে, তখনই যেন তিক্ত। মানুষের গায়ের উষ্ণ বাতাস মানুষের অসহ্য। হিংসায়, অহঙ্কারে, স্বার্থে মানুষকে মজাইয়া বিষতুল্য করিয়া তুলিতেছে। সমাজ বিষতুল্য, দেশ বিষতুল্য! আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব—আরো বিষতুল্য!!

মানুষের হৃদয়ের এই শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া যখন প্রাণ মন বিষাদে মলিন হয়; শরীর মন অবসন্ন হয়, নির্জ্জনে একাকী বসিয়া থাকিতে

ঢাকা হয়, মানুষের মন হইতে অমিয়া বা বিকৃত হয়, যখন ধরাপুরী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়,—প্রেমপূর্ণ হৃদয় যখন শ্মশানে পরিণত, তখন হঠাৎ কোন মহাদেব, কোন খ্রীষ্ট, কোন বুদ্ধ, কোন চৈতন্য বিধাতার আদেশে সেই আঁধারে, সেই শ্মশানে আসিয়া মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মানুষ সে সুধামাখা চিত্র দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠে, শ্মশানে বসিয়া স্বর্গ, অমৃত এবং শান্তির স্নিগ্ধ প্রস্রবন পাইয়া আবার নাচিয়া উঠে, আবার সংসারে, আবার আলোকে, আবার জীবনে ফিরিয়া আইসে। মৃত মানুষ আবার জীব হইয়া উঠে। বিষভরা অন্তরের কাছে সুধাভরা হৃদয় না থাকিলে, সংসারে মানুষ টিকিতে পারিত না।

পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান আবিষ্কারের জন্য, সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার জন্য, যেমন এক একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন, মৃত মানুষকে জীবিত করিবার জন্যও তেমনি এক একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন।* মৃত কে? যে সংসার দাস,—যে অহঙ্কারের দাস—যে স্বার্থের দাস। মৃত কে? যে অন্যের গুণ ও মহত্ত্ব দেখিতে পায় না—অন্যকে ভালবাসিতে জানে না। মৃত কে? যে জীবন পাইয়া নরকের সেবা করে—যে সুধার পরিবর্তে হৃদয়ে বিষ ভরিয়া রাখে; যে আলোকের বদলে হৃদয়ে অন্ধকার, কুসংস্কার পোষণ করে। সংসারে এইরূপ মৃত জীবের সংখ্যাই অধিক; এক হিসাবে সমাজ শ্মশানেরই প্রতিরূপ। মৃত মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য, পীড়িত সমাজকে পবিত্র করিবার জন্য, কোন খ্রীষ্ট, কোন চৈতন্য বা কোন বুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য। ইঁহাদের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, আর আর লোকের আবশ্যকতা নাই, এ কথা বলি না। ক্ষুদ্র কীট জন্তু, অণু পরমাণু, বৃক্ষ লতা, সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং সকলেই এক হিসাবে, আপন আপন বিশেষত্বের জন্য পরস্পরের চেয়ে বড়। মানুষ সকলেই মহাপুরুষ—আপন আপন বিশেষত্ব ও মহত্ত্বে। নিউটন এক হিসাবে মহাপুরুষ, মিল আর এক হিসাবে মহাপুরুষ; নেপোলিয়ন, রুসো, ভল্টেয়র ও ম্যাট্‌সিনি এক এক হিসাবে ইঁহারা সকলেই মহাপুরুষ। আবার

* "The mass of creatures and of qualities are still hid and expectant. It would seem as if waited, like the enchanted princess in fairy tales, for a destined human deliverer. Each must be disenchanted, and walk forth to the day in human shape." *Emerson.*

তুমি আমি, রাম বড়, আমরাও সকলে এক এক হিসাবে মহাপুরুষ। মহত্তের সন্তান বলিয়া মহাপুরুষ। সকলের স্মৃষ্টিরই প্রয়োজনীয়তা আছে—সকলের মধ্যেই বিশেষত্ব বিদ্যমান। বিষভরা জনয়, এবং সুধাভরা জনক, এই দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। সকলেই মহাপুরুষ বলিয়া সকলে তুল্য নহে। তুলনা অসম্ভব। নিউটন বড় কি ম্যাটসিনি বড়, রুসো বড় কি খ্রীষ্ট বড়?—ইহার মীমাংসা হয় না। আপন আপন বিশেষত্বে প্রত্যেকেই বড়। পৃথিবীর দর্শন কাব্য বিজ্ঞান আবিষ্কারের জন্য, বিবর্তন-মূল আবিষ্কারের জন্য যেমন কোন প্লেটো, কোন সেক্ষপিয়র বা কোন ডারউইনের প্রয়োজন, মানুষের হৃদয়ের গরল তুলিয়া সুধা ভরিয়া দিবার জন্যও সেইরূপ কোন খ্রীষ্ট বা নানকের প্রয়োজন। শত্রুকেও ভালবাসিবে * ইত্যাদি সত্যে দীক্ষিত করিয়া মানুষের হৃদয়কে উন্নত করিবার জন্য খ্রীষ্টের জন্মের অবশ্যই আবশ্যকতা ছিল। বিধাতার রাজ্যে বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় না। আমরা যখন সূক্ষ্মরূপে সৃষ্টি-মহত্ত্বের গভীরতার ভিতরে ডুবিয়া যাই, তখন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হই। এই জগতে, যেখানে যেটীর প্রয়োজন ছিল, ঠিক তাহাই যেন হইয়াছে! এই জগতে যখন যেটীর প্রয়োজন হইয়াছে, ঠিক তখনই যেন পৃথিবীতে তেমনটীর আবির্ভাব হইয়াছে! আবার যখন যেটীর প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, তখনই সেটীর তিরোধান হইয়াছে! জগতে ঘটনার অন্তরাল হইতে কেবল মঙ্গলই ফুটিতেছে। মঙ্গলময়ের উদ্দেশ্যেই জয়!

বাঁশী কি শুধুই বাজে? কোকিল কি শুধুই ডাকে? বাঁশীর পশ্চাতে ঊর্দ্ধ কর্ণে রাধা বিদ্যমান, তাইত বাঁশী বাজে! কোকিলের ডাকের পশ্চাতে বসন্ত লুকায়িত, তাই ত কোকিল ডাকে! আকাশভরা মধুর পঞ্চম স্বর কোকিলের—ঐ বসন্ত স্পর্শে! কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। আবার কার্য্য না আসিলেও কারণ যুটে না। য়িহুদী বংশের দুর্দ্দশা—খ্রীষ্ট জন্মের অবশ্যম্ভাবী কারণ। শাক্ত বর্গের হীন প্রভাই চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের মূল কারণ। যে বায়ুতে খ্রীষ্ট এবং চৈতন্যকে মানুষ করিয়াছে, তদানীন্তনের সেই দূষিত বায়ু ভিন্ন ইঁহারা কখনই ফুটিতে পারিতেন না। দুঃখ পাপ শোক

* "But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you." *Bible.*

আরো সুখ পাইবে বলিয়া; মরণ খেলা করে সংসারে—মানুষকে নবজীবন দিবে বলিয়া। লোক যখনই পাপে ডুবিতেছে, আরো ডুবিতেছে, আরো ডুবিতেছে, দেখিবে, তখন নিশ্চয় বুঝিবে, তাহার পশ্চাতে স্বর্গ আসিতেছে। নিশ্চয় বুঝিবে, ঐ পতন উদ্ধারের পূর্ব লক্ষণ! দেখিয়া শুনিয়া তবুও অবিশ্বাসী থাকিবে? শ্যামবাঁশরী বাজিতেছে, কিন্তু রাধা নাই; বসন্ত আসিয়াছে, কোকিল নাই; ইহা হইতেই পারে না। জগাই মাধাই জন্মিয়াছে, চৈতন্যের আবির্ভাব হয় নাই; য়িহুদীবংশের পতন হইয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্ট আসেন নাই, ইহা অসম্ভব কথা। চৈতন্যের জন্ম, জগাই মাধাইএর উদ্ধারের জন্য, এবং জগাই মাধাইর জন্ম, চৈতন্য আবির্ভাবের কারণ। যেখানে শ্যাম, সেই খানেই রাধা; যেখানে চৈতন্য, সেই খানেই নিতাই বা সেই খানেই জগাই মাধাই। যেখানে খ্রীষ্ট, সেই খানেই পতিত য়িহুদী সমাজ। যেখানে বসন্ত, সেই খানেই কোকিল। প্রেমের মধুর টানে নরক ও স্বর্গ, আকাশ ও পাতাল, পাপী ও পুণ্যাত্মা, সব বাঁধা। এসকল অবশ্যম্ভাবী। কার্য্য আছে কারণ নাই; অথবা কারণ আছে, কার্য্য নাই, ইহা অসম্ভব। পতন আছে উত্থান নাই; অথবা উত্থান আছে পতন নাই—ইহা অসম্ভব। সুখ আছে, দুঃখ নাই; অথবা দুঃখ আছে সুখ নাই, ইহা অসম্ভব। জীবন থাকিলেই মৃত্যু আছে। আবার মৃত্যুর পরেই নবজীবন আছে। শ্মশানের কোলেই স্বর্গ বিদ্যমান।

মানুষের হৃদয় বিষপোরা, কিন্তু শুধু তাহাই নয়। বিষের সাথে সুধাও আছে। অথবা বিষে বিষে পুড়িতে পুড়িতে যখন মানুষ তন্ময় হইবে, তখনই সুধার ছিটা স্বর্গ হইতে পড়িবে। পড়িবেই পড়িবে। বঙ্গদেশের বড়ই দুর্দ্দিন! আজ কাল বিষময় ভুজঙ্গ চতুর্দ্দিকে! মানুষে মানুষে কাটাকাটী চলিয়াছে, গৃহে গৃহে অশান্তির রোল,—বন্ধু বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ, পিতৃ বিচ্ছেদ, পুত্র বিচ্ছেদ, স্বামী স্ত্রী বিচ্ছেদ, ভাই ভগিনী বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদ-বিষ বঙ্গসমাজকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ মানুষের দ্বারে যাইতে চায় না, মানুষ মানুষের মুখ দেখিলে হাসে না। মানুষ স্বার্থের পথে, বিচ্ছেদের পথে, স্বেচ্ছাচারিতার পথে—নরকের পথে ক্রমাগত ছুটিতেছে। অহঙ্কার, হিংসা বিদ্বেষ যেখানে পাইতেছে, সুধা বলিয়া হৃদয়ে তুলিতেছে। এই বিচ্ছেদের দিনে, এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, এই অহঙ্কার এবং হিংসা বিদ্বেষের রাজত্বের দিনে,—বঙ্গদেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, স্বর্গের

আলোক—কেশব এবং রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে! বঙ্গের পঙ্কিলময় ভূমি হইতে কেশব এবং রাজকৃষ্ণ কুসুম ফুটিয়াছেন! ইহা ভাবিলেও আনন্দ পাই। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে,—আমাদের সর্ব্বদাই মনে পড়ে,—শান্ত, বিনয়ী, নিরহঙ্কারী ঐ রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি। তাঁহার পার্শ্বে রাখ, সতীর পার্শ্বে স্বামী,—মধুর মিলন, মধুর চিত্র। এই পোড়াদেশে নিরহঙ্কারী জ্ঞানী, বিনয়ী ধর্ম্মী, অহিংসাপরায়ণ যোগীর একত্র মিলন—রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে। প্রকৃত বিদ্বানের নিকট অহঙ্কার নাই, প্রকৃত চরিত্রের নিকট হিংসাবিদ্বেষ নাই, প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট সম্প্রদায় নাই,—রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি এই ত্রিসত্য বঙ্গসন্তানের নিকট ইহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন! রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে গভীর পাণ্ডিত্য, আড়ম্বরশূন্য অচলা বিশ্বাস, অকৃত্রিম দেশভক্তি, একত্রে শোভা পাইয়াছে। এক কথায়, এই দুর্দ্দিনে রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তির বড়ই প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—নানা গ্রন্থ; সমাজে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—চরিত্র। এই হুজুগের দিনে, এই হৈ চৈ পূর্ণ আন্দোলনের দিনে, এই চরিত্রহীনতার দিনে—একমাত্র উজ্জ্বল চিত্র—রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি। সে সৌম্য, সে গম্ভীর, সে বালকের ন্যায় সরল এবং মহাদেবের ন্যায় পবিত্র মূর্ত্তি নাকি আমরা আর দেখিব না! বঙ্গদেশ হইতে নাকি রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে! না—যতদিন বঙ্গদেশে হিংসা বিদ্বেষের রাজত্ব বিদ্যমান, অহঙ্কারের পরাক্রম বিদ্যমান, প্রকৃত সাধুজনের অভাব—ততদিন বঙ্গে নির্ম্মলচরিত্র রাজকৃষ্ণ অমর!! ততদিন হৃদয়ে হৃদয়ে রাজকৃষ্ণের জন্য অক্ষয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর সাধ্য নাই—শ্মশানের আগুনের এমন তেজ নাই যে, সেই অমূল্য রতনকে ভস্ম করিতে পারে!! এমন নিদারুণ কথা মুখে আনিও না, এমন পাপের কথা আমার কাণে ঢালিও না। অন্ধকার যতদিন—আলোকও ততদিন। দুঃখ যতদিন, সুখও ততদিন! মলিন বঙ্গসমাজ যতদিন—স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ অমর ততদিন।

আমি বঙ্গদেশের অনেক সাধুচরিত্র দেখিয়াছি—কিন্তু রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে যেমন পবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমন আর কাহাকে দেখিয়াও হয় নাই। একজন ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন,—"সাধু সে, যাহাকে দেখিলে ভগবানকে মনে হয়।" এই সংজ্ঞায়, রাজকৃষ্ণ বাবু প্রকৃত সাধু ব্যক্তি, কারণ তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিলে ভগবানকে মনে

ছিল। রাজকৃষ্ণ বাবুর কি শত্রু আছে?—এমন জীব কি এই বঙ্গদেশে আছে, যে রাজকৃষ্ণ বাবুকে দেখিয়া কোন উপকার পায় নাই? ধর্ম্ম-মন্দিরে দল-অশান্তিতে পুড়িতেছে; কিন্তু দেখ—রাজকৃষ্ণ অবিচলিত। দল-বিদ্বেষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই—সকলের বাড়ীতে বাড়ীতে কি মধুর খেলা খেলিয়া বেড়াইতেছেন! পিতায় পিতায় ঝগড়া করিয়া মরিতেছে, কিন্তু সরল শিশু শত্রু শিশুর সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতেছে! যে সময়ে বঙ্গদেশের বড় বড় দলের যুবকগণ ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ, ঝগড়া কলহ করিয়া মরিতেছে,—তখন শিশু অপেক্ষাও সরল এবং পবিত্র হৃদয়ের রাজকৃষ্ণ বাবু, ভেদাভেদ ভুলিয়া, ঘরে ঘরে ফিরিয়া, শান্তি এবং সদ্ভাব কুড়াইয়া লইতেছেন! তাঁর মূর্ত্তি মিলনের মূর্ত্তি—আপন-পর-ভুলানে মূর্ত্তি—সুধামাখা স্বর্গের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির বিসর্জ্জনে বঙ্গদেশ কাঁদিবে না, তবে কি করিবে? বাঙ্গালীর রোদনের অবশ্য কারণ আছে।

বাঙ্গালী কাঁদে কেন? বাঙ্গালী আজও মহতের মহত্ত্ব জীবনগত বা হজম করিতে শিখে নাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর মহত্ত্ব যে দিন বাঙ্গালী জীবনগত করিতে পারিবে, সেই দিন শোক অশ্রু শুকাইবে—সেই দিন হৃদয়ের পানে চাহিলেই অমর সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। গুণেই মানুষ অমর, গুণ ভিন্ন মানুষের পূজা কিছুই নাই। প্রকৃত সাধু-চরিত্র—অমর; ইহকালে কিম্বা পরকালে তাঁহার মৃত্যু নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে চিরকাল সাধু বিচরণ করেন। মহত্ত্ব জীবনগত করার অর্থ, মহত্ত্ব চরিত্রে প্রতিফলিত করা। বাঙ্গালী যে দিন রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় বিনয়ী, হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত, নিরহঙ্কারী নির্ম্মল যোগী হইবে, সেই দিন শ্মশানের ভিতর হইতে বঙ্গ দেশে অমর সন্তান স্বদেশী তাঁহার হৃদয়কে আলিঙ্গন করিতে আসিবেন। পুনরুত্থানের অর্থ আর কিছুই নহে, চরিত্রে যে ছিল না, তাহার চরিত্রে আসিয়া বসা। কথিত আছে, যীশু মৃত্যুর কয়েক দিবস পর গোর হইতে পুনরুত্থিত হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহার এক মাত্র অর্থ এই, কয়েক দিবস পর শিষ্যদিগের চরিত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে শিষ্যদের প্রকৃত যীশু-প্রাপ্তি হয় নাই; হইলে কখনও তাঁহাদের মধ্যে এক প্রতারকের হস্তে যীশুকে সমর্পণ করিত না। যীশুকে প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পর তাঁহারা কখনও কাঁদিত না। ক্রুশবিদ্ধ গুরুর জন্য শিষ্যদিগের ক্রন্দন তখন বড়ই স্বাভাবিক ছিল, কারণ তাঁহারা তখনও অমর আত্মাকে

হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। সাত দিন পরে যখন খ্রীষ্ট শিষ্য-চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন শিষ্যদিগের চক্ষের জল ঘুচিল, তখন খ্রীষ্ট-নাম প্রচারের জন্য সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। শোক তখন নিবিল। শ্মশান তখন স্বর্গের আলোক জ্বালিল। দেশ তখন পবিত্র হইল। প্রকৃত মহৎ লোকের মহত্ত্ব যখন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আর শোক তাপ থাকে না;—অন্ধকারে তখন আলো জ্বলে, বিষের ধারে তখন সুধা হাসে। রামকৃষ্ণ চরিত্রের মহত্ত্ব যেদিন বাঙ্গালার চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হইবে, সেই দিন প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এদেশে অমর হইবেন। তখন শোক, দুঃখ, কিছুই থাকিবে না। তখন কাঙ্গালিনী মাতার ন্যায় সন্তানের গৌরব স্মরণ করিয়া বঙ্গমাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন। ভ্রাতৃ-মহত্ত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া ভ্রাতা তখন আনন্দিত হইবেন। তখনই শ্মশান স্বর্গের পথ দেখাইবে—তখনই নরকে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যাইবে। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন সাধুর তিরোধানে বাঙ্গালীর ক্রন্দন স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য।

দেখিতে দেখিতে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, আমরা অনেকগুলি অমূল্য রত্ন হারাইলাম! কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস, তারকপ্রামাণিক, অক্ষয়কুমার, রামকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, দুর্গাকুমার,—ইঁহারা সকলেই আপন আপন বিশেষত্বে মহাপুরুষ। দেখিতে দেখিতে আমরা এতগুলি অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলাম। এখন যাহাতে আমরা ইঁহাদের চরিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে পারি, তাহার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। ইঁহাদের পুনর্জন্ম আমাদের জীবনে না হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন, করুন। কিন্তু সকলের পূর্ব্বে ইঁহাদের মহত্ত্বকে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখা কি উচিত নয়? কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ-মূলক প্রকৃত শ্রাদ্ধ সেই দিন সম্পন্ন হইবে, যেদিন ইঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্বে আমরা দীক্ষিত হইব। অক্ষয় স্মৃতি-চিহ্ন ইহাকেই বলে। দিন যাইতেছে—শ্মশানের আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে—কত রত্ন পুড়িয়া যে ভস্মসাৎ হইবে, কে জানে? অতএব প্রকৃত মহত্ত্ব, প্রকৃত চরিত্র, প্রকৃত রত্ন যাহাতে বঙ্গ হইতে বিলুপ্ত না হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করা বিধেয়। অমর সন্তানদিগকে যদি অমর করিতে চাও, তবে ভাই, অগ্রে তাঁহাদিগের চরিত্রে দীক্ষিত হও। ভগবান এই করুন, এই সকল অসামান্য সন্তানগণের মহত্ত্বে দীক্ষিত হইয়া যেন ইঁহাদিগকে বঙ্গ সন্তানেরা অমর করিয়া রাখিতে পারেন

পারে। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক। পতনের পরে উত্থান, বিষের পরিবর্ত্তে আবার হৃদয়ে সুধার ধারা বর্ষিত হউক। বঙ্গদেশ ধন্য হউক, সমাজ পবিত্র হউক।

বিবিধ।

(১)

প্রকৃতি, এক ভাব, এক অবস্থা লইয়া চিরকাল থাকিতে পারে না, থাকিতে চায় না! দারুণ শীতের তীক্ষ্ণ কশাঘাত সহ্য করিয়া বৃক্ষ সকল মৃতপ্রায় হইয়াছিল, বসন্তের সুবাতাস বহিয়া বহিয়া সময়ে তাহাদিগকে আবার সজীব করিল। নবপল্লব, নব ফুল ফলশাখা বৃক্ষে আবার ফুটিল। একবার শুষ্কতা, অবসন্নতা, জড়তা,—আবার সরস ভাব, জীবন্ত ভাব—চিরন্তন ভাব। ধর্ম্মজীবনেও শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মের অনুভব আছে। শীতের কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিলে বসন্তের সুস্নিগ্ধ সজীব ভাব কাহারও জীবনে ঘটে না। আবার গ্রীষ্মের পর্য্যায়ে পড়িয়া অসহ্য উত্তাপে যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার ভাগ্যেও বর্ষার সরস ভাব উপলব্ধ হয় না। সহ্য করিতেই হইবে,—অবসাদকে সহন না করিলে আর চলিবে না। দেখিয়া, পরীক্ষা করিয়া তবে বুঝিয়াছি—অবসাদকে সহন করিতে না পারিলে, সংসার সাধন বা ধর্ম্ম সাধন, কোন সাধনেই জয় লাভ করা যায় না। কাহার জীবন এমন, যাহাকে কখনই শীতের দারুণ কশাঘাতে মুহ্যমান হইতে হয় নাই? পাপ প্রলোভনপূর্ণ এই ভবসংসারে প্রবল শত্রু রিপু কুলকে সঙ্গে লইয়া কে কবে বিনা কষ্টে, বিনা দুঃখে, শান্তি এবং পুণ্য, পবিত্রতা এবং ধর্ম্ম রত্ন লাভ করিতে পারিয়াছে? প্রবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় শত্রুর হস্ত হইতেই বা কে কবে বিনা ক্লেশে স্বাধীনতা রত্ন কাড়িয়া পাইয়াছে? আশাকে প্রাণে বাঁধিয়া, অবসাদকে সহন করিয়া যে পড়িয়া থাকিতে পারে, যে প্রাণকে উৎসর্গ করিতে পারে, জয় লাভ তাহারই ভাগ্যে। কোন অবস্থাতেই অধীর হওয়া উচিত নহে। সুখে সংসার চলিতেছিল—সকলের মুখে হাসি খেলিতেছিল—হঠাৎ একদিন সংসারকে ফাঁকি দিয়া, পরিবারকে কাঁদাইয়া, হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া একজন আত্মীয় পলায়ন করিল!

কোথায় গেল, কোথায় গেল, বলিয়া পরিবারে হই-চই পড়িয়া যাইল, ক্রন্দনের রোল উঠিল—বিচ্ছেদের দারুণ আঘাতে হৃদয় প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িল—শরীর অবসন্ন হইল—নিরাশা আসিয়া সব অন্ধকার করিল!! শোকের তীব্র আঘাত প্রাণে বড়ই বাজিল। বাহিরে ছিলাম, ঘরে আসিলাম; সংসারে ছিলাম, প্রাণে যাইলাম। আসক্তির আড়ম্বরে মজিতেছিলাম—বৈরাগ্যের নির্জ্জন কুটীরে ফিরিলাম। আলোকে ঘুরিতে ছিলাম,—নিরাশা-আঁধারে ডুবিলাম। প্রাণ-ঘরে পৌঁছিয়া, নির্জ্জনে বসিয়া, আঁধারে লুকাইয়া তবে দেখিলাম—প্রাণময়ী মা সেখানে নূতন আশার বাণী শুনাইবার জন্য বসিয়া! শান্তিরূপিণী মা সেখানে সকল আঁধার গ্রাস করিয়া বসিয়া!! শোকে যে না ডুবিয়াছে, তাহার পক্ষে সে আশার বাণী কল্পনা বলিয়া বোধ হইবে। এক এক অবস্থার ভিতরে মায়ের এক এক রূপ এমনই করিয়া বিকশিত হইতেছে! এক এক পদার্থের বা এক এক ঘটনার পর্য্যায়ে এমন করিয়াই অনন্তের অনন্ত রূপ ফুটিতেছে! মায়ের সে স্নিগ্ধ, সে মধুর, সে প্রাণস্পর্শী আশার কথা শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম! হায় হায়, মৃত্যুর তীব্র আঘাতে বন্ধুবিচ্ছেদ না ঘটিলে কি পরকালের দিকে সংসারাসক্ত মন ফিরিত? না—ঐ মৃত্যুর ভ্রুকুটী দেখাইয়া মা বলিলেন, "সন্তান, কেবল সংসারই লক্ষ্য নহে, এই দেখ, আরো কিছু আছে।" আমি দেখিলাম, আঁধারের ধারে আলো জ্বলিতেছে—নিরাশার তীরে আশা-পবন দুলিতেছে। আমি দেখিলাম, সেই আশা-আলো দেখিতে দেখিতে আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমি অবিশ্বাসী ছিলাম, প্রকৃত বিশ্বাসী হইলাম! আমি নিরাশায় মজিয়াছিলাম, আশা-বিশ্বাস পাইলাম! মা আমার কত রূপে, কত ভাবে ফুটিতেছেন, আমি ক্ষুদ্র, কেমনে বলিব!!

বন্ধুবিচ্ছেদ—ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ আমাদের সংসারের প্রাত্যহিক ব্যাপার! পরলোকের সহিত সন্ধি স্থাপন না করিলে আর চলে না, তাই দেখিলাম, পরলোকের বিশ্বাস প্রাণকে শীতল করিল, সন্ধি স্থাপিত হইল। পুস্তক পাঠে নহে, লোকের কথায় নহে, প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস-ধনকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসকে পাইতে হইলে সকল প্রকার অবস্থাকেই মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। প্রত্যহ নূতন লোক আসিতেছে, প্রত্যহই কত লোক চলিয়া যাইতেছে! কোথা হইতে বা আসে, কোথায় বা যায়, আমরা

বুঝি না, আমরা না জানিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে বুঝি—মায়ের কোল ছাড়া আর গতি নাই। মা ই লক্ষ্য, মা ই আমাদের সম্বল।

সমাজের বক্ষে যাহারা দশ বিশ বৎসর অবিচলিত ভাবে বসিয়া আছেন,—তাঁহারা বৈচিত্র্যময়ী মায়ের যে কত রূপই দেখিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা হয় না! দিনের পর দিন যাইতেছে, অমনি নূতন পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে! কত বন্ধুকে পাইলাম, কত বন্ধুকে হারাইলাম! কেহ পরলোকের আঁধারে লুকাইল—কেহ সংসারের আসক্তি, পাপ, কুসংস্কারের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইল, আমি আর তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। না পাইয়া কত কাঁদিয়াছি! যে বন্ধুকে পাইয়া প্রাণে এক দিন কত আরাম পাইয়াছিলাম, কত শান্তি পাইবার কল্পনা করিয়াছিলাম, হায়, সে বন্ধু সময়ে ফাঁকি দিলেন—কোথায় যেন লুকাইলেন! আমি বিচ্ছেদে পড়িয়া কত কাঁদিলাম! কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে বুঝিয়াছি,—ভ্রাতা ভগ্নীর চিরসহবাস মানুষের লক্ষ্য নহে, চির-লক্ষ্য হয় না। কত-বার অনুরোধে, বন্ধু এবং ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের দারুণ কষ্ট পাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তবে শেষে মাকে দেখিতে পাইলাম। মা বলিলেন,—"আর কিছুই তোর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য কেবল আমি। আমাকে ভুলিয়া তোর কোথায় আরাম, কোথায় শান্তি! তোকে কাঁদাইয়াছি, তবে আমি তোকে কোলে পাইয়াছি।" মায়ের সে সুধামাখা নীরব কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া এই শিখিলাম, দুঃখ না পাইলে সুখ ঘটে না, আঁধারে না মজিলে আলোকের মুখ দেখা যায় না। তাঁহার ইচ্ছারই জয় হইল।

আবার সমাজে দুঃখের দিন উপস্থিত হইয়াছে। বসন্তের সুস্নিগ্ধ মধুর ভাব চলিয়া গিয়াছে, দারুণ গ্রীষ্মের প্রকোপ বাড়িতেছে। দৈন্যের অত্যাচারে সমাজের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই উত্তাপ যে সহ্য করিতে পারিবে, মায়ের স্নিগ্ধ রূপ নিশ্চয় সে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহা পারিবে কে? আমি বড়ই দুর্বল, বড়ই অসহায়, আমি সহ্য করিতে পারিব না বলিয়া মনে বড় ভয় হইতেছে। ভীত হইয়া আজ সকলের দ্বারে আসিয়াছি। মাকে পাইবার জন্য গত জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধু-বিচ্ছেদের দিনে আমি কষ্ট সহ্য করিতে পারিব কি না, সন্দেহ। মা বলেন, আমি তোর ভাবনা ভাবিয়া বসিয়া রহিয়াছি। মায়ের কথা শুনিয়াই আসিয়াছি। অনেক বন্ধুকে, অনেক

মাকে হারাইয়া, আরো বহু, আরো আত্মীয় অন্বেষণ করিতেছি। এই বিষম দুর্দিনে কে রক্ষা করিবে? কে সহায় হইবে? এই বিচ্ছেদ-আগুন নির্বাণের একমাত্র আশাবারি—মায়ের শান্তিপ্রসাদ। অশিব, পুড়িব, অঙ্গার হইয়া যাইব—তবুও মাকে ছাড়িব না। মা এই উত্তাপের দিনে আমাদিগের প্রাণে অধ্যবসায় ঢালিয়া দিন; আমরা এই কঠিন পরীক্ষার স্রোতে পড়িয়া যেন মাকে ভুলিয়া সংসারে ফিরিয়া না যাই। মায়ের আশীর্বাদ আমাদের সকলের নিরাশা-দগ্ধ, বিচ্ছেদ-কাতর প্রাণে বর্ষিত হউক।

(১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের উৎসবে পঠিত)

(২)

বহু চিন্তা এবং গবেষণার পর সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে, এই অনন্ত প্রকৃতির মূলে এক অদ্বিতীয় আদি শক্তি বিদ্যমান। যাহার নিকট সেই শক্তি যে ভাবে প্রকাশিত হয়, সে তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখে। সে শক্তি অনন্ত;—অনন্তের আরম্ভ কোথায়, শেষ কোথায়, কেহ জানে না। তিনি অরূপ, তিনি অব্যয়, কিন্তু এক এক জনের নিকট এক এক রূপে প্রকাশিত। প্রত্যেকের ভিতরেই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত। যাহার ভিতরে তাঁহার যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, সে স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার বুঝিবার শক্তি নাই। বৃথা তর্ক যুক্তিতে, সাধন বিনা, লোকে নিরাকারের স্বরূপ ধারণ করিতে পারে না। যাহার ভিতরে তাঁহার কোন স্বরূপই প্রকাশিত হয় নাই, ধর্ম তাহার নিকট স্বপ্ন, কুহেলিকা,—আঁধার—কল্পনার জিনিষ। কাহারও চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ধর্ম কি, তাহা বুঝাইতে পারিবে না। স্বপ্রকাশ আপনি যাহার ভিতরে প্রকাশিত হন নাই, কাহার সাধ্য তাহাকে মায়ের স্বরূপ বুঝাইবে? দেখা এবং স্পর্শ অনুভব করা চাই। তর্ক যুক্তিতে যেমন সন্দেশের মিষ্টত্ব, জলের শীতলত্ব, অগ্নির উষ্ণত্ব, স্বরূপত কাহাকেও বুঝান যায় না, তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপও বুঝান যায় না। সন্দেশের মিষ্টত্ব কিরূপ, সেই ব্যক্তিই বুঝিয়াছে, যে সন্দেশের আস্বাদন লইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ সেই ব্যক্তিই বুঝিয়াছে, যাহার কোন না কোন স্থানে সেই অরূপ অব্যয়ের সহিত কোন না কোন প্রকারে সাক্ষাৎ হইয়াছে। নচেৎ তাঁহাকে কে বুঝিতে পারে? এই জন্যই বলি, ধর্মের মূলে বিশ্বাস। বিশ্বাস—স্বতঃজ্ঞান-মূলক,—উপার্জ্জিত জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন হয় না। বিশ্বাস যেখানে আছে,

খানে জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান যেখানে আছে, বিশ্বাসও যে সেখানে কিবে, এমন কোন কথা নাই। বিশ্বাস জ্ঞানের অতীত এমন কিছু, হাতে মায়ের সহিত সন্তানের সাক্ষাৎ হয়! মাতা ও পুত্রের যোগসম্বন্ধ বাস, বিশ্বাসের পর হৃদয়ে প্রেমচন্দ্রের উদয় হয়।

মায়ের কোলে একটী অবোধ ক্ষুদ্র শিশু। জ্ঞানী নয়, বিদ্বান নয়, একটী বোধ শিশু। মাকে সে ব্যক্ত করিতে পারে না, অথচ মায়ের কোলে খা গুঁজিয়া রাখিয়া সে নিরাপদ মনে করে। মাকে সে জানে না, অথচ য়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেই সে চায়। অথবা মাকে সে যতটুক নে, তাহাপেক্ষা কত অধিক ভালবাসে! মায়ের চোখে চোখ, প্রাণে প্রাণ, ক বুক। হায়, কি গভীর প্রেমের লীলা! জ্ঞান এখানে এক বিন্দু,—বিন্দু পেক্ষাও বিন্দু। জ্ঞান ভিন্নও প্রেমের রাজত্ব! অথবা প্রেমই জ্ঞানের লে। মায়ের প্রাণে প্রাণ রাখিয়া শিশু জ্ঞান পায়, চোখে চোখ রাখিয়া কত খে, বুকে বুক রাখিয়া কত আনন্দ উপভোগ করে। জ্ঞান নাই, কিন্তু শ্বাস আছে শিশুর প্রাণে, তাই সে মাকে এত ভালবাসে। অলৌকিক মন কিছু শিশুর প্রাণে অবতীর্ণ যে, সে মাকে না জানিয়াও ভালবাসে। জানিয়া ভালবাসাতে যে কি সুখ, কি আনন্দ, তা শিশুই জানে। জ্ঞানের রে যে ভালবাসা আইসে, তাহা ত ব্যক্তিত্ব বা স্বার্থে দূষিত। স্বর্গের অনা-বল ভালবাসার স্রোত বিশ্বাস-ঘাটের নিম্নে প্রবাহিত,—তাহা স্বর্গের মন্দা-কনী। সে প্রেম আশীর সঞ্জীবনী কাহিনী। যে তাহাতে ডুবে, সেই বুঝে, প্রেম কি, ভালবাসা কি? অজ্ঞের পক্ষে তাহা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

সেই অনাবিল স্বর্গীয় প্রেম মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া মনুষ্যত্ব বা অনন্ত বিকাশের পথে লইয়া যাইতেছে। মানুষ ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠি-তেছে। শিশুর মাতৃপ্রেম শতধা হইয়া শেষে কি করিতেছে, দেখাইতেছি।

শিশু, মাতার ক্রোড়ে থাকিতে থাকিতেই মাতৃপ্রেম ছাড়া আরো কিছু পাইল। তাহা কি, জান? তাহা ভ্রাতৃ-প্রেম। মায়ের পাশে আর একটী শিশু—তাকেও সে ভালবাসিল, বুকে ধরিল। দেখিল, বুঝিল, মাকে ভাল-বাসিলেই তৃষ্ণা মিটে না—আরো বুক খালি থাকে। তাই তখন ভাই ভগ্নীকে বুকে করিয়া বসিল। ভাই ভগ্নীর মিলন কত মধুর, কে না জানে? স্বর্গ সেখানে জাগ্রত। আরো দিন যাইল, আরো বিশদ হইল। পিতা মাতার স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর ভালবাসা লইয়া সে অনেক দিন ভুলিয়া থাকিতে পারিল

মা—বাপের সহিত পূর্ব্বে দেখা শুনা বা আলাপ পরিচয় ছিল না, শেষে তাহাকে ধরিয়া টান পড়িল। দূরের মানুষকে নিকটে আসিতে হইল—স্বর্গীয় এক আশ্চর্য্য সূত্রে বন্ধুর সহিত বন্ধুর মিলন হইল। পিতৃ মাতৃ স্নেহে যে সুধা ছিল না, ভ্রাতা ভগ্নীর অকৃত্রিম স্নেহের কোলে যে অমৃত মিলে নাই—শুষ্ক কঠোর বন্ধুর হৃদয়ে পাষাণে আবৃত অনন্ত-সুস্নিগ্ধ সে অমৃতের ভাণ্ডার পাওয়া গেল! কত আনন্দ, কত সুখ! আকাশ মধুময় হইল, পৃথিবী সে সুস্নিগ্ধ প্রেমের প্লাবনে স্বর্গ হইয়া যাইল। কিন্তু এখানেও লীলার শেষ নাই। ভালবাসার নানা তরঙ্গে মগ্ন হইল, কিন্তু তবুও হৃদয় অতৃপ্ত। পরে স্বামী স্ত্রীর মধুর মিলন হইল। বিপুল সংসারে মাতিয়া মানুষেরা দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গীয় রূপ দেখিতে পাইতেছে না বটে, কিন্তু এমন কে আছে যে, এই মধুময় প্রেম-পাথারের প্লাবনে না পড়িয়া সংসারের প্রকৃত সৌন্দর্য্য, প্রকৃত মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিয়াছে? হৃদয়ে যত ফাঁক ছিল, তাহা পূরিল—আশা মিটিল, সুখ জন্মিল। কিন্তু এখানেও শেষ নয়। মাতৃ প্রেমের পার্শ্বে ভ্রাতৃ প্রেম, তার পরে বন্ধুপ্রেম, তার ধারে দাম্পত্য প্রেম, কিন্তু এখানেও বিরাম নাই। এখানে আসিয়াও প্রাণ অতৃপ্ত। এই যে প্রেমের নানা তরঙ্গ জগতে দেখিতেছে,—ইহার কোনটীর সহিত কোনটীর তুলনা হয় না। সকলই পৃথক পৃথক। জিনিস এক—কিন্তু রূপ—ভিন্ন ভিন্ন। দাম্পত্য প্রেমের পরে আবার সন্তান-বাৎসল্যের অবতরণ। পারিবারিক প্রেমের যেন বেলাভূমি যখন অতিক্রান্ত হইয়া যাইল, তখন জগৎ প্রেম বা বিশ্বপ্রেমের উদয় হইল। অনেকের ভাগ্যে এত দূর পৌঁছিতে পারা সম্ভবপর নহে, সুতরাং বিশ্বপ্রেমটা অনেকের পক্ষেই কল্পনার জিনিষ। কিন্তু একথা ঠিক, পারিবারিক প্রেম যখন সর্ব্ব দেশে জগতকে আলিঙ্গন করে—তখন হৃদয় আরো বিস্তৃত হয়—অনন্তের দিকে আরো ছুটিতে চায়। তখন আরো অতৃপ্তি। যে এত দূর পৌঁছিয়াছে, সেই ইহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। এই যে প্রেমের ঢেউ ক্রমাগত উলটি পালটি খেলিতেছে,—ইহার মূলে মা। মা-ই পৃথিবী মণ্ডলের একমাত্র সহায়—মায়ের হৃদয় হইতে প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়া, ঐ সকল প্রেমে ব্যাপক হইল। ঐ মাতৃপ্রেম আরো ফুটিল, আরো ফুটিল, আরো ফুটিল যখন—তখন তাহাই বিশ্বপ্রেম রূপ ধরিল। ভালবাসার তখন সংস্কার মুক্ত—যেদিকে চাওয়া যায়, সেই দিকেই অতুল শোভা—প্রকৃতি তখন সজ্জিত হইয়া মানুষকে আলিঙ্গন

দিকে অনন্ত বাহু বিস্তার করিয়াছে। সকলেই তখন আপন ক্রোড়ের ক্রোড়ীকৃত সত্য দেখাইতে ব্যতিব্যস্ত! দেখ, আর মজো, মজিয়া আপনার পথ। দেখিতে না দেখিতে প্রাণে প্রাণ বিনিময় হইয়া যায়। এক প্রাণ তখন শতধা, সহস্রধা হইয়া গিয়াছে—বিশ্বভুবন তখন আনন্দে নাচিয়াছে। তখনই মানুষ দেখে, সকলই একে নিমজ্জিত, সকলই একের ক্রোড়ে চিন্ময়। প্রেম-প্রসাদ পাইয়া মানুষ তখন দেখে, সকলের মূলেই এক অদ্বিতীয়, সুতরাং তাঁকেই প্রাণ সঁপিয়া তখন কৃতার্থ হয়। একেই তখন সকলের প্রাণ উৎসর্গীকৃত—এক সাগরেই সকলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতেছে! একের কোলেই সকলে মজিতেছে! একের জন্যই তখন সকলে ধাইতেছে।

সেই এক শক্তিকে পাইতে হইলে, সকল দিক দিয়াই যাইতে হইবে। যে পরিমাণে অধিক দিক দিয়া তাঁহাকে দেখা যাইবে, সেই পরিমাণে তাঁহাকে অধিক জানা যাইবে। অসংখ্য অসংখ্য নদী ঝরণা মিলিয়া মিশিয়া তবে মহা সমুদ্র। একটীকে ধরিয়া থাক, আর একটীর মহিমা বুঝিবে না। একদিকে যাও, আর একদিকের জ্ঞান তোমার নিকট আঁধার হইয়া থাকিবে। কিন্তু সকল দিক দিয়া যাওয়া বড়ই কঠিন। সকল শক্তি বিকাশের জন্যই সাধন আবশ্যক, সাধন ভিন্ন মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব। কিন্তু এ বড়ই কঠিন সাধন। জ্ঞান আর প্রেম, কর্ম্ম আর ইচ্ছা, এ সকলেরই সমান সাধন করা চাই। এক প্রেমের ভিতরেই কত রূপ, কত ভাব। মাতৃ পিতৃ বাৎসল্য, ভ্রাতৃ স্নেহ, বন্ধুর ভালবাসা, স্ত্রীর প্রণয়—এ কোন্‌টী উপেক্ষার যোগ্য? কোন্‌টী মনুষ্যত্ব লাভের বিরোধী? খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, কোনটীই নয়। পৃথিবীর বড় বড় সাধকগণ, এক এক জন, এক এক ভাবে, বিশ্বশক্তির আরাধনা করিয়া গিয়াছেন, সত্য। কেহ মাতারূপে, কেহ পিতারূপে, কেহ স্বামীরূপে তাঁহাকে পূজা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু পূজা যে সেখানে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব—বিশ্বশক্তিকে বুঝিতে হইলে, সকল প্রকার সাধনার দিক দিয়াই যাইতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া যাইয়া দেখি—সেখানে এক জনই বিদ্যমান। মাতার হৃদয়েও তিনি, ভ্রাতার প্রাণেও তিনি, বন্ধুর মুখেও তিনি, স্ত্রীর বুকেও তিনি। মানুষ যাইয়া দেখে—একেরই বিকাশ সর্ব্বত্র। এক জনই পৃথক্ পৃথক্ রূপে

ফুটিয়া পড়িতেছেন! অতএব সাধনার একদিক লইয়া কখনই পরিতুষ্ট থাকা উচিত নয়। সকল শক্তির বিকাশ হইলেই বিশ্বশক্তির সহিত স্বরূপত সাক্ষাৎ হইবে; কারণ তিনি সকল শক্তিরই সমষ্টি,—কারণ সকল শক্তির মূলেই তিনি। সকল শক্তির বিকাশ হইলেই মনুষ্যত্ব লাভ বা ধর্ম্ম লাভ, জীবন লাভ বা মুক্তিলাভ ঘটে। অনন্তের তীরে পৌঁছিয়া যে এক স্বরূপ, এক ভাব লইয়া বসিয়া রহিল, সে বিশ্বশক্তি কি, তাহা কিছুই বুঝিল না। সে এক যুক্তির আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিল—কিছুই কূলকিনারা করিতে পারিল না। অতএব—সীমাবদ্ধ ভাব হইতে অসীমের দিকে গতি যখনই স্থগিত হইবে, তখনই সাবধান হইবে। তখনই মায়ের নাম স্মরণ করিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ মাতৃ-প্রেম হইতেই আর সকল প্রেম উদ্ভূত। মাতৃপ্রেম স্মরণ করিয়া মায়ের সন্তান যখন হুঙ্কার ছাড়ে, তখন পৃথিবী কম্পিত হয়, পাপ প্রলোভন দূরে পলায়ন করে, তখনই পৃথিবী মধুময় হয়।

কয়েকটী পরীক্ষিত কথা।

১। যে সত্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ বা দ্বিধা নাই, তাহা প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা কর। একটি সত্য পালিত হইলে তবে অন্য সত্য ফুটিবে। সত্য বুঝা ও সত্য পালন করা, দুই স্বতন্ত্র জিনিষ। যে সত্য বুঝিয়াও তাহা পালন করে না, তাঁহার উন্নতি হইবে কিরূপে?

২। দলাদলিতে বা অন্যের দোষানুসন্ধানে মজিয়া আত্ম-হারা হইবে না। আপনাকে বজায় না রাখিতে পারিলে কিছুতেই উন্নতি হইবে না।

৩। যার দোষ ভুলিতে চেষ্টা করিতেছ, তার নিকট হইতে একটু দূরে যাও, আর যার গুণ গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছ, তার নিকট ঘেঁসিয়া বস। একের নিকটে গেলে অনিষ্ট, অপরের নিকট যাইলে মহালাভ।

৪। অন্যের দোষ কিম্বা ত্রুটীর বিষয় যখনই হৃদয়ে উপস্থিত হইবে, তখনই আপন দোষ বা ত্রুটীর কথা মনে করিবে; কারণ, অন্যের দোষ স্মরণে হৃদয় অবনতি প্রাপ্ত হয়। অন্যের মহত্ত্ব চিন্তনে হৃদয়কে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবে, কারণ মহত্ত্বের আদর্শে হৃদয় মন উন্নত হয়। আপনার দোষ বা ত্রুটী স্মরণ করিতে করিতে অনুতাপ অশ্রুপাত হইবে। অনুতাপ অশ্রুপাত ভিন্ন হৃদয়ের মলিনতা ধৌত করিতে কেহ পারে না। ঈশ্বরের

ষ্টির মধ্যে এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহাতে বিশেষত্বের মহত্ব নাই। মন মানবই বা কে আছে, যে আপনার জীবনে ত্রুটী বা দোষ দেখিতে য় না! আপন ত্রুটী এবং অন্যের মহত্ব চিন্তাকে জীবনের সম্বল কর।

৫। প্রত্যেকের ভিতরেই কিছু কিছু পাইবার আছে, স্মরণ রাখিবে। হাকে ভয়ানক পাপে লিপ্ত দেখিতেছ, তাহার মধ্যেও এমন অনেক নিষ আছে, যাহা আর কোথাও পাইবে না; কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কলেরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে। সৃষ্টি, উপেক্ষ্য তুচ্ছ নয়; ইহা মনে খিয়া সকলকেই হৃদয় পাতিয়া আলিঙ্গন করিবে। পাপীকে ঘৃণা করিবার ধিকার পাপীর নাই। ঘৃণা যেখানে, অহঙ্কারও সেখানে। অন্যকে ঘৃণা রিতে গেলেই অহঙ্কারী হইয়া পড়িবে। অহঙ্কার মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান তিবন্ধক। অহঙ্কার, মানুষের অভাবকে ঢাকিয়া রাখে। আপনার অভাব য দেখিতে পায় না, সে আর কি প্রকারে উন্নতিলাভ করিবে?

৬। সৃষ্টির সকল জীবকেই ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু কাহাকেও ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবে না। সকল পদার্থ বা জীবেই ঈশ্বরের শক্তি বিদ্যমান, কিন্তু কোন সৃষ্ট বস্তু ঈশ্বর নয়। সাগরের এক গণ্ডূষ বারি হাতে তুলিয়া, কখনও মনে করিবে না, সাগর ধরিয়াছ। যে যাহা, তাহাকে তাহা জানিয়াই আদর করিবে। একটাকে অন্য বলিয়া ভুল বুঝিবে না।

৭। যতদূর সম্ভব, সকল প্রকার সৎকার্য্যে যোগ রাখিতে চেষ্টা করিবে; সৎকার্য্যের স্রোতে নিমগ্ন থাকিলে পাপ প্রলোভন বা বিঘ্ন তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। সৎকার্য্যের সোপান ধরিলে ক্রমে স্বার্থ-কলঙ্কের তিরোধান হয়; এবং শেষে নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। এটা বড়, ওটা ছোট, কখনই এ গণনা করিবে না। এক ব্যক্তির বা এক বস্তুর কার্য্য যখন অপর ব্যক্তি বা অপর বস্তু দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, তখন কে ছোট, কে বড়? আপনাপন বিশেষ কার্য্য-সাধনের জন্য সকলেই বড়। আবার ঈশ্বরের সহিত তুলনায় সকলই অতি ক্ষুদ্র। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য—বৈচিত্র্যে; সুতরাং বৈচিত্র্যের আদর করিতে শিখিবে।

৯। মুখে এক, ভিতরে আর এক, রাখিবে না। ভিতরে ও বাহিরে এক রূপ হইতে চেষ্টা করিবে। যে সত্য পালনের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হও, সে সত্য মুখে বলিও না; কারণ তাহাতে তোমার প্রকৃত আস্থা জন্মে নাই। সত্য জানা ও সত্যে বিশ্বাস, দুই এক কথা নহে।

১০। কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া মানুষের ধর্ম্ম নহে, আপন কর্ত্তব্য পালন করাই ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য পালন করিলে তুমি যদি মনে কষ্ট পাও, নাচার, কি করিব? তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকিতে পারি না;—এইরূপ নির্ভীক হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিবে। ধর্ম্মানুমোদিত কোন কর্ত্তব্যেরই উদ্দেশ্য, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, হইতে পারে না।

১১। একজনের কথা শুনিয়া আর এক জনের প্রতি বিরক্ত হইবে না। মানুষ মানুষকে সকল সময়ে ঠিক চিনিতে পারে না। যে যেরূপ চিন্তায় রত, সে অন্যের মধ্যে তাহারই অনুরূপ দেখে। সুতরাং মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব বা প্রকৃত দোষ মানুষের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন।

১২। যে কেবলই পরনিন্দা করে, পর ছিদ্র অন্বেষণ করে, সে নিজে ভয়ানক পাপী, নিশ্চয় জানিবে। আপন পাপকে ঢাকিবার জন্য বা আপন মহত্ত্ব প্রচারের জন্যই সে অন্যের নিন্দা প্রচার করে। সুতরাং পর-নিন্দুকের প্রতি আস্থাবান হইয়া অন্যের প্রতি কখনই বিরক্ত হইবে না। যে উচ্চরবে অপরের দোষ কীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত থাকে, দেখিয়াছি, তাহার মনের ভিতরে বিষম পাপ-গরল পোষিত হইতেছিল। নিন্দুকের ন্যায় প্রবঞ্চক পৃথিবীতে আর নাই।

১৩। সৎপ্রসঙ্গ বা সদালাপ মনোযোগ সহকারে শুনিবে, শুনিয়া সার সংগ্রহ করিবে। বৃথা কুতর্কে কখনও রত হইবে না। কুট তর্ক সত্য-আবিষ্কারের পরিবর্ত্তে সত্যকে ঢাকিয়া রাখে। সত্য পালনই সত্য-আবিষ্কারের মূল মন্ত্র।

১৪। বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রতি কখনই অনুরাগ দেখাইবে না। দেখা গিয়াছে, বাহিরের অনুষ্ঠানে মাতিয়া অনেকে অন্তরকে হারাইয়া ফেলিয়াছে,—লক্ষ্য ভুলিয়াছে। লক্ষ্যকে প্রাণের মূলে রাখিয়া সাধন করিবে, ভিতরের দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবে,—আত্মচিন্তা ভুলিয়া বাহ্য অনুষ্ঠানের চিন্তা করিবে না। মূল কথা, যাগযজ্ঞ, গৈরিক বস্ত্র, বা বাহ্য-দীক্ষায় তাহার কি করিবে, যে হৃদয়ে গরল পোষণ করিতেছে!

১৫। প্রেম ভক্তি হৃদয়ে সমুদিত হইলে মত-মূলক ঘৃণা বিদ্বেষ আর থাকিতে পারে না;—মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলের প্রতিই ভালবাসা যায়। আত্মানুসন্ধান করিয়া সর্ব্বদাই জানিতে চেষ্টা করিবে যে, সাধনার সহিত হৃদয়ের ঘৃণা বিদ্বেষ লোপ পাইতেছে কি না? যদি লোপ পাইয়া না

কে, তবে আরো কঠোর তপস্যা করিবে। যখন ঘৃণা বিদ্বেষ তিরোহিত হবে, তখন প্রেমময়ের বিশ্ব-প্রেম হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে। ঘৃণা বিদ্বেষ যতদিন থাকিবে, ততদিন আত্মসংযম রূপ কঠোর তপস্যা করিবে।

১৬। সাধনার বা মুক্তির পথ, লোকাদিষ্ট পথ নহে। প্রাণের ভিতরে বসিয়া যে পথ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইবে, সেই পথই ধরিবে। লোকের ভয়, সমাজের ভয়ে যদি বিবেকের আদিষ্ট পথ পরিত্যাগ কর, তবে তোমার শেষত্বের রাজ্য তুমি পাইবে না।—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য তোমা দ্বারা সিদ্ধ হবে না। এই জন্যই পৃথিবীতে এত পাপের সৃষ্টি হইতেছে। মানুষের কথায় ভুলিয়া মানুষ কত অযথা কার্য্যই করিতেছে। মানুষের আদিষ্ট পথে না যাইলে, মানুষ কখনও পাপের পথ পাইত কি না, সন্দেহ। অতএব মানুষের কথা না শুনিয়া সর্ব্বদাই বিবেকের কথা শুনিবে। বিবেকের কথা না মানিলে ধর্ম্ম টিকে না।

১৭। যদি ধর্ম্ম চাও, তবে সংসারকে উপেক্ষা করিতে শিখিবে;—অন্যের প্রশংসা বা নিন্দা শ্রবণে কখনই বিচলিত হইবে না; কারণ উহার কোনই মূল্য নাই। সকল বস্তুই ঈশ্বরের সৃষ্ট, ইহা জানিয়া সকলকেই ভালবাসিবে, কিন্তু কাহারও আসক্তিতে মজিবে না। ভালবাসা এবং আসক্তিতে মজা, এক কথা নহে। ভালবাসার মাত্রায় বদ্ধ হইয়া যখনই বুঝিবে যে, কর্ত্তব্য পালনে আর বল পাইতেছ না, তখনই বুঝিবে, আসক্তি তোমাকে ঘিরিয়াছে;—বীরের ন্যায় তখন আসক্তি-রজ্জু ছিঁড়িবে। প্রকৃত বীরত্ব এইখানে। কর্ত্তব্যপালন, ধর্ম্মের প্রধান সোপান। বিবেক, কর্ত্তব্যের নেতা। এই সোপান অবলম্বন করিয়া থাকিবে, কখনই যেন পা পিছলিয়া না যায়। কর্ত্তব্য পালনের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বস্ব যখন পরিত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই বুঝিবে, তোমার আসক্তি ছিঁড়িয়াছে; নচেৎ মুক্তি থাকিবে না, ক্রমাগত চেষ্টা করিবে। কর্ত্তব্য পালনের জন্য দেহ বিসর্জ্জন দিয়াই খ্রীষ্ট বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন, মনে রাখিবে।

বৈদ্যনাথ হইতে কোন বন্ধুর নিকট লিখিত কয়েকখানি পত্রের সারাংশ।

(১)

প্রিয়ভাই * * * *

তোমার পত্রখানি পাইলাম। * * কেবল অনন্ত বিশ্বাস-প্রসূত নির্ভরের

কথা পাঠ করিয়া যেমন সুখী হইলাম, তোমরা আমাদের সংবাদ পূর্ব্বে দাও নাই,—তোমাদের চোখের সম্মুখে এরূপ ঘটনা ঘটিল, ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, সকলই মায়ের আশীর্ব্বাদ। অনাহার—উপবাস—ইহাও মায়েরই প্রসাদ। এইরূপ করিয়াই মা নির্ভরশীলতা শিক্ষা দেন। আমার আশা আছে, এবার তোমরা মায়ের জীবন্ত বিধানের মধ্যে দীক্ষিত হইতে পারিবে। আমার আশা আছে, মায়ের কৃপায় এবার তোমরা ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে সমর্থ হইবে। কঠোর পরীক্ষাই ভক্তিমার্গের পথ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ভক্তিঘাটে পৌঁছিতে পারিবে। আনন্দআশ্রমে ৩ই মাঘ (১২৯২) হইতে অন্যায় ভক্তির মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মা বই আর কিছুই নাই—কেবল মা, কেবল মা, তিনি যাহা করেন, তাহাই মঙ্গলের জন্য, তাহাতে ভীত বা দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। এই গভীর সাধনায় তোমরা সিদ্ধ হইলে আমি কৃতার্থ হইব। টাকা কড়ির জন্য যে চিন্তা করে, সে ভক্তিঘাট হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। মাকে ডাক, মা সকল দিবেন। কেমন করিয়া দিবেন, তাঁহার কি বিধান হইবে, তাহা বিচারের প্রয়োজন কি? মা লীলাময়ী, মা আনন্দময়ী—তাঁহাতে তোমরা ডুবিয়া যাও। সকল বাসনা পূর্ণ হইবে। তুমি লিখিয়াছ, তুমি এবার হইতে অর্থের চেষ্টা করিবে, শুনিয়া একটু হাসিলাম। ভাই, আমার প্রাণের ভাই, তোমার আমার চেষ্টায় কি হইবে? যাঁহার চেষ্টায় হয়, তিনি অবিরত চেষ্টা করিতেছেন। দুঃখ, নিরানন্দ, এসকল থাকিবার নয়, থাকিবে না। মা আমাকে বলেন,—আমার দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও—অন্যের জন্য জীবন ঢালিয়া দেও। আমি যত দিন আছি, ততদিন তোমাদের চিন্তা কি? অভাব কোথায়? আমরা যে রাজেশ্বর হইয়াছি, তাহা কি তুমি বুঝ না? রাজেশ্বরের কথা—ভিখারী, মায়ের দাস। মা আছেন, দুঃখ কোথায়, অভাব কোথায়? যদি তোমাদের কোন কিছুই চেষ্টা করিতে হয়, তবে মাকে হৃদয়ে বাঁধিতে চেষ্টা কর। যদি চেষ্টা করিতে হয়, মায়ের তত্ত্বজ্ঞানে যাহাতে দীক্ষিত হইতে পার, তাহারি চেষ্টা কর। জ্ঞান আর প্রেম, ইহার সাধনার উপযুক্ত সময় এই। জ্ঞান আর প্রেম ঘনীভূত হইলেই ভক্তিতে পৌঁছিবে, মায়ের প্রসাদ লাভ করিবে।

রাধাচরণ বাবুর মাতৃ-প্রেমের কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। রাধাচরণ বাবু এবং বিদ্যাসাগর যাহাতে মাতৃ-প্রেমে দীক্ষা হয়, তজ্জন্য তোমরা সাধ্যমত

উঠে। মায়ের করুণারূপ সঞ্জীবনীশক্তি ভিন্ন রোগীর আরোগ্যের সম্ভা- । কোথায় ?

আমার প্রাণ পূর্ণ। আমি আজ কাল যে অবস্থায় আছি, এ অবস্থা নার ভা... অনেক দিন ঘটে নাই। আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, হা কি ... ভুলিতে পারি ? মায়ের আশীর্ব্বাদে আজ আমার প্রাণ । ... কে বলে, মায়ের রাজ্যে অবিশ্বাসী আছে ?—মা সকলকেই দিবেন। দের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমার এই সময়ের পত্র গুলি তোমরা বলে পড়িবে। পত্রের ভিতর দিয়া মায়ের অনেক আশীর্ব্বাদ ইতেছে।

(২)

প্রিয় ভাই * * *

তোমার পত্র পাইলাম। আমার পত্র কোন্ সময়ে তোমাকে আনন্দ বে, তাহা বুঝিলাম না। আমার মনে হয়, আমার মৃত্যুর পরে। অনুমান তা কি ? *

তুমি মনে করিয়াছ, তোমার কথার গভীর অর্থ আমি বুঝি নাই বলিয়া লিখিয়াছি। তা নয়। ভুল বুঝিয়াছ। তোমার ঐ কয়েকটী কথার মধ্যে ভুত গভীর প্রেমের ভাব আছে। আমি তোমার মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর বকশিত হইতেছে দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়াছি। "তুমি আমার সহায় হইবে এবং আমার সদনুষ্ঠানে"—ইত্যাদি কথা ভাবপূর্ণ। তোমরা ত আমার হায় আছই—নচেৎ মা তোমাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া কোলে দিয়াছেন কেন ? আমার আশাস্থিত উন্নতির জন্য—তোমরা আমার প্রিয় ভাই। ময়নাপুরের সেই পর্ণকুটীরে অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু তোমাকে দেখাইয়া মা বলাইলেন কেন ?—তুমি আমার সহায় হইবে বলিয়া। আমি তা জানি। "আমার "সদনুষ্ঠান"—ইহা ভুল কথা। আমার অনুষ্ঠান কিছুই নাই,—সকলই মায়ের অনুষ্ঠান,—আমি তাঁহারই হাতের পুত্তলিকা মাত্র। মাকে দেখ, আর মায়ের কাজের জন্য প্রস্তুত হও। সময় আসিলে, যাহা করিবার তাহা আপনি করিতে পারিবে। এখন তুমি শিশু, আরো শিক্ষিত হবে। মায়ের উপর নির্ভর করিয়া যে নষ্টই না পাইবে, তাহার ভাগ্যে সন্তোষ নাই। মায়ের উপর নির্ভর কর—মনের আঁধারের পরি- বর্ত্তে আলো ফুটিবে—স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিবে—ভক্তি-প্রবাহ বহিবে।

মায়ের মহাযজ্ঞে আহুতি—জীবনাহুতি দিবার জন্ত অনেক আয়োজন চাই। আয়োজন কর—জীবন অবশ্য ঢালিয়া দিতে পারিবে। সে আয়োজন— জ্ঞান এবং প্রেম,—গভীর জ্ঞান, গভীর প্রেম। আকাঙ্খন [illegible] জ্ঞান, ভক্তিপূর্ণ প্রেম। এই আয়োজন হইলে কে কাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? আমি অতি সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি,—ভাই, মায়ের চরণে তোমার আমার ন্যায় ভ্রাতা ভগ্নীর জীবনাহুতি দিবার পূর্ব্বে অনেক-বার অশ্রুপাত করার প্রয়োজন। সে জ্ঞান কোথায়, যে জ্ঞানের উদয় হইলে সর্ব্বঘটে মায়ের অনন্তরূপ-নিরীক্ষণ করা যায়?—সেই প্রেমই বা কোথায়, যে প্রেমের উদয় হইলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেও আলিঙ্গন করিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়? আনন্দ-আশ্রম কেবল আয়োজনের জন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সঞ্চয় কর, পাও, ডুব, এখনকার কথা এই। যখন সঞ্চয়ের শেষ সমাপ্ত হইবে, তার পরেই মায়ের ভাগবতের অভ্যুত্থান দেখিবে। সে মায়ের লীলা। মা ভক্ত না করিলে কে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে? কে জীবন দিতে পারে? কে যশমানের কুহেলিকা ভুলিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে? মত্ততাই প্রেম নহে, আস্ফালনই পুণ্য নহে, আড়ম্বরই যজ্ঞ নহে। ভাই, ভুল বুঝিও না। ব্রাহ্মসমাজ দিন দিনই প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে পদস্খলিত হইতেছেন। সাবধান! সাবধান! মাকে ভুলিয়া—আইন নাই, শাস্ত্র নাই, সমাজ সংস্কার নাই, প্রকৃত ধর্ম্ম নাই। মাকে ভুলিয়া ব্রাহ্মসমাজ আপন হস্তে রাজা শাসনের ভার লইতে চাহে, পাপীকে শাসন করিতে চাহে, আমার ন্যায় নরাধমকেও বাঁধিতে চাহে। ভাই, কঠোর সাধনা কর—প্রাণে ডুবিয়া যাও। মায়ের নাম করিতে করিতে যখন শরীর রোমাঞ্চিত হইবে—যখন নীরব অশ্রুর পতন হইবে, তখন বুঝিবে, কিছু হইয়াছে। নির্জ্জনে বসিয়া মাকে কাছে পাইয়া যখন পাগল সন্তানের ন্যায় মনের কথা তাঁর কাছে বলিতে পারিবে, তখন বুঝিবে, কিছু হইয়াছে। সে কিছু গভীর—চঞ্চলতা শূন্য, জীবনপ্রদ। তখন দেখিবে, বাসনার আগুন ক্রমে ক্রমে নিবিয়া যাইতেছে—সংসারের স্বার্থ চলিয়া যাইতেছে—কে যেন সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন! এই প্রকারে মা যখন তোমার নয়নের জ্যোতি, প্রাণের সুখ হইবেন, তখন তোমার জীবন মহাযজ্ঞে লাগিবে। আমার প্রাণের ভাই, আমার আশা আছে, মা তোমাকে সে অতুল্য সুখের অধিকারী করিবেন। মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

(৯)

স্নেহের ভাই—

আর আর তোমার পত্র পাইলাম না। পত্র না পাইলেও তোমার নিকট পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহার মধ্যে মায়েরই কৃপা বর্ত্তমান। মায়ের কৃপায় ভ্রাতৃপ্রেম আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। আমি তোমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে বড়ই লালায়িত হইয়াছি। পারিব কি না, তা মাই জানেন। আর জান, তুমি। প্রাণের দ্বার যে ভাই কৃপণের ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল, সে ভ্রাতৃপ্রেমে বঞ্চিত। সুতরাং ভ্রাতৃপ্রেমের মূলে যে মাতৃপ্রেম, তাহাতেও বঞ্চিত। তুমি তোমার প্রাণের দ্বার কি আমার বিরুদ্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? রাখিবে কি এই জন্য যে, আমি মিষ্ট কথার পরিবর্ত্তে রূঢ় কথা ব্যবহার করিয়া তোমার কোমল প্রাণে আঘাত করিয়াছি! তাহা হইলে আমার দুঃখের সীমা থাকিবে না।

না, প্রাণের ভাই, তোমার হৃদয় এত পাষাণময় নয়। আমি ভ্রাতৃপ্রেম বুঝিতে ভুল করি নাই। আমি তোমাকে চিনিয়াছি। আমি তোমার মহত্ত্ব জানি, তোমার দোষও জানি। দুই জানি বলিয়াই ভালবাসি। তোমার মহত্ত্বের পরিচয়—নীরব ভ্রাতৃ-প্রেমে। আমার রোগের সময়, একদিন আমার চক্ষে ঘুম আসিতেছিল না। তুমি ব্যস্ত হইয়া আমার শিয়রে বসিয়া চুল টানিয়া দিতেছিলে! চুল টানিয়া নহে,—আমার প্রাণকে তোমার প্রাণের ভিতরে টানিয়া লইতেছিলে। আমি নীরবে মায়ের নিকট তোমার গভীর ভালবাসার কথা বলিলাম। এই রোগেই যদি আমার জীবনের শেষ হইত, তোমার ঐ গভীর স্নেহ লইয়া যাইতে পারিতাম। তাহা ত হইল না। এখন তোমাকে আরো প্রেমিক দেখিতে চাই। এই পর্য্যন্ত লিখিতে লিখিতে চক্ষের জল পড়িল। কেন পড়িল, তুমি বুঝিয়া লও। মা কি তোমাকে আরো প্রেমিক করিবেন না? মা কি তোমাকে আমার প্রাণের ভাই করিবেন না?—মা কি তোমাকে ভক্তির রাজ্যে বাস করিবার সহায় করিবেন না। আমার আশা—তোমার উপর এবং ভাই * * উপর; আর আশা—তোমার * * * উপর। যদি তোমরা কষ্ট করিয়া আমাকে বাঁচাইলে, তবে আমি যাহাতে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারি, তজ্জন্য তোমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। ভ্রাতার সাহায্য ভ্রাতার বড়ই আদরের জিনিষ। প্রাণে প্রাণে না মিশিলে, প্রাণের সাহায্য লাভ করিতে পারে না। তাই

* * কোথায় ?—যেখানে কেহ আসিবে না, আমার বুকের ভিতরে ; [illegible] কেহ তাহা জানে না। আমার আমার বোধ না হইলে—আ[illegible] কাহারও তাহা বুঝিতে পারে না। প্রাণ খুলিয়া দেও, আমি তাহাকে [illegible] করি ; আমার প্রাণ খুলিয়া দিয়েছি, তোমরা তাকে লইয়া আবার [illegible] প্রবেশ কর। এবার তোমাদের খোলা প্রাণ দেখিতে চাই। [illegible] দ্বার বন্ধ করিয়া রাখ, ধর্মের নিকট নিশ্চয় অপরাধী হই[illegible]

(৪)

প্রিয় ভাই * * ,

মায়ের বিধান দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। অনেক স্থান্ দেখিয়াছি—কিন্তু এখানে মায়ের এমনই বিচিত্র বিধান যে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। সবই একেবারে পাহাড়ময়—পাহাড়ের তরঙ্গ উঠিতে উঠিতে যেন থামিয়া গিয়াছে—চতুর্দিকে জমাট পাহাড়-তরঙ্গ শোভিতেছে! এই অপরূপ শোভা দেখিয়াও এদেশের লোক মজে না। তাই তাহাদের এত দুর্দশা। এমন দরিদ্র দেশ, আর কোথাও নাই।

তোমার যে কথাটা তুমি তুলিয়াছ, তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমি অতি ক্ষুদ্র, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবতা। আমার উত্তরে তুমি কি সুখী হইবে ?—

আমি বলি—ইচ্ছা করিয়া যাহারা গোপন করে, ইচ্ছা করিয়া গোপন করাও পাপের। "Let not thy left hand know &c."—ইত্যাদি কথাতে যেন কিছু অন্য নির্দেশের ভাব রহিয়াছে। আমি কে ?—আমি কি করিতে পারি—আমার ইচ্ছা কোথায় ? ইচ্ছাকে যে বলি দিতে না পারিল, সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারূপ সাগরে নিমগ্ন হয় নাই। আমি বলি—সকলই তাঁহার—তিনি গোপন করিতে বলেন, কর, না করিতে বলেন, করিও না। একজনকেই সংসার ছাড়িয়া যাত্রা করিয়া দিতে চাই। ধর্মজগতে Policy নাই,—দশজনের অন্যায় দেখে লুকোচুরি নাই। যাহা কিছু মানুষের, আপন উপার্জিত তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবে, ভগবানের যদি সে ইচ্ছা না হয় ? তিনি সকল[illegible]টে ফুটিয়াছেন, তিনি আপনাকে প্রকাশ করিবেনই করিবেন। যে দেখে না, সে অন্ধ, যে ঢাকে, সে বিধান বুঝে না। বিধান এই—মায়ের উপর নির্ভর কর—তাঁহার ইচ্ছাকেই পূর্ণ হইতে দেও—ফিরিয়ে করিও না।

সমাপ্ত

সর্ব্বত্রই মায়ের হাসি ফুটিতেছে। প্রেমের আর এক নাম—মায়ের করুণা; অর্থাৎ স্বয়ং মা।

এমনই করিয়া মায়ের অনন্ত স্বরূপ আবিষ্কৃত হইতেছে। অনন্তরূপিণী অনন্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়া বাহির হইতেছেন। অনন্ত প্রকৃতির মূলে এক অদ্বিতীয় শক্তি। তাঁহাতেই সকলে স্থিত, জীবিত। তিনি তাঁহার শাস্ত্র পরিষ্কার অক্ষরে অবিরত মানুষের চরিত্রে লিখিয়া দিতেছেন। শাস্ত্রে, তন্ত্রে, বাইবেলে, কোরাণে যে সকল সত্য আছে, তাহাও তাঁহার প্রদত্ত; আর তোমার আমার ভিতর দিয়া যে সকল সত্য বাহির হইতেছে, তাহাও তাঁহার প্রদত্ত। অনন্তের অনন্ত বেদ, অনন্ত বেদান্ত। অনন্ত বেদান্ত, অনন্ত কালে রচিত হইবে। অনন্ত সত্য—অনন্ত কালে আবিষ্কৃত হইবে। বেদরচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, যে বলে, সে সৃষ্টির অনন্ত রহস্য আজও বুঝে নাই। আমি সেই বিধান (Revelation) ই মানি, যাহা অনন্তকালে অনন্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইবে। এক যুগকে মানিতে যাইয়া অন্য যুগকে ঘৃণা করিতে পারি না। এক মহাত্মাকে মান্য করিতে যাইয়া, অন্যান্য সকলকে উপেক্ষা করিতে পারি না,—একটী পরমাণুকেও পারি না। সত্য ভগবানের হাতের জিনিস। সকলের ভিতর হইতে সত্যকণা বা মায়ের স্বরূপ ফুটিতেছে। কণা কণা মিলিয়াই অনন্ত উৎপন্ন হইতেছে। আমি বলি, কেবল মানুষে নহে, প্রকৃতির সকলের ভিতরই শিক্ষার বস্তু রহিয়াছে *। এমন কিছুই এই পৃথিবীতে সৃষ্ট হয় নাই, যাহার কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি এমন বিনয়কে পাপ বলি, যাহাতে মানুষের আত্মমর্য্যাদাকে (self-respect) ডুবাইয়া দেয়। আত্মমর্য্যাদা—ভগবানেরই মর্য্যাদা। সকলেরই ভিতরে শিক্ষার জিনিস—ভগবানের প্রদত্ত সত্য রহিয়াছে। উপেক্ষার কথা, অপ্রেমের কথা; ঘৃণার কথা, অজ্ঞানের শাস্ত্র। ও শাস্ত্র আমি মানি না। বেদে সত্য আছে বলিয়া, যে বলে, বাইবেলে সত্য নাই, সে মিথ্যা বলে। সত্য অবস্থা বা সময়ের দাস। সকলের পক্ষে চিরকাল এক সত্য উপকারী নহে। যাহার জন্য যে সত্য বিধাতা প্রেরণ করেন, তাহাই সে মানুক। প্রতি মুহূর্ত্তে বিধাতা সকলের উপযুক্ত সত্য প্রেরণ করিতেছেন। আবার বাইবেলেই

* উইলিয়ম্ ব্লেক্ বলিয়াছেন :—"I never know a bad man in whom there was not someting very good." এমার্সন বলিয়াছেন—"Every man I meet is my master in some point, and in that I learn of him."

সকল ধর্মকথা লুকায়িত, যে মনে করে, সেও ভগবানের ব্যক্তিগত বিধানের মূলে কুঠারাঘাত করে, সে বিধাতার বিধান মানে না। আর Revelation তো সে মোটেই মানে না। সে শক্তির বা প্রকৃতিকেই অস্বীকার করে। ফুলে কথা কয়, জলে গান গায়, আকাশ ইঙ্গিত করে, দুর্বল মানুষ স্বর্গে উঠে, এ সকল সে দেখে নাই। বাইবেলও যাঁহার, বেদও তাঁহারই প্রদত্ত। অনন্ত-স্বরে, অনন্ত কণ্ঠে প্রকৃতির ভিতর দিয়া তালে তালে প্রতি মুহূর্তে কে যেন কথা বলিতেছে! শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে, ভ্রমণে সে স্বর শুনা যায়। সে কথা যে শুনে না, সে মানুষই নয়। মানুষ কে? মানুষ কেবল তাঁহার হাতের পুতুল মাত্র। মানুষকে এবং প্রকৃতিকে যে ব্যক্তি ভগবানের হাতের জিনিস মনে করিতে পারে নাই, সে আজও প্রেমের অভ্রান্ত বেদ বেদান্তে দীক্ষা লাভ করে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহার হাতের পুতুল, মহাত্মা খ্রীষ্টও তাঁহারই প্রেরিত; মহম্মদও তাঁহার, শাক্যও তাঁহার, মনুও তাঁহার, যোগী ঋষি, সাধু অসাধু, আমি তুমি সকলই তাঁহার। যোগী ঋষিদের জন্ত যেমন সত্য প্রেরিত হইয়াছিল, আমাদের জন্তও সেইরূপ সত্য প্রেরিত হইতেছে। ধর্ম এই জন্ত, যুগে যুগে বিভিন্ন হইয়াছে। পাপী পুণ্যাত্মার ভেদাভেদ, অবস্থা-গত পার্থক্য মাত্র। সকলের জন্ত একরূপ বিধান নহে। সকল কালের জন্ত একরূপ বিধান হইতে পারে না। বিধাতার বিধান অনন্ত। কাহাকেও দোষ দেওয়া উচিত নহে। পাপী পুণ্যাত্মা, সকলের ভিতরেই অবস্থানুরূপ সত্য প্রেরিত হইতেছে। পাপ পুণ্য অবস্থার সীমারেখা মাত্র,—অপূর্ণতার কোলে পূর্ণতার চিত্র মাত্র, সীমার পার্শ্বে অসীম রেখা মাত্র।* প্রেমের অভাবই পাপ। প্রেমের অভাবই অবনতি, কারণ প্রেম ভিন্ন উন্নতির পথের আর নেতা নাই। অবনতিই পাপ, উন্নত ব্যক্তির নিকটে; উন্নত ব্যক্তি,—আরো উন্নত ব্যক্তির নিকট অবনত। সুতরাং পাপী সকলেই। পূর্ণতা মানুষে নাই। অবনত যে, সেও উন্নতিতে যাইবে। উন্নতি হইতে উন্নতিতে—আরো উন্নতিতে, আরো উন্নতিতে। পূর্ণতা লাভ কখনই ঘটিবে না। পথ পৃথক পৃথক, এই মাত্র প্রভেদ। কেহ এ পথে যায়, কেহ ও পথে যায়। কেহ এ সত্য ধরে, কেহ অন্য সত্য অবলম্বন করে। কেহ ভাত খায়, কেহ রুটী খায়। কেহ বেদ মানে, কেহ কোরাণ মানে, কেহ

* "There is no virtue which is final; all are initial. The virtues of society are vices of the saint."—*Emerson.*

আপনার বিবেক মানে। সকলেরই সত্য জীবন লাভ। পরস্পরকে যে ঘৃণা করে, সে মায়ের বিধান বুঝে না। তোমাকে যে দেখে, সে পূর্ণ প্রেম-ময়ী অনন্তরূপিণী ভগবতীকে বুঝে নাই। সকলেরই ভিতরেই তাঁহার মহিমা, তাঁহারই গৌরব, তাঁহারই লীলা-রহস্য উদ্ভিত হইতেছে। বেদ পড়, বাই-বেল পড়, কোরাণ পড়—শাস্ত্র ভূরি সব পড়,—কিন্তু দেখিবে তবুও তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তোমার মন আরো যেন কি চায়! পাও, আরো পাইতে ইচ্ছা হইবে। শিখ, আরো শিখিতে ইচ্ছা হইবে *। সকল বেদ বেদান্ত তন্ন তন্ন করিলেও তোমার তৃষ্ণা মিটিবে না। তোমার জন্য যে অনন্ত ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত, তাহাতে তোমাকে ডুবিতেই হইবে। বৎসরের উপর বৎসর, যুগের উপর যুগ, কোটি যুগেও তোমার শিক্ষা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে না। অনন্ত বিধান, অনন্ত শাস্ত্র, ভগবানের প্রত্যক্ষ অনন্ত সত্য;—তাহা শেষ হয় নাই, শেষ হইবে না। জীবন্ত অনন্ত নূতনত্ব যে না মানিল, সে বড়ই ভ্রান্ত। বেদ বেদান্তের সত্য আদরের, গৌরবের, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সকল সে সময়ের লোকের জন্য। এখনকার বিধান, এখনকার জন্য। বুদ্ধের পরে শঙ্কর, শঙ্করের পরে শ্রীচৈতন্য। মুসার পরে ঈশার জন্ম। বেদের পরে বেদান্ত; Old Testament এর পরে New Testament. নূতন কালে নূতন লোকের জন্য নূতন সত্য চাই। চিরকাল বিধাতার রাজ্যে তাহাই হইয়া আসিতেছে। যুগে যুগে নব ধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। পুরাতন বাইবেল, পুরাতন কোরাণ লইয়া মানুষ চিরকাল উন্নতিকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। নূতনত্ব যদি তাহাতে মানুষ না পায়, তবে মানুষ তাহার আদর করিবে না। সে সময়ের যোগী ঋষীদিগের পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে—তাঁহাদের মহত্ত্বের উপর কত শত যুগ যুগান্তের মহত্ত্ব রাশীকৃত হইয়া পড়িয়াছে, সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া কে কেবল উঁহাদিগকে লইয়াই থাকিবে? সকলকেই মানুষ চায়। সকলের ভিতরেই নূতনত্ব—অনন্তভাব; অনন্ত শিক্ষা;—অনন্ত তৃষ্ণা। খ্রীষ্টের উন্নত ভাবকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া মহম্মদের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারি না। তাঁহারা বড় হউন, মহাত্মা হউন, কিন্তু অতি ক্ষুদ্রের ভিতরেও নূতনত্ব আছে; তাহাকেই বা কে ভুলিয়া থাকিবে? পৃথিবী

* Montesquieu said:—"The love of study is in us the only eternal passion."

তাহা পারে নাই, পৃথিবী তাহা পারিবে না। আবার পৃথিবীর সকল সাধুদিগকে মারিতে যাইয়া নিজের জন্ত ভগবানের যে বিধান আসিতেছে, তাহাও উপেক্ষা করিতে পারি না। ঘৃণা বিদ্বেষ, প্রেমের শাস্ত্রে নাই। ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিৎ—প্রেমিকের নিকট সমান। আজ হউক, কাল হউক, পৃথিবী এ সত্য বুঝিবেই বুঝিবে যে,—পরস্পরের ভিতরেই তাঁহার মঙ্গল সত্য সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে। উক্ত বালুকাময় মরুভূমিতেও স্বর্গের কুসুম মুকুলিত হইতেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে, দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, যুগে যুগে তাঁহার সত্য সকল নানা বেশে, নানাভাবে প্রকাশিত (Revealed) হইতেছে। তিনি স্পষ্ট কথা বলেন—এই বিশাল-বিস্তৃত প্রকৃতির কাণে কাণে! তোমার প্রাণে তাঁহারই ভাষা, আমার প্রাণে তাঁহারই ভাষা। ফুলে তাঁহারই সৌরভ, ফলে তাঁহারই মিষ্টতা। বায়ু তাঁহারই কথা বলে, নদীতে তাঁহারই কথা প্রচার করে। চন্দ্র সূর্য্য তাঁহারই মহিমা ডাকে। নূতন কোথায়? প্রাচীনত্ব কোথায়? কেবল নূতন ভাব, কেবল নবীন প্রেমের কাহিনী। সকলের ভিতর দিয়াই সেই অনন্ত মহানের গভীর প্রেমের শাস্ত্র ফুটিয়া পড়িতেছে। একজন কর্ত্তব্য শেষ করিয়া, মায়ের কথা প্রচার করিয়া, শরীর দিতেছে, আর এক জনের উপকার হইতেছে। একের শরীরের যেমন পতন অনিবার্য্য, অন্যের উত্থান তেমনই অনিবার্য্য। শরীর লোকের বাড়ি, উহা কিছুই নয়,—উহা প্রেমের খেলার ভাণ্ড। শরীর কিছুই নয়, উহা অবস্থার দাস মাত্র। শরীর কিছুই নয়, কেবল সত্য গ্রহণের অবলম্বন মাত্র। এক সত্য গ্রহণের সহিত উহা রূপান্তরিত হইয়া অন্য সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। আবার হয়, আবার হয়। হইতে হইতে ক্রম-উন্নতিতে যায়। ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। পৃথিবী যে দিন দিন কত উন্নত হইতেছে, তাহার পরিমাণও হয় না। যে পৃথিবীর উন্নতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কেবল প্রাচীনত্ব লইয়া পড়িয়া থাকিল, তাহার পরিণাম কে বলিতে পারে? আর যে কেবল বর্ত্তমান যুগের চিন্তায় মজিয়া, প্রাচীন কাহিনীর নূতনত্বের ভিতর নিমগ্ন হইয়া, [illegible] করিতে পারিল না, তাঁহার পরিণামই বা কে বলিতে পারে? সময়ের ভাব বুঝিয়া যে এদিক, ওদিক, একাল, সেকাল—সকলের ভিতরেই নূতনত্ব দেখিল, সেই প্রেমের শাস্ত্র বুঝিল। সেই উন্নতির পথে চলিল। আবার বলি, পাপ যদি থাকে, তবে তাহা মানুষকে বিপাক-বিভূতি

প্রেম হইতে বঞ্চিত করে, তাহাই পাপ। পাপ যদি কিছু থাকে, তবে যাহাতে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে শিখাইয়া অবনতির পথে মানুষকে লইয়া যায়, তাহাই পাপ। কিন্তু অবনতিই উন্নতির সোপান; পাপই পুণ্যাশ্রমের সিঁড়ি * এ হিসাবে পাপ অপরিহার্য্য। অপরিহার্য্য বলিয়াই পাপ ঘৃণিত নহে। পাপ প্রেমের রূপান্তর—কিছু। যে কিছুকে [illegible] মানুষ অবশ্য প্রাপ্ত হয়,—দিবস, রজনী, লাল, কাল, সকলের বিশেষত্ব-মূলক আদর তাহার নিকট লোপ পায়। এমন অন্ধের চক্ষুতে যখন আবার প্রেম-চস্মা সংযুক্ত হইবে, তখনই আবার বৈচিত্র্য মধুময় হইবে। যে প্রেম-চস্মা পরিল, সে সকল বস্তুতেই ভগবানের অভ্রান্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া যাইল। যে মোহিত হইল, সেই অনন্তের একসিঁড়ি উপরে উঠিল। প্রেমের চস্মা চক্ষে পরিয়া দেখ, সকলই তোমার নিকট মধুময় বলিয়া বোধ হইবে। প্রেম-চক্ষে দেখ, সকলই সুন্দর, সকলই নূতন দেখিবে। নচেৎ এই ধনধান্যপূর্ণ ধরা তোমার নিকট মৃতের ন্যায়। প্রেমের শাস্ত্রেই সৃষ্টির গভীর রহস্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রেম যে কাহাকেও পুরাণ করে না, কুৎসিৎ করে না, সে এই জন্য যে, মানুষ সকলের ভিতরে প্রবেশ করিবে এবং সকলের ভিতরের লুক্কায়িত বিশেষত্বের অধিকারী হইবে। কিসের জন্য সৃষ্টি, যদি এ সকলে আমার উপকারের কিছু না থাকিবে? কিসের জন্য সকলেই আমাকে আপন আপন রূপ দেখাইতে আহ্বান করে, যদি তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমার উপকারের কিছু না থাকিবে? কিসের জন্য স্মৃতি—যদি প্রাচীন তত্ত্বে আমি নূতনত্ব না পাইব? কিসের জন্য চক্ষু, যদি এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিকে দেখিয়া আমার উন্নতির কিছু না পাইব? সৃষ্টির গভীর রহস্য এই—একবস্তু অন্য বস্তুর জন্য সৃষ্ট। এক, অন্যের গুরু—শিক্ষক; এক, অন্যের উপকারী। বেদ বেদান্ত—সে আমারই জন্য; ঈশা মুষা—আমারই জন্য; বাইবেল কোরাণ—আমারই জন্য; চন্দ্র সূর্য্য—আমারই জন্য;—পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখের, যাহা কিছু উপভোগের, সে সকলই যেন আমার জন্য। আমি ভাবিতেছি, সকলই আমার জন্য; তুমি ভাবিতেছ—প্রকৃতির সকলই তোমার জন্য। অতএব সকলের জন্যই সকল সৃষ্ট। প্রকৃতির ভাণ্ডার সকলের জন্য

* চ্যানিং বলেন—"Man sins through an exposure which is designed to carry him forward to perfection; so that the cause of his guilt points to a continued and improved existence."

অব্যাহত-ধার। আমার জন্য তুমি, তোমার জন্য আমি। তুমি কেবল তোমার জন্য নও, আমিও কেবল আমার জন্য নই। আমাকে ধরিয়া তুমি চলিবে, তোমাকে ধরিয়া আমি চলিব। যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে—সে সকলই সকলের জন্য। কেহ দেয়, কেহ নেয়। কেহ দিয়া উপকার করে, কেহ গ্রহণ করিয়া উপকার করে। পাখীর কণ্ঠে স্বর আছে, কিন্তু আমার কর্ণ না থাকিলে, তাহা আমি শুনিতাম না; ফুলে সৌরভ আছে, কিন্তু আমার ঘ্রাণ-শক্তি বা নাসিকা না থাকিলে আমি তাহা পাইতাম না। এই জন্য, ঐ স্বর এবং ঐ সৌরভের সৃষ্টির সহিত আমার কর্ণ এবং নাসিকার সৃষ্টি হইয়াছে। আমার হৃদয়ে দয়া আছে, কিন্তু সে দয়াবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইত না—যদি পৃথিবীর কাঙ্গাল দরিদ্র না থাকিত। একের সহিত অপরের কেমন যোগ, দেখ। সকলের সহিত সকলের যোগ। অণু অণুতে, মানুষে মানুষে, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রে সেই যোগ বিস্তৃত; সেই যোগ—মাধ্যাকর্ষণ-মহাযোগ। একের ক্ষুধা আছে, অপরের ক্ষুধা নিবারণের শক্তি আছে,—এক অপরকে উদরস্থ করিয়া উন্নতির পথে হাঁটিতেছে। পাকস্থলী দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়াছেন—ক্ষুধা নিবারণের আয়োজনও রহিয়াছে। দয়া দাক্ষিণ্য দিয়াছেন, তাহা পরিচালনার ক্ষেত্রও দিয়াছেন। কেমন অপরূপ প্রেমের যোগ দেখ। যাহা কিছু দেখা যায় বা দেখা যাইবে, সে সকলই পরস্পরের জন্য সৃষ্ট। গভীর যোগ—সকলের সহিত সকলের। তণ্ডুল আমারই জন্য সৃষ্ট, আমি তণ্ডুলের জন্য সৃষ্ট। তণ্ডুল আমার উন্নতির কারণ, আমি তণ্ডুলের উন্নতির কারণ। আমি তুমি না থাকিলে তণ্ডুলের যাহা পরিণাম, তাহা ঘটিত না, আবার তণ্ডুল না থাকিলে, আমার ও তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত না, সুতরাং আমরা পরিণামের পথে হাঁটিতে পারিতাম না। ভাবের দাস স্বল্পদর্শী মানুষেরা বৃথা তর্ক করে,—আহারের জিনিস, মাছ, মাংস, চাউল, সব কি তোমার আমার জন্য? প্রেমের স্বরূপে অনভিজ্ঞ মানুষ মনে করে, মৃত্যুই বুঝি সৃষ্ট বস্তু বা জীবের শেষ পরিণতি! অহো, কি দুর্ভাগ্য! মৃত্যুর পর পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তু, আরো যে কত লীলা খেলিবে, তাহা কে বুঝিবে? সৃষ্টির ঘূর্ণচক্র ক্রমাগত ঘুরিতেছে। বীজ মরিতেছে, গাছ উঠিতেছে; গাছ মরিতেছে, বীজ রহিয়া যাইতেছে। বীজ ও গাছ আবার সমান সঙ্গতি রাখিয়া মাটিতে মিশাইয়া রূপান্তর ধরিতেছে। পরমাণুর খেলা—অনন্ত বিস্তৃত, অবিনশ্বর, ক্ষয়-রহিত। যাহা সৃষ্ট হইয়াছে,

রূপ-পরিবর্ত্তনেই তাহার ধ্বংস হয় না। বিজ্ঞান, এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে। কিছুরই ধ্বংস নাই *। ধ্বংস এবং মৃত্যু নামে যে একটা কথা আছে, তাহা রূপ বা অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র। অবিশ্বাসীর কথা আমি মানিব না। মানবেরও ধ্বংস নাই—তাহার স্বষ্ট পদার্থেরও ধ্বংস নাই। প্রেমের পথ ধরিবার জন্যই এক জনের মাথে আর একজনের সৃষ্টি। উপকার পাই বলিয়া, আমি এটা ওটা ধরি। উপকার পায় বলিয়া, স্বামী স্ত্রীর সেবা করে, স্ত্রী স্বামীর সেবা করে। বৃদ্ধের জন্য যুবক, যুবকের জন্য বালক। পুরুষের জন্য স্ত্রী, স্ত্রীর জন্য পুরুষ। রাজার জন্য প্রজা, প্রজার জন্য রাজা, ধনীর জন্য দরিদ্র, দরিদ্রের জন্য ধনী। একের অস্তিত্ব—অপরের জন্য। দর্শনের জন্য কাব্য, কাব্যের জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের জন্য কাব্য;—সকলই সকলের জন্য। পরস্পরকে ধরিতেই হইবে। ভাল না থাকিলে, মন্দ ভাল হয় না; মন্দ না থাকিলে ভাল আর ভাল হয় না। অপরের জন্যই আত্মসুখে মরিতে হইবে, আমার জন্যই অপরকে দেহ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। শিশুর কর্ত্তব্য শেষ হইলে, শিশুত্বের স্থানে অমনি বালকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দেহ বিসর্জ্জন না দিলে প্রেমের জয় ঘোষিত হয় না। সকলের জন্য মৃত্যু সকলের উন্নতির জন্য। খ্রীষ্টকে আমাদের জন্যই খাটিয়া খাটিয়া ঝুলিতে হইয়াছে; এমারসনকে আজীবন চিন্তা করিয়া তোমার আমার জন্যই মরিতে বা রূপান্তর ধরিতে হইয়াছে। বরার্ট এমেটের ন্যায় শত শত বীরের রক্ত মাটীতে পড়িয়াছে, তবে সেই মাটীর উর্ব্বরতা হইতে আজ পার্ণেল-মহাশক্তি-উদিত হইয়া আয়রল্যাণ্ডে নবযুগ উপস্থিত করিতে পারিতেছে। ম্যাটসিনি যদি শরীরের মমতা করিতেন, তবে ইটালি আজ স্বাধীনতার মুখ দেখিত না। খ্রীষ্ট শরীরের মমতা না ছিঁড়িলে বুঝি বা পৃথিবী আজ আঁধার থাকিত। কি গভীর প্রেমে ইহারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একবার ভাব। প্রেমই ধর্ম্ম, প্রেমই বেদ, প্রেমই বেদান্ত। প্রেমের আকর্ষণে, একজন, অপরের জন্য দেহবিসর্জ্জনে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। প্রেমই শক্তি, প্রেমই স্বাধীনতা, প্রেমই জীবন। আজও পৃথিবীতে প্রেম আছে বলিয়া, পৃথিবী এত মধুময়। এই জন্যই নিত্য নূতনে—মানুষ মরে। পরের জন্য দেহ বিসর্জ্জনে যে কুণ্ঠিত, সে মূর্খ। স্বার্থত্যাগেই স্বার্থসিদ্ধি। দেহবিসর্জ্জনেই দেহলাভ। এক এক অবস্থা পরিত্যাগ করিলেই অপর অবস্থা প্রাপ্তি। এক

* "There is no end in nature but every end is a beginning."—*Emerson.*

কর্ত্তব্য শেষ হইলেই অপর কর্ত্তব্য আছে। অবস্থা অনন্ত, কর্ত্তব্য
অনন্ত। অবস্থার পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হয়। নূতনের সাজ মিশিয়ে
মিশিয়ে হয়। পুরাতনের উপরেই নূতনের বীজ উপ্ত। পুরাতন
মাতার উদরেই নব-সন্তানের উত্থান। পুরাতন বৃক্ষেই নব পত্র, নব-
ফুল অঙ্কুরিত। শিশুর পরিণতিই বৃদ্ধ। পুরাতন পত্র না পড়িলে নূতন
পত্রের স্থান হয় না, নূতন পত্র উদ্ভূত না হইলে পুরাতন পত্রের পরিণাম-
স্বপ্ন ঘটে না। সন্তানের জন্য জীবন ক্ষয় না করিলে মাতার নব-জীবন বা
স্বর্গ-লাভ ঘটে না। যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, ভাই, অপরের জন্য বাঁচিয়া
থাক। যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, এক কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অপর কর্ত্তব্যের
জন্য প্রস্তুত হও। বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তব্য ভাবী জীবনে [illegible] হইবার
নহে। যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, ভাই, অপরের জন্য দেহ বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত
হইও না। ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে যদি বাসনা থাকে, তবে গভীর
প্রেমে ডুবিয়া যাও। কিন্তু সাবধান! সোণার চাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গের গভীর
প্রেমও বিন্দু সেবার উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে! মত্ততা প্রেমের
অপকৃষ্ট অঙ্গ। মাতামাতিতে প্রকৃত প্রেমের কোন চিহ্নই নাই। যে মাতা-
মাতিতে জ্ঞান চৈতন্য লোপ করে,—তাহা কখনও প্রকৃত প্রেমের পরিচয়
হইতে পারে না। প্রেমের পরিচয়—হৃদয়ে। যাহার হৃদয় অপরের জন্য
না কাঁদিল, তাহার প্রেম, প্রেমই নয়। যে অপরের চক্ষে জল দেখিয়াও
তাহা মোচনের জন্য শরীরের মমতা ছাড়িতে পারিল না,—বৃক্ষের ন্যায় মোহে
পড়িয়া রহিল, সে বিধাতার সৃষ্টিতত্ত্ব বা প্রেম-রহস্য কিছুই বুঝে নাই।
তাহাকে প্রেমিক বলিয়া ভুল করিও না। ভারতের অভাবের আর বাকী
কি আছে? হায়, তবুও ভারতের নরনারী উদাসীন। দুঃখীর দুঃখ কে
মোচন করিবে? বিধবার অশ্রু কে মুছাইবে? প্রলোভন ও পাপপঙ্কে বা
মোহকূপে মাতা ভগ্নীর অন্তরকে কে স্বর্গের দিকে টানিয়া আনিবে? ভাই,
প্রেমে যদি মজিতে চাও, খাঁটি প্রেমের সাধনা কর। প্রেমই ধর্ম, প্রেমই
ঈশ্বর। প্রেমেরই বিকাশ—অনন্ত প্রকৃতি। প্রেমের চাতুরিই সকলের
লক্ষ্য। দেও, দেও, দেও, কেবল দেও। যাহা দিবার, দেও। শরীর দেও,
মন প্রাণ দেও,—সর্ব্বস্ব অপরের জন্য ঢালিয়া দেও। দেহ বিসর্জ্জন না হইলে
এত দুঃখের বোঝা বাড়িয়া রহিয়াছ কেন? কিসের আশায়? অতএব
জীবন চাও ত জীবন দেও। কাহারও পথের কণ্টক হইও না—আপনাকে

উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা পাইবার নহে, তাহা দিবার কেহ। অন্যের জন্য মরিলেই স্বর্গ লাভ। সকল পুস্তকেতেই একথা বলিয়াছেন। অন্যের জন্যই মরিতে হইবে। ইচ্ছা করিলেই মরণের হাত এড়ান যায় না। তুমি বুঝ বা না বুঝ, তোমার মৃত্যু অন্যের জন্য। সকলের জন্মই অন্যের জন্য। এক অবস্থা অপর অবস্থার জন্য,—এক প্রাণী অপর প্রাণীর জন্য। উন্নতির পথ ভিন্ন মানুষের আর পথ নাই, এই জন্য মরিতে ভয় করিলেও মৃত্যু ছাড়ে না। জন্ম ও মৃত্যু—এ দুই ই মঙ্গলের জন্য,—আমার এবং জগতের আর আর সকলের। তুমি আমি জন্মিয়াছি—আমাদের উন্নতির পথে যাইবার জন্য, এবং আমার তোমার উন্নতির সহায়তার জন্য; এবং আমরা মরিব আবার নবজীবন লাভের জন্য এবং পরস্পরের উন্নতির জন্য। প্রেমের কি গভীর শাস্ত্র! যোগেশ্বরের কি গভীর যোগশাস্ত্র! সৃষ্টির কি গভীর রহস্য! এই জন্যই প্রেম—সকলকেই নূতন দেখায়। যাহা এক জনের ভিতরে দেখায়, অন্যের ভিতরে তাহা দেখায় না। এককে অপরের সহিত মিলাইতে মিলাইতে—গভীর অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া যায়। সে উন্নতি—পূর্ণতা। প্রেম, অপূর্ণতা হইতে ক্রমাগত মানুষকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। উন্নতি হইতে উন্নতি, আরো উন্নতি, আরো উন্নতি, আরো পূর্ণতা, আরো পূর্ণতা—ইহাই সৃষ্টির লক্ষ্য। জন্ম মৃত্যু ভুল কথা—জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই—অপরিবর্তনীয় শক্তির আঘাতে আঘাতে সৃষ্ট মানুষ এবং সমস্ত অণু পরমাণু এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইতেছে। এক অবস্থার রূপান্তর হওয়াকে—একস্থানে মৃত্যু বলে, অপর স্থানে জীবন লাভ বলে। জন্মমৃত্যু আর কিছুই নহে। যাহা অনন্ত কাল ছিল, তাহাই অনন্ত কালের পথে চলিয়াছে। আসে যায়, জন্মে মরে, এসকল কথার কোনই অর্থ নাই; কেবল এক অর্থ এই, নূতনত্ব লাভ করে। সকল পদার্থই, সকল জীবই এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় যাইতেছে। এক অবস্থার কর্তব্য শেষ হইলে, অপর অবস্থা-প্রাপ্তি বিধির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। সকলেরই অনন্ত কর্তব্য, সকলেরই অনন্ত অবস্থান্তর প্রাপ্তি। কোন অবস্থাই স্থায়ী নহে। অনন্ত মরণ, অনন্ত জীবনলাভ, সকলেরই—লক্ষ্য। একেরই অনন্তরূপ এমনই করিয়া বিকশিত হইতেছে। অদ্বৈতবাদ যুক্তিসিদ্ধ এইজন্য যে, সকলই অস্থায়ী, সকলই অপূর্ণ, কেবল তিনিই স্থায়ী, তিনিই পূর্ণ;—তিনিই মূলাধার, তিনিই আত্মা।

দ্বৈতবাদ বলে, মূর্তিমন্ত জীবন্ত দেব—অপূর্ণ আমি, আমারই মত। জ্ঞান যাহা, তাহাই পূর্ণ হইতে পারে না। কিছুই কিছু নয়—তাহাই তাহা নয়। অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—এ দুয়েরই মধ্যে আছে। আমি কিছুই নই—তিনিই সর্বস্ব; এ অতি সুন্দর বিনয়ের কথা, খুব বড় কথা। কিন্তু আমিই তিনি—অপূর্ণই পূর্ণ, এ বড় অহঙ্কারের কথা, এ বড় মিথ্যা কথা। এই জন্যই অদ্বৈতবাদের পার্শ্বে দ্বৈতবাদ চাই। আমার অপূর্ণতা, আমার ভুল কখনই তাঁহার নহে। সকলই অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে ছুটিতেছে। ইহাকে বিকাশ-বল, বা বিবর্তনবাদ বল, জন্ম বল, বা মৃত্যু বল, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সে পূর্ণতা স্বয়ং অপরিবর্তনীয় ব্রহ্ম। তিনিই প্রেম রূপে, চিদানন্দ রূপে সকল ঘটে বিদ্যমান। যেখানে প্রেম, সেই স্থানেই তিনি। যাহাকে সুজন দেখিবে, তিনিই প্রেমিক। প্রেমিক মাত্রই পূজ্য। চন্দ্র সূর্য্য, বৃক্ষ লতা, নদী সাগর, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ—প্রকৃতির যাহার ভিতরে প্রেমের তত্ত্ব দেখিবে, তাহাকেই আর্য্যঋষিদিগের ন্যায় ভক্তির সহিত প্রণাম করিবে। স্বামী স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসা, ভ্রাতৃভগ্নীর অকৃত্রিম স্নেহ, পিতামাতার প্রগাঢ় বাৎসল্য, এ সকলই পূজার জিনিষ; এ সকলের ভিতরেই সাক্ষাৎ মূর্তিমান ভগবান। প্রেমের পরিচয়—স্বার্থত্যাগে। প্রেমিক মাত্রই স্বার্থশূন্য। শরীরের মমতা নির্ব্বাণ না হইলে, প্রেমিক হওয়া যায় না। একের জন্য অপরের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনেও একটু উৎকণ্ঠা নাই যেখানে, সেইখানেই প্রেম। বটগাছের প্রেম দেখ—সে আপনাকে রৌদ্রে দগ্ধ করিয়াও পথিককে রক্ষা করে। শরীর বিসর্জ্জনই প্রেমের—পণ। যেখানে এরূপ প্রেম উদিত, সেই স্থানেই ভগবান্ বিদ্যমান। এস সকলে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করি। বিবাদ বিসম্বাদ, ঘৃণা বিদ্বেষ দূর হউক—এস, জীবন্ত দেবতাকে জীবন্ত প্রকৃতির নব নব ভাবে দেখি, আর তাহাতে ডুবি, ডুবি আর মজি, মজি আর আত্মহারা হইয়া অপরের সহিত মিলাইয়া একাত্মক হইয়া যাই। ২৫ কোটী ভারত সন্তান যদি একপ্রাণ, একহৃদয় না হইতে পারে, তবে আর ভারতের মঙ্গল নাই। মায়ের সন্তান মায়ের নামে মাত। মা—চির নূতন। প্রকৃতিতে তিনিই বিকশিত। আর চির নূতন—প্রেম। প্রেমই সৃষ্টির গভীর রহস্য। এই রহস্যময় প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া সকলে একবার মায়ের নাম কর। পুণ্য, পবিত্রতা, একতা এবং স্বাধীনতা ভারতে আবার অবতীর্ণ হইবে।

অনন্তের লীলা।

"This Universe, ah me, what could the wild man know of it; what can we yet know? That it is a Force, and thousandfold Complexity of Forces, a Force which is not we." * * * * * * * * * "How every object still verily is a window through which we may look into Infinitude itself."—*Carlyle.*

জীবন-পান্থ এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। কি অধিকারে আছি, জানি না; কি কর্ত্তব্য পালনের জন্য আসিয়াছি, তাহা কিছুই জানি না। অথচ সময় নামে যে একটা অননুভূত, কল্পনার অতীত অনন্ত পদার্থ সম্মুখে রহিয়াছে—তাহা ধরিয়া কেবলই চলিতেছি। চলিতেছি বটে, কিন্তু কল্যও যে এই প্রকার ভাবেই এই শরীর লইয়া চলিতে পারিব, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কল্য এই শরীর থাকিবে কি না, তাহা জানি না;—কিন্তু তবুও আমার গতির রোধ নাই—অবিরতই চলিতেছি। আশা ধরিয়া লোক বাঁচিয়া থাকে, এই কথা লোকেরা বলে; কিন্তু কিসের আশা?—কোথায় আশা? লক্ষ্য যে জানে না, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ যাহার পক্ষে কল্পনা বই আর কিছুই নহে, পরিণাম যাহার ঘোর আঁধারে ঢাকা, তাহার আবার আশা কিসের? বাস্তবিক কোন কিছুই আশা নাই!—আশা, কল্পনা বই আর কিছুই নহে। কল্য বাঁচিয়া থাকিব কি না, তাহাই যে জানে না, তাহার আবার আশা কিসের? আশা-শূন্য হইয়াও মানুষ বাঁচিতেছে—ঐ অনন্ত-পথে ছুটিতেছে। কে হাঁকিতেছে, কে ডাকিতেছে, মানুষ কিছুই জানিতেছে না, তবুও ছুটিতেছে। ছুটিয়া ছুটিয়া শিশু, বালকত্বে; বালক, যুবকত্বে; যুবক, বৃদ্ধত্বে; বৃদ্ধ, মৃত্যুতে পৌঁছিতেছে। নিরাশা-আঁধারে ডুবিতে, মানুষ কত অহঙ্কার-স্ফীত বক্ষে ছুটিতেছে! অনন্তকে সম্মুখে করিয়া, ক্ষুদ্র জীবন-বুদ্বুদ কেমন তীব্রবেগে ছুটিতেছে! আপনাকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য, আঁধারে ডুবাইবার জন্য মানুষের কতই উল্লাস, কতই অহঙ্কার, কতই গরিমা! জীবন-পান্থ কি এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা!!

সকলই যেন অনন্ত। উদ্দেশ্য বা পরিণাম, মানুষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। অন্ধ হইয়া যে চলিল, সেও অনন্তে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইল,

কিছুই কূলকিনারা করিতে পারিল না ;—চিন্ময় শক্তি ধরিয়া যে চলিল, সেও অকূলে পড়িয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, মানুষের সকল পরাস্ত হইয়া গেল। বিজ্ঞানের শক্তি জড়ের নামকরণ করিতেই শেষ হইল,—দর্শন সংজ্ঞা-সাগরে মিশিয়া মিশিয়া রহিল। বিজ্ঞান, দর্শন আর কি ?—কেবল জড়ের নামপুঞ্জ, কেবল সংজ্ঞা-সাগর। নামকরণেই বিজ্ঞান দর্শন ব্যতিব্যস্ত ছিল, আজন্ম তাহা করিয়াও অনন্তের শেষ করিতে পারিল না,—অনন্ত প্রকৃতির শেষ পরিণাম স্থিরীকৃত হইল না! মানুষের অহঙ্কার কিসের ?—ক্ষুদ্র মানুষ—অবোধ,—অজ্ঞান, অনন্ত প্রকৃতি-তত্ত্বের কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। কেহ কূল কিনারা করিতে না পারিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। অনধিগম্য—দুরবগাহ অনন্ত শক্তির বিষয় ভাবিয়া মানুষ চমকিত হইল,—মস্তককে বিস্ময়ে অবনত করিল। কেহ বা এমনই হইয়া রহিল যে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়াও দর্শন-বিজ্ঞানের ধুয়া ধরিয়া, মুখের উপরে জড়ের নাম উচ্চারণ করিয়া কতই বিজ্ঞতা বা অহঙ্কারের পরিচয় দিল। ইহাদের কথা আর কি বলিব ? ইহারা কিছু না বুঝিয়াও বিজ্ঞ, কিছু না পাইয়াও বড়, কিছু না জানিয়াও বিদ্বান! যাহাদের মস্তক বিস্ময়ে অবনত হইল,—তাঁহারা অনন্ত শক্তির সহিত ভাসিয়া চলিলেন,—যেন লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন—অবলম্বনহীন। ভাসিয়া ভাসিয়া, অদৃষ্ট অনন্ত সময়-সাগরে ডুবিলেন। সময় ধরিয়া উঠিলেন, অনন্ত কালের ক্রোড়ে ডুবিলেন। এমনই করিয়া কত কত লোক অনন্তে ডুবিল, আর ফিরিল না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে কত বিন্দু যে অনন্ত সাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ কি নিরূপণ করিতে পারে ? সীমা, অসীমে মিশিতেছে ; জড়, অজড় শক্তিতে লীন হইতেছে। ক্ষুদ্র ও মহৎ, সকলই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অথবা সীমাই বা কি, জড়ই বা কি, ক্ষুদ্রই বা কি, মহৎই বা কি ?—সকলই অসীমের খেলা,—সকলই শক্তির ক্ষণিক তরঙ্গ মাত্র। ক্ষুদ্র শক্তি, অনন্ত শক্তি-সাগরে মিশিতেছে। একদিন, দুদিন করিয়া সাত দিন গণিলে সপ্তাহ হয়, চারি সপ্তাহে মাস, বার মাসে বৎসর, বার বৎসরে যুগ। যুগে যুগে মিলিয়া কত অনন্ত যুগ হইতেছে, শেষে আর মানুষ গণিতে পারিতেছে না।—এক আরম্ভ করিয়া, সকল সংখ্যা অনন্তে পরিণত হইতেছে। এক, দুই করিয়া গণিতে গণিতে শেষে আর অঙ্কের সংখ্যা করা যায় না—সকল অনন্ত বলিয়া বোধ হয়।

এক সাগরে কত জলকণা, এক কণাতে কত পরমাণু! পরমাণুরই বা শেষ কোথায়?—কে গণিয়া ধারণা করিতে পারে? পরমাণুর শেষ কোথায়, মানুষ ভাবিতে পারে না, কল্পনাও করিতে পারে না। সকল বস্তুই বিভাজ্য, কিন্তু পরমাণুর নাকি আর বিভাগ হয় না, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরমাণুর ভিতরে যে অবিভাজ্য অনন্ত শক্তির লীলা, মানুষ তাহা বুঝিল না। এই প্রকার করিয়া যে একবার গণিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই শেষে অনন্তে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক যখন শত হয়, শত যখন সহস্র হয়, সহস্র যখন লক্ষ হয়, লক্ষ যখন কোটি হয়, তখন সে সকলকে গণন করিয়া মানুষের মস্তক আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না,—তখন সকলই অনন্ত বলিয়া মনে হয়। যে একবার এ পথে চলিয়াছে, সেই মজিয়াছে। যে কখনও কিছুই জানিতে চেষ্টা করে নাই, সে ই ভুলে আছে; কিন্তু যে একবার জানিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে ই, নিউটনের ন্যায় শেষে অনন্তের তীরে বসিয়া, নিরাশার সঙ্গীতে জগৎকে ডুবাইয়া, অনন্তে আত্মশরীরকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। তুমি আমি কোন ছার জীব! গণিবার সাধ থাকে, একবার এস, নিশ্চয় তোমার অহংকার চূর্ণ হইবে। ঐ আকাশে চাহিয়া বলত, কত নক্ষত্র আকাশে,—প্রত্যেক নক্ষত্রে কত জীব—প্রত্যেক জীবে কত পরমাণু! পৃথিবীর পানে চাহিয়া বলত, এখানে কত বৃক্ষ, এক বৃক্ষে কত পত্র,—এক এক পত্রে কত কীট। পরিমাণ করিবে?—গণনা করিবে? হা! বালক মানুষ, তোমার অহংকার আর কতক্ষণ! গণিতে আরম্ভ করিয়া দেখ—অমনি অনন্ত তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! মানুষ অবশেষে অনন্তে যাইয়া ডুবিতেছে,—সকলের আশা, সকলের অহংকার, অনন্তকালসাগর গ্রাস করিতেছে!

গণিতে বসিয়া আমরা মজিয়াছি। এক বৎসর গেল, দুবৎসর গেল,—কত দিন গেল,—কত সময় কাটিয়া গেল,—এক দুই করিয়া, অনন্ত কালের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে সময় গেল বা যে সময় আসিল, সে সকলই অনন্তে মিশিয়া রহিল। পৃথিবীর মৃত্তিকা হইতে বিন্দু বিন্দু বাষ্প কত কি অণু তুলিয়া যেমন পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড মেঘ হইয়া লাগিয়া থাকে, আমাদের জীবন-মৃত্তিকা হইতে দিন, মাস, বৎসর-ব্যাপক সময়, কত কি লইয়া অনন্তে মিশিয়া থাকিল, আমরা

তাহা কিছুই গণিতে পারিলাম না। শত বৎসর যে ঘটিল, কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি পাইলাম,—কি বলিতে পারি? যাহা গেল—সে সকলই অনন্তে মিশিল। শত বৎসর, কত কি উপার্জ্জন করিয়া, অনন্তত্ব বৃদ্ধি করিল। প্রত্যেক বৎসরই করিতেছে। আমরা অবাক হইয়া অনন্ত-শক্তি সাগরের ক্রীড়া দেখিতেছি, আর বিস্ময়ে নিমগ্ন হইতেছি।

কি জানি যে, অহঙ্কার করিব? ক্ষুদ্র হইয়া জন্মিয়াছি—ক্ষুদ্রই রহিয়াছি, অনন্তের কিছুই ত জানি না, তবে কিসের অহঙ্কার করিব? অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। তাই, বিজ্ঞ মনুষ্য-সন্তান, সামান্য জ্ঞানবালির বাঁধে অসীম সময়সাগরকে পরিমাণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার শক্তি তোমার ভাণ্ডারে কিছু থাকে, তুমি অহঙ্কার কর,—হাসাও, মাতাও, কাঁদাও। আমাদের কিছুই নাই—অনন্তের নিকট আমরা যেন কিছুই নই। কিছুই নই বটে, কিন্তু আবার কিছু হই। একবার নাই,—আবার আছি। অনন্তের সহিত তুলনায় আমরা যেন নাই, সীমার সহিত তুলনায় আছি। "নাই নাই" মিলিয়াই অনন্ত "হই হই" উৎপন্ন হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিলিয়াই অনন্ত হইতেছে। অণু অণু মিলিয়াই মহাসাগর হইতেছে। এ এক গভীর শাস্ত্র। অনন্তের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব কে স্বীকার করিতে চায়?—বড় বস্তুর কথা বিস্মৃত হইয়া, কে ছোট বস্তুর নাম লইতে চায়? চন্দ্রকে ভুলিয়া কে জোনাকীকে গণিতে চায়? বড়র কাছে ছোটর আদর নাই। অনন্তের নিকট ক্ষুদ্রের আদর নাই বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র না থাকিলেও অনন্ত থাকে না, অনন্তত্ব পূর্ণ হয় না। পরমাণু না থাকিলে জড় হয় না,—আমি না থাকিলে তুমি হও না, এবং আমি ও তুমি, সকলে না থাকিলে সমাজ হয় না,—সমাজ না থাকিলে দেশ হয় না, দেশ না থাকিলে রাজা হয় না, রাজা না থাকিলে প্রকৃতি শুধুই শূন্য—কল্পনা—ছায়া। এক সময়ে যাহা অনাদৃত, আর এক সময়ে তাহারই আদর হইতেছে। এই প্রকারে 'নাই' সময়ে 'হই' হইতেছে। মূল কথা, আমরা অতি ক্ষুদ্র হইলেও,—'নাইর' মত বোধ হইলেও, আমরা আছি। কেন আছি, জানি না, কত দিন থাকিব, জানি না—তবুও আছি। আছি বলিয়াই আমাদের কার্য্যও আছে, গতিও আছে। উদ্দেশ্যবিহীন কিছুই প্রকৃতির ভাণ্ডারে নাই। সকলই উদ্দেশ্য পূর্ণ। আমাদের জীবনও উদ্দেশ্য-পূর্ণ। কি উদ্দেশ্য আমাদের, তাহা আমরা কি জানি? তুমি বড়, তোমার

গৌরবে মহৎ মহত্তম, তোমার কাছে আমাদের অস্তিত্ব অনাবৃত, কিন্তু তুমি অন্তরে যাইবে কি আমরা যাইব, তাহা কিছুই আমরা জানি না। জানি না, তুমিই অধিক কার্য্য করিবে, না আমরা করিব?—এইমাত্র জানি, বড় ছোট সকলই উদ্দেশ্যপূর্ণ, সকলেরই কার্য্য আছে। কাহার দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হইতেছে, জানি না,—এ অনন্তত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া আমরা বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছি—এ গভীর সাগরের কূল কিনারা পাই না। আমরা যাহা জানি, তাহা এই,—বড় ছোট সকলই আছে—কেবল অনন্ত প্রচার করিতে;—তোমরাও করিতেছ, আমরাও করিতেছি। হিংসা বিদ্বেষ করিলে তাহে কি হইবে? তোমার পার্শ্বে আমি না থাকিলে, সৃষ্টির গভীর উদ্দেশ্য সফল হয় কই? বড়র সাথে ছোট না থাকিলে চলে কই? বড় জীবিত থাকিলে ছোট মরিবে, যে মনে করে, সে মূর্খ! মহাগৌরব-স্ফীত ইংলণ্ড আছে বলিয়া ভারত সমাজ মরিয়া যাইবে, তুমি ভাবিতেছ? ইংরাজি ভাষার সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির নিকটে সামান্য বাঙ্গালা ভাষা নিবিয়া যাইবে, মনে ভাবিতেছ!—হ্যাট কোটের তাড়নায় ধুতি চাদর উড়িয়া যাইবে, ভাবিতেছ; —সুসভ্য ইংরাজের অস্তিত্বে বাঙ্গালী বিলুপ্ত হইবে, মনে করিতেছ? হায়, তোমার ন্যায় মূর্খ আর কে আছে! ইংলণ্ডের যদি প্রয়োজন থাকে, তবে ভারতেরও আছে, ইংরাজি ভাষার যদি আবশ্যকতা থাকে, তবে বাঙ্গালা ভাষারও আছে; হ্যাট কোটের প্রয়োজন থাকিলে ধুতি চাদরেরও আছে। জ্ঞান চাইত প্রেমও চাই—বীর্য্য চাইত কোমলতাও চাই;—কার্য্য চাইত শান্তিও চাই। মানুষ কেবল যুদ্ধ করিবে না, যোগসাধনও করিবে। মানুষ কেবল কার্য্য করিবে না, বিশ্রামও করিবে। মানুষ কেবল শীতে মরিবে না, গ্রীষ্মও ভোগ করিবে। একের অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব যায় না,—তা বড়ই হউক আর ছোটই হউক। শীতপ্রধান রক্ত-পিপাসু ইংলণ্ডের হ্যাটকোট, গ্রীষ্মপ্রধান যোগধর্ম্ম-পালাবিত ভারতে কখনই চিরআসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। ইংলণ্ড যদি বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকে, তবে ভারত আধ্যাত্মিক বলে পারিবে। এক উদ্দেশ্য কখনই দুইয়ের হইতে পারে না। যাহা ভারতের অদৃষ্টে নাই—তাহা কখনই হইবে না। কখনই হইবে না,—রক্তপিপাসা কখনই ভারতের প্রেমপূর্ণ চিত্তশান্তির বুকে স্থান পাইবে না। ভারতের বীরত্ব হৃদয়ে;—ভারতের শক্তি হৃদয়ে। কর্ম্মক্ষেত্রের শ্রেণীতে যাইবার জন্যই ব্যস্ত হও, আরম্ভে

বলিয়া বুঝিতেই হয়,—অন্য-পূত শত-মূর্তি ভারতের লক্ষ্য নহে। কোটি কোটি ভারতে টিকিবে না—শুধু বাহুবলে ভারত কখনই আয়ত্ত করিতে পারিবে না। ভারতের শক্তির রাজ্য—হৃদয়ে। কেন ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছ?—কেন ধর্মশক্তির স্থানে পাশবশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছ? এ আকাশ কুসুম সদৃশ বাসনা কখনই পূর্ণ হইবে না। প্রত্যেকের বিশেষত্ব ঘুচিবে না—একের অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। ভারত থাকিবে—ভারতের জাতি থাকিবে, ভারতের ধর্ম থাকিবে, ভারতের ভাষা থাকিবে। ভারতকে ঘৃণা করিয়া ইহার প্রতি কেহ চাহিও না; ভারতের ধর্মকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখ,—ভারতের অস্তিত্ব তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখ, কিন্তু জানিও, বৈচিত্র্য যদি সৃষ্টির লক্ষ্য হয়,—সকল বস্তুতেই যদি স্বতন্ত্র সত্তা থাকে,—সকল সত্তাই অযুক্ত হওয়া যদি বিধির নিয়ম হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, একদিন এই পদদলিত ভারতের ধর্ম,—পুণ্য, পবিত্রতা, শান্তি ও প্রেম, জগৎকে জয় করিতে পারিবে,—ভারতের মলিন ভাষা, এক দিন আপন ক্রোড়ের লুক্কায়িত রত্নরাজির দ্বারা জগৎকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে। বৃহতেরও সত্তা আছে, ক্ষুদ্রেরও সত্তা আছে,—শীতপ্রধান দেশেও আছে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেও আছে,—সকল মিলিয়াই সৃষ্টি-সিদ্ধ। তুচ্ছ করিলে চলিবে কেন? ঘৃণা করিলেই বা হইবে কেন? বৃহৎ ক্ষুদ্র, ছোট বড়—সকল মিলিয়াই—অনন্ত। অনন্তেরই লীলা—ক্ষুদ্রে, অনন্তেরই লীলা—বৃহতে। আবার ক্ষুদ্র বা কে, বৃহৎ বা কে? সময় ভেদে, উদ্দেশ্য ভেদে, ক্ষুদ্রই বৃহৎ; বৃহৎই ক্ষুদ্র; যাহার যে উদ্দেশ্য (mission) তাহাতেই সে বৃহৎ। লেখক, লেখার জন্য বৃহৎ; বক্তা, বক্তৃতার গুণে বৃহৎ। রাজা, রাজ্য শাসন করিবার শক্তিতে বৃহৎ; প্রজা কৃষি কার্য্যের জন্য বৃহৎ। এক জনের কার্য্য অপরের দ্বারা সাধিত হয় না যখন, তখন কাহাকে ছোট কাহাকে বড় বলিবে? আপন আপন রাজ্যে, সকলেই বৃহৎ। বৃহৎ হইয়াও, অনন্তের সহিত তুলনায় সকলই অতি ক্ষুদ্র। তত্ত্বতঃ, ভেদাভেদ, এ সকল কেবল ক্ষুদ্র বুদ্ধি পরি-চালনার ফল। যাহার হৃদয়ে বল আছে, সেও আদরের; যাহার বাহুতে বল আছে, সেও আদরের। জ্ঞানী, জ্ঞানীকেই বড় মনে করে, প্রেমিক প্রেমিককেই বড় দেখে। যোদ্ধা যোদ্ধাকেই অধিক পূজা করে, ধার্ম্মিক ধার্ম্মিককেই অধিক ভালবাসে। যাহার মন যে দিকে, সে তাহাকেই বড় দেখে। গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলে,—বড় ছোট এ ভেদাভেদ বিশেষ

তাহার পর বিশেষ বিশেষ বস্তুতে চিন্তায় বিস্তৃত হয় যায়;—বাস্তবিক বড় ছোট, এ ভেদাভেদ আর থাকে না—সকলকেই আপন আপন বিশেষত্বে প্রধান বলিয়া বোধ হয়। সকলই যেন অনন্তের কথা। অনন্তের নিকট বৃহৎও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রও বৃহৎ। ক্ষুদ্র বাদে অনন্ত পূর্ণ হয় না, বৃহৎ বাদেও হয় না। কাহার দ্বারা কি কার্য্য হইবে, কে জানে? কাহার কি উদ্দেশ্য, কে জানে? সকলকেই আদর করিতে হইবে। সকল বস্তুতেই শক্তির ক্রীড়া। শক্তি মাত্রই আদ্যাশক্তি-প্রসূত। সকল ঘটেই ভগবান বিরাজমান। পরস্পরকে আদর করিতে করিতে, অনন্ত শক্তিসাগরে যাইয়া অস্তিত্বকে ডুবাইতে হইবে;—যাইতে যাইতে, পাইতে পাইতে, অনন্তে নিমগ্ন হইতে হইবে। আমরা সকলেই অনন্তের পথে খেলা খেলিতেছি। আমরা যাহা করিতেছি, সকলই অনন্তের কথা। তোমার ভিতরে এক অনন্ত রাজ্য, আমার বুকের ভিতরে আর এক অনন্তের রাজ্য। ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া, কে শেষ করিতে পারে? গভীরভাবে যখন প্রকৃতি-তত্ত্ব চিন্তা করিতে বসি, তখন একবারে বিস্ময়ে নিমগ্ন হই। একটী বালুকণা, বা একটী ক্ষুদ্র সামান্য কীট হইতে, সুবৃহৎ পর্ব্বত বা মহান মহাসাগর, এ সকলের ভিতরেই এক অনন্ত রাজ্য। জড়কেও সীমাবদ্ধ ভাবা যায় না,—অণু হইতে পরমাণুতে যাও,—যাইয়া বুঝিবে,—সেখানেও অনন্ত, আর কূল কিনারা নাই। মানুষ বুঝিতে যাইয়া, ধরিতে যাইয়া, শেষে পরাজয় স্বীকার করে। কোন তত্ত্বেরই শেষ তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞান, বিদ্যা বা চিন্তা ধরিতে পারে না। মানুষ আপন তত্ত্ব জানে না, পরতত্ত্বও জানে না। কিসের বা অহঙ্কার, কিসের বা আত্মাভিমান! আত্মবোধ বা পরবোধ কোনটারই শেষ নাই! হায়, মানুষ কত ক্ষুদ্র! হায়, মানুষ যাহা জানিয়াছে বা জানিবে, তাহা কত সঙ্কীর্ণ! মানুষ অনন্তশক্তি-সাগরে অবশেষে অবশ অঙ্গকে ভাসাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে। যখনই মানুষের প্রাণে এ বোধ জন্মিতেছে যে, কিছুই জানা বা বুঝা হইল না, তখনই শরীর অবশ হয়;—তখনই দেহকে ভার বলিয়া বোধ হয়; মানুষ তখন ইচ্ছা করিয়া অনন্তে ঝাঁপ দিয়া মরে। পতঙ্গ তখন ইচ্ছা করিয়া আগুনে শরীরকে পোড়াইয়া সুখী হয়। যত দিন অনন্তবোধ না হইতেছে;—যত দিন মানুষের প্রাণ বিশালবিস্তৃত আকাশে না উড়িতেছে,—যত দিন উদারতায় বিশ্ব-বিস্তৃত ক্ষেত্রত্ব অনুভব না হইতেছে;—ততদিন ক্ষুদ্র শরীর-বাহনে ক্ষুদ্র মানুষ চলিতেছে, ফিরিতেছে,—উড়িতেছে,

বাঁচিতেছে। তাহাই বা কত দিন? অনন্তের সহিত তুলনায় উহা মুহূর্ত মাত্র। মানুষ-পতঙ্গ এক মুহূর্ত জীবন লইয়া মাতামাতি করিতেছে—পরে জীবনকে ফুরাইয়া দিতেছে। একজন যাইতেছে, তাহার পশ্চাতে আর একজন আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে আর একজন,—এমনি করিয়া অনন্তের চক্র পূর্ণ হইতেছে। এক, দুই, তিন, গণিতে গণিতে শেষে শূন্য হইয়া যাইতেছে। যত দিন এই গভীর অনন্তত্ব হৃদ্‌বোধ না হইবে, তত দিনই অহঙ্কার বা সঙ্কীর্ণতা, এবং ততদিনই মানুষের পৃথিবীতে স্থিতি। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে—মানুষ আর থাকিতে চায় না—অমনি মাথা হেঁট করিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া মরে। জ্ঞানী নিউটন এমন করিয়া মরিয়াছেন, প্রেমিক নিমাই এমন করিয়া ঝাঁপ দিয়াছেন। অনন্ততত্ত্ব বুঝা ভার, অনন্ত কার্য্য সম্পন্ন করা কঠিন, অনন্ত কর্ত্তব্য পালন করা অসাধ্য, এ বোধ জন্মিলে মানুষ আর টিকিতে পারে না। যে ক্ষুদ্র বালক নিমাই বাহু দিয়া মাতাকে বাল্যকালে কত আদরে বুকে পুষিতে চাহিত, সেই প্রেমিক-গৌরাঙ্গ যুবক হইয়া কত জনকে কোল দিয়া কৃতার্থ হইলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন—কোলকে অনন্তে প্রসারিত না করিতে পারিলে আর চলে না, সীমাবদ্ধ ভালবাসাতে যখন আর তাঁহার তৃপ্তি হইল না, তখন তিনি অনন্তে শরীরকে বিসর্জ্জন দিলেন। কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ?—বলিয়া সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত নরনারী কত কাঁদিতেছে, কিন্তু সোণার চাঁদ আর নদিয়ায় ফিরিলেন না,—নীলাচলে যাইয়া অনন্ত নীলিমায় মিশিয়া গেলেন। পবিত্রাত্মা যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশকাষ্ঠ হইতে নামিলেন না কেন?—তোমরা জান কেহ? অনন্ত কর্ত্তব্য শেষ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি অনন্তে মিশিলেন, ফিরিলেন না। আশা ততক্ষণ মানুষকে ভুলাইতে পারে, যতক্ষণ মানুষ সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ। আশা যখনই কল্পনা বলিয়া বোধ হয়,—আত্মা মন যখনই অসীমে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন আর স্বার্থপূর্ণ বাসনা থাকে না,—তখন কেবল বিষাদ, কেবলই নিরাশা—কেবলই হতাশ-সঙ্গীত মানস-সরোবর হইতে উত্থিত হইতে থাকে। মানুষ ততদিনই শরীরের যত্ন করে, যতদিন শরীরের অতীত কোন তত্ত্বে সে আসক্ত না হয়;—মানুষ ততদিনই পরিবার প্রতিপালন করে, যতদিন জগতের অন্য কোন কিছুর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের দ্বার অবরুদ্ধ থাকে। আপন শরীর এবং পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে

হকম্‌ মানুষের কথা আরো বিস্তৃত হয়,—তখন মানুষ আর গণ্ডীবদ্ধ আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কুটিরের স্নেহ পরিবারে যায়, পরিবারের স্নেহ দেশ দেশান্তরে যায়;—শেষে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় হয়, তখন মানুষ মুক্তবুদ্ধি হইয়া, নির্বাণ লাভে, ঝাঁপ দিয়া মরে। মানুষ এমনই করিয়া কত উদ্ধারের পথ খুলিতেছে,—কত নির্বাণের আয়োজন করিতেছে। আবার ভাবনা—কালে কত মহা পুরুষ ঐ ব্যোমের কোলে বিলীন হইয়া পড়িতেছে। যত দিন যে অনন্ত-বোধ না হইতেছে, তত দিন ইচ্ছা করিলেও কেহ মরিতে পারে না। জীবন-ধারা বিষম বস্তু;—কেহই পরিত্যাগ করিতে চায় না। মরিতে কাহার সাধ? সকলেই জানেন, সকলেরই মরিতে ভয়;—কিন্তু এক সময়ে আবার সকলই মরিতেছেন! এক সময়ে ইচ্ছা করিলেও মানুষ মরিতে পারে না,—আর এক সময়ে বাঁচিয়া থাকিতেই আর ইচ্ছা যায় না। সীমা বোধ যতদিন, ততদিন মায়া, ততদিন মোহ;—অনন্ত বোধ যখন, তখনই মহাবৈরাগ্য—তখনই দেহ-বিসর্জন! আমরা আজও যে আছি, তাহার কারণ, আজও আমাদের অনন্ত-বোধ জন্মে নাই। আজও যেন কর্তব্য আছে বলিয়া মনে হইতেছে;—আজও যেন পাইতে ইচ্ছা হইতেছে, —দিতে ইচ্ছা হইতেছে;—আজও ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিতে ইচ্ছা হইতেছে, —আজও ভারতকে এক প্রাণে বাঁধিতে ইচ্ছা হইতেছে। যখন এভাব থাকিবে না,—ভারত হইতে কর্তব্য প্রসারিত হইয়া যখন জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে—তখন আমরা কূলকিনারা ভুলিয়া অকূল অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইব;—কেহ চিহ্নও দেখিবে না। তোমার ইচ্ছাতেই আমরা মরিব না,—কেহই মরিবে না। মরিবার পথ আপনা হইতেই পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ভয় নাই—অনন্ত কাল এ জীবনলীলা থাকিবে না;—এক অবস্থায় পৃথিবীর কিছুই থাকিতে পারে না। সকলই ক্রমবিকাশের অধীন, সকলেই উন্নতির যাত্রী। আজ আছি বলিয়া অনন্ত কাল এখানে এ ভাবে থাকিব না। আজ সীমার পূজা করিতেছি বলিয়া চিরকালই করিব না। আবার অনন্ত কাল থাকিব না বলিয়া, আজই মায়া ছিন্ন করিতে পারি না। জীবন-মহালীলা এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। এক ক্ষুদ্র জীবনেই কত উৎকণ্ঠা—কত অনন্ত ভাব। অথবা ক্ষুদ্রই অনন্তের দর্পণ স্বরূপ। ক্ষুদ্র-বোধ আছে বলিয়াই অনন্ত-বোধ হইতেছে—বিস্ময়পূর্ণ ভক্তিতে মানুষ পূর্ণ হইয়া, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, অনন্তে ডুবিতে ছুটিতেছে। ক্ষুদ্র

উদ্দেশ্য লইয়া, সামান্য কর্তব্য পালনের জন্য, আজ ক্ষুদ্র আমরা যে আবদ্ধ রহিয়াছি, এ অনন্তের লীলা বই আর কিছুই নহে। অনন্তের লীলা প্রকাশ করিবার জন্য, মহা সময়-সাগরে ক্ষুদ্র বারিবিম্ব আবার মাথা তুলিল।" যখন আশা কল্পনায় পরিণত হইবে—বিশ্ব সৃষ্টির অনন্তত্ব বোধ হইবে,—অনন্ত কর্তব্যের প্রশস্ত দ্বার খুলিয়া যাইবে,—প্রেম-উদ্বেলিত হৃদয় যখন সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের চিন্তায় অবশ হইবে,—বুদ্ধি বা জ্ঞান যখন কূল-কিনারা নির্ণয়ে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িবে;—কর্তব্য পালন যখন অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, তখন এ ক্ষুদ্র বারিবিম্ব পুন অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইবে; কেহ চিহ্নও দেখিবে না। ক্ষুদ্র শক্তি তখন অনন্তে মিশিবে,—এক তখন শত, শত তখন অনন্ত হইয়া যাইবে। য[illegible] দিন উপস্থিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের অস্তিত্ব অনিবার্য্য।

সন্ধিস্থলে।

দুটী বস্তু যেখানে মিলিত হয়, তাহাকে সন্ধিস্থল কহে। এই মিলনের স্থান অতি উপাদেয় বস্তু। সংসার-মরুর ওয়েসিস্, বিপদ-সাগরের আশা-তরী, উত্তপ্ত পৃথিবীর শীতল বট-ছায়া,—এই মিলনের স্থান। তোমার হৃদয় অতি কঠোর হইয়াছে,—বিজ্ঞান দর্শনের কূট তত্ত্বের জটিল প্রশ্ন মীমাংসায় মস্তিষ্ক বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে,—সোণার বর্ণ কালিমাময় হইয়া গিয়াছে? তাই, ক্ষণকাল কোন-এক পর্ব্বতের উচ্চস্থানে আরোহণ কর,—দেখ, চতুর্দ্দিকে কেবলই পাহাড়ের কোলে পাহাড় উদাসীনত্ব প্রচার করিতেছে, বৃক্ষের পশ্চাতে বৃক্ষ সোঁ সোঁ শব্দে দুলিতেছে, ঝরণার প্রান্তে ঝরণা বহিয়া, ঝুর ঝুর রবে, কোথাও বা গভীর গর্জ্জনে উপলখণ্ড সকলকে অবহেলা করিয়া তীব্রবেগে ছুটিতেছে;—তাহারই নিকটে বৃক্ষে বসিয়া কত কত পাখী, অতি মধুর স্বরে, মধুর ঝঙ্কারে পাহাড়ের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিয়া, আকাশ ফাটাইয়া কি দিব্যের অমৃত ঢালিতেছে;—চাহিয়া দেখ, এই মধুময় স্থানে, অনন্তনীলিমা-গগনকে অতি-ক্রম করিয়া, পর্ব্বত-শোভাকে তুচ্ছ করিয়া, দেহকে আরক্তিম করিয়া, ঐ বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া সূর্য্যদেব অস্তমিত হইতেছেন। উজ্জ্বল সোণার বর্ণ

ক্রমেই কালিমাময় হইতেছে,—উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর করিয়া যাইতেছে, অমনি দূরবর্ত্তী পাহাড়ের অঙ্গ শোকে যেন বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে,—একদল পোকা মিঘের মধ্যে আঁধারময় হইয়া আসিতেছে। আলোক আর আঁধার, আনন্দ আর ভয়, উৎসাহ আর বিষাদ,—আসক্তি আর বৈরাগ্য,—বিরহ আর মুক্তি, একস্থানে মিলিয়াছে!!—এই মহা সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া ভূধ-রের বসন্ত, ঐ মিলন উপাদেয় কিনা, হৃদয়-প্রফুল্লকর কিনা? দেখিতে দেখিতে এই জীবিতাশা আনন্দে বিহ্বল হইয়া, পাখী সব কুলায় ছাড়িয়া, গগন ছাইয়া, মেঘের কোলে চড়িয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছে,—পশু সকল ব্যতিব্যস্ত হইতেছে,—মেঘ সকল দ্রুত চলিয়া বিদ্যুৎ চালিয়া পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় লইতেছে,—ঝরণা হইতে অবিরত বাষ্প উঠিয়া, দিক ডুবাইয়া, আনন্দোৎসবে মত্ত হইতেছে,—দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা উচ্চরবে বাজিতেছে,—নরনারী মিলিত কণ্ঠে যোগেশ্বরের গুণ গাইতেছে,—কি আনন্দ, কি মহোৎসব, কি স্বর্গের ছবি ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছে! প্রাচীন, এ ছবি দেখিয়া,—শুষ্কতা, কঠোরতা ও নিরাশতাকে হৃদয় হইতে খুলিয়া রাখিয়া,—অবিশ্বাস, অপ্রেম, অভক্তি,—রিপুর জ্বালা,—সংসারের বিষজ্বালাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, ভক্তি-গদগদ চিত্তে এই মহোৎসবে ক্ষণকালের জন্য যোগ দিয়া কৃতার্থ হইতেছে!! সায়াহ্নগগন তলে, সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিয়া, এমন কোন্ পাষণ্ড পৃথিবীতে আছে, যে বক্ষস্ফীত করিয়া বলিতে পারে, আমার হৃদয়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, মন আনন্দে মাতে নাই,—জীবন সুখময় বলিয়া বোধ নাই?

আর একস্থানে এস। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র উৎসারিত হইয়া জীবন-লীলা খেলিতেছে,—কত দেশের মলিনতা বিধৌত করিতেছে, কত দেব-পরিত্যক্ত বারিরাশি বা পাহাড়-চ্যুত ঝরণা-রাশিকে প্রণয় উদার কোল পাতিয়া স্থান দিতেছে,—কি মধুর প্রেমের খেলা খেলিতেছে! কত চাঁদের কিরণ ধরিতেছে,—কত ভাব-তরঙ্গ তুলিয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে! চলিতে চলিতে, দূরদেশ হইতে আগত, প্রেম-বিহ্বল, গঙ্গা-যমুনার ঘনীভূত মিলন—উল্লাসতরঙ্গময়ী, উন্মত্তা পদ্মার সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইল, অমনি কোলে কোল মিশাইয়া, হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া,—জীবন-ধারা বিসর্জ্জন দিয়া, দুই এক হইয়া গেল!!—আহা আহা এমন মিষ্ট মিলন-আর কে কবে দেখিয়াছে? উচ্চতাতে আরো উচ্চতা মিশিল, প্রণয়

এই যে সম্মিলনের মাহাত্ম্য এতক্ষণ ধরিয়া ক্ষীণ ভাষায় কীর্ত্তন করিলাম, —এই সম্মিলন জীবনময়, ভুবনময়। অণুতে অণুতে সন্ধি, জড়ে জড়ে সন্ধি, জীবে জীবে সন্ধি, মানুষে মানুষে সন্ধি। মিলনের জন্য জগৎ চির-লোলুপ। দুটি বর্ণ মিলিয়া এক হইতেছে, দুটি নদী মিলিতেছে, দুটি পুষ্পের অণু সম্মিলিত হইতেছে, দুটি হৃদয় মিশিতেছে, দুটি দেশ বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া মিলিতেছে, দুটি জাতি যুদ্ধ বিগ্রহ মিটাইয়া সন্ধির জন্য লালায়িত হইতেছে; দুটি সম্প্রদায় মত-পার্থক্যকে ভুলিয়া, ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া এক হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিচ্ছেদ, অমিলন, পৃথিবীর বড়ই অসহ। স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যে বা ঝগড়া বিবাদে পৃথিবীর বায়ু দূষিত হইতেছে; কিন্তু কোন্ মানুষ এমন আছেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, রমণীর সহিত মিলিত হইতে যাঁহার বিতৃষ্ণা বা অনিচ্ছা জন্মিয়াছে? তোমাতে আমাতে কত বিবাদ, মতের পার্থক্য হেতু কত অসদ্ভাব, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া অনুসন্ধান কর, বুঝিবে, আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য তোমার হৃদয়ের এক গভীর তৃষ্ণা রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, পৃথিবীর এই মিলনের প্রবল বাসনাকে অনেকটা মলিন করিয়া ফেলিয়াছে বটে; পৃথিবীর প্রভুত্ব-লাভ-ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, দেশে দেশে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া মিলনের-গভীর বাসনাকে অনেকাংশে বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে; কিন্তু স্থির ভাবে অনুসন্ধান কর, পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে,—এখনও মিলনের জন্য কেমন এক স্বর্গীয় ভাব নরনারীর শোণিতের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। প্রত্যেক নরনারীর মুখে বা হৃদয়ে; পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুতে এমন এক স্বর্গীয় জিনিষ, এমন এক আশ্চর্য্য অমৃত ভাণ্ডার, এমন এক বিশেষত্ব নিহিত রহিয়াছে, যাহার মমতায় মানুষ মানুষের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত। যে জন, মিলনের এই প্রবল বাসনায় পূর্ণ জাতি-বিদ্বেষ-স্রোত ঢালিতে প্রয়াসী, তাহার তুল্য পৃথিবীর শত্রু আর নাই। সৃষ্টির মূল মন্ত্রই যেন—মিলন। প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক জীবেই, এই জন্য, বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বিশেষত্ব লাভের জন্য, পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য চির লোলুপ। বিশেষত্ব লাভের জন্য মানুষ এতই উৎকণ্ঠিত যে, চিরকাল কখনই এক অবস্থায় থাকিতে সে ভালবাসে না। যে দুঃখের কশাঘাতে আমাদের স্নায়ু মস্তিষ্কের অণু পেষিত হইয়া যাইতেছে, চির-সুখীজন সেই দুঃখকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই যেন লালায়িত।

চিরআলোক মানুষ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই, প্রজ্বলিত দীপকে রাত্রে নির্ব্বাণ করিয়া রাখে। এক অবস্থা মানুষের কখনই ভাল লাগে না। বালক যুবক হইতে চায়। যুবক বৃদ্ধত্বের জন্য লালায়িত। দরিদ্র ধন চায়, ধনী দারিদ্র্যকে ভালবাসে। সুখের মুখে দুঃখ না মিলিলে, সুখ সুখই নয়। ধনের পার্শ্বে দারিদ্র্যের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ধ্বনিত না হইলে, ধনে কোন সুখই পাওয়া যায় না। নদীতে উর্ম্মিযুক্ত তরঙ্গ না থাকিলে, নদীর আদর হয় না,—অরণ্যে হিংস্রজন্তু না থাকিলে অরণ্য ভাললাগে না;—রজনীতে চন্দ্রের সুমধুমধুবৎ জ্যোতির কোলে আঁধার না জাগিলে কখনও চন্দ্রমার আদর হইত না। এক অবস্থা, এক ভাব পৃথিবীর অসহ্য। তাই এত বিশেষত্বের সৃষ্টি। সাদার পার্শ্বে নীল, নীলের কোলে লাল, লালের বুকে সবুজ, সবুজের গায়ে কাল, কালোতে হলুদ মিলিয়া মিশিয়া কতই ছবি উৎপাদন করিতেছে; যদি পৃথিবীর সব একাকার হইত—বৃক্ষ লতা, চন্দ্র সূর্য্য, আলোক আঁধার, পর্ব্বত নদী, নরনারী, ভূমি আদি,—বালক বৃদ্ধ, সকলই যদি একাকার হইত, পৃথিবীতে মিলনের এই যে গভীর শাস্ত্রের কথা বলিতেছি, তবে এ শাস্ত্র থাকিত না;—পৃথিবী নরনারীর বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। ঈশ্বরের বিধান, মানুষ পৃথিবীতে বাস করিবে, তাই অবস্থার পরে নূতনতর অবস্থা আসিতেছে,—পৃথিবী যেন অনন্ত বৈচিত্র্যময় শোভায় সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ মিলিতে মিলিতে, ক্রমাগত মহা-মিলনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অবস্থার পরে অবস্থা, লোকের পরে লোক, জাতির পরে জাতি, ক্রমেই আসিয়া মানুষের পূত বুকে আলিঙ্গন করিতেছে। দুঃখীর মনে যদি অবস্থার বৈপরীত্যের আশাবৃত্তি জাগরুক না থাকিত, তবে দুঃখী কখনও জীবনভার বহিত না। ঘোরতর যুদ্ধের সময় উভয় দলের মনে যদি সন্ধির আশা না জাগিত, তবে কেহ কেহ নির্ম্মম চিত্তে যুদ্ধে যাইত না। মানুষের জীবন উন্নতির দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইবে, এ বিধান যদি নরনারীর হৃদয়ে না থাকিত, মানুষ কখনও জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না,—আত্মঘাতী হইয়া মরিত। যে দিকে দেখ, সর্ব্বত্রই মিলনের বিধান, প্রকৃতির নিগূঢ় স্থানে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত। এই মিলনকে লক্ষ্য করিয়াই, এই মিলনকে ধরিবার জন্যই মানুষ চলিতেছে। পৃথিবী হইতে মিলনের ভাব উঠিয়া যাইতেছে, যে মনে করে, সে মূর্খ; কারণ, মিলনের আশা না থাকিলে বিশ্বের কোন জীবসংখ্যার বৃদ্ধি হইত না। আমরা বুঝিয়াছি, পৃথিবী

সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত মিলনের দিকেই চলিতেছে। ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ডের সহিত দশ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সম্বন্ধ ছিল না, সে সম্বন্ধ আজ হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য পৃথিবীকে ক্রমাগত এক গভীর আত্মীয়তার দিকে,—এক অপরূপ মিলনের পথে লইয়া যাইতেছে। য়ুরোপ আসিয়া, আফ্রিকা আমেরিকা, আজ সকলেই মিলন, সকলেই ভ্রাতৃভাবের জন্য লালায়িত হইতেছে। আর্য্যভাবে পাশ্চাত্য-ভাব মিশিতেছে,—শ্রীগৌরাঙ্গে আর মহম্মদে, শাক্যমুনি আর যিশুখৃষ্টের সহিত গভীর মিলনের ভাব দেখা যাইতেছে। ভারত কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ মূর্খ পণ্ডিত, তুমি তাহা কি বুঝিবে? পৃথিবীর সকল দেশ উন্নতির জন্য, পরস্পরের বিশেষত্ব গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হইয়া, কষ্ট যন্ত্রণাকে মাথায় বহিয়া দেশ দেশান্তরে যাইতে থাকিবে, আর ভারত চিরকাল একই ভাবে মরণের কোলে পড়িয়া রহিবে? অসভ্য জাপান উন্নতির সঙ্গীত ধরিয়াছে,—পদ দলিত ইটালীকে আবার দীপ্তিময়ী অবস্থা-পরিবর্ত্তনের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতেছে,—অসভ্য রুসিয়া গর্ব্বিত মস্তকে রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ছুটিতেছে, আর সোণার ভারত চির অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে? বিধাতার বিধান কখনই তাহা হইতে পারে না। এক অবস্থার পীড়নে কখনই কোন জাতি চিরকাল পেষিত হইতে পারে না। তাই দেখ, দুঃখের পরে সুখ-সূর্য্য উদিত হইতেছে। ভারতবর্ষ এক অপরূপ সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, আজ আমরা তাহারই কথা বলিব। মরণের কোলে শুইয়া, ভারত যে এক জীবন্ত ভাব উপার্জ্জন করিতেছেন, আজ আমরা তাহারই কথা বলিব।

বহুকাল ধরিয়া ভারতে এই এক গভীর শাস্ত্র প্রচারিত হইতেছিল,—আপনাকে লইয়া মত্ত হও। "আপনি মানুষ হও, আপনি মহত্ত্ব লাভ কর, আপনি যোগী হও, আপনি মুক্ত হও, সংসারসুখ, ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে গমন কর, যোগ সাধনায় অঙ্গ ঢালিয়া দেও,—নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া মোক্ষধামে চলিয়া যাও।" আর্য্যভূমিতে মহত্ত্বের অভাব রহিল না, জ্ঞানকাণ্ড—বিজ্ঞান দর্শন; কর্ম্মকাণ্ড—যাগযজ্ঞাদি, সকলেরই উৎকর্ষ সাধিত হইল,—যোগ ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর উজ্জ্বল স্বর্ণ মুকুট ভারতের মস্তকে শোভিত হইল। কিন্তু অন্যের জন্য সে সকল কিছুই হয় নাই, সুতরাং থাকিল না"। ভারতের কীর্ত্তিকলাপ যে আজ বিস্মৃতির অগাধে,—কল্পনার ক্রোড়ে পতিত রহিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ,

ভারতের প্রাচীন যোগী ঋষিরা পরের জন্য ভাবিতেন না—তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রদানে করিতেন না। "তুমি পাও আর না পাও, আমার মুক্তি হইলেই হইল। ত্যাগ বুঝিয়া অনুসরণ করিতে হয়, কর, আমি তাহার জন্য ভাবিব না, আমি আমারই জন্য দায়ী, আমারই জন্য চিন্তা করিব," এই তখনকার অধিকাংশ মুনিঋষিদিগের ধর্ম্ম-কথা। সংসার-যাপন অধর্ম্ম, বিবাহ পাপ-জনক,—পৃথিবীময় প্রলোভন,—লোকের হৃদয় পঙ্কময়,—তখনকার লোকেরা, কল্পনার চক্ষে ইহা ভাবিয়া ভীত হইয়া, সংসার পরিত্যাগ করিয়া, বিজন অরণ্যে পলায়ন করিতেন। ভারতের কত মুনি, কত যোগী, কত ঋষির অস্তিত্ব-নাম সময়-হিমালয়ের নিভৃত বিস্মৃতি কন্দরে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? তখনকার ভাবই এই—নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন কর—ফলের প্রত্যাশী হইও না,—অন্যের জন্য ভাবিও না,—আপনি যোগী হও, আপনি ঋষি হও। যাহা কিছু ভজন সাধন, যাগযজ্ঞ, যোগধ্যান, সকলই নিজের জন্য কর। অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ,—ভারতের ভাবী উন্নতির মূলে এই প্রকারে কুঠারাঘাত করিল। এই যোগ ধর্ম্মের ভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইল অবশেষে—শাক্যমুনির সময়ে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যখন বিলাস-স্পৃহা প্রবেশ করিয়াছিল, যোগ ধর্ম্মের ভাব যখন একটু শিথিল হইয়াছিল, তখন শাক্যসিংহ রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন! স্ত্রী জানি না, পুত্র জানি না, পিতা জানি না, মাতা জানি না, শাক্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া, রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনের পর সিদ্ধ হইলেন। মার পিশুনকে পরাজিত করিয়া শাক্য বুদ্ধ হইলেন,—নির্ব্বাণ-মুক্তি পাইলেন। বুদ্ধের প্রতিকৃতি, বুদ্ধের ছায়া দেশ দেশান্তরে অমনি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল;—যোগ ধর্ম্ম আবার জাগ্রত মাতিয়া উঠিল। ভারতের নরনারী আবার আপনার জীবনকে উন্নত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কি উন্নত ভাব! বাস্তবিক বুদ্ধের জীবনে এক গভীর শিক্ষা এই পাওয়া যায়, আপনি সিদ্ধ না হইলে অন্যের জন্য কিছুই করা যায় না। যতক্ষণ আমি অন্ধ, ততক্ষণ আর একজন অন্ধকে কখনই চালাইতে পারি না। আমার জীবন পবিত্র না হইলে কখনই অন্যকে পবিত্রতার পথে টানিতে পারি না। আমার জীবন বিশ্বাসে অটল না হইলে, কখনই আমি অন্যকে বিশ্বাসে আকর্ষণ করিতে পারি না। ভারতের এই আত্মতত্ত্ব শিক্ষা,—এই সিদ্ধির পথ,—এই অহংজ্ঞান

বিসর্জ্জনের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত, বুদ্ধের সময়ে চরম উন্নতি লাভ করিল। দলে দলে পরিব্রাজকগণ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কঠোর সাধন নিযুক্ত হইলেন;—ভারতের আকাশ আবার ধর্ম্ম বিপ্লবে মাতিয়া উঠিল সকলেই মাতিয়া উঠিল, কেহ আর সংসারের উন্নতির দিকে চাহিল না রাজা হও আর প্রজা হও,—ধনী হও আর দরিদ্র হও, সাধন ভিন্ন আর কাহারও পরিত্রাণের পথ নাই, এই মন্ত্র জলদ গম্ভীরস্বরে এক প্রান্ত হইতে ভারতের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইল। কিন্তু অপরিণামদর্শী ভারত, হৃদয় ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, কেবল কঠোর পরমার্থ জ্ঞান লইয়া অধিক দিন থাকিতে পারিল না। আবার ভোগ বিলাস উপস্থিত হইল। আবার ব্রাহ্মণের আধিপত্য কিম্বা অলসতার পরিচর্য্যা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য পুনরায় স্থাপিত হইলে, সকল উন্নতি-লাভের ভার ব্রাহ্মণের উপর সমর্পণ করিয়া, ভারত আরো নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। অনেক যুগ এই ভাবে অতীত হইল। কিন্তু দুর্দ্দিন কি কখনও চিরস্থায়ী হয়? ভারতের আকাশ আবার পরিষ্কার হইল,—জ্ঞান কাণ্ডের পরে চৈতন্যের নব প্রেমকাণ্ড আরম্ভ হইল। প্রেমের অবতার অবতীর্ণ হইলেন। "কোথায় হরি, কিরূপ হরি, কেমনে পাইব হরিকে," এই চিন্তায় উন্মত্ত। জ্ঞানহীন সন্ন্যাসীর দল চৈতন্যের সময়ে সৃষ্ট হইল। বুদ্ধ এবং চৈতন্য উভয়েরই মূল-মন্ত্র সাম্যবাদ—ভেদাভেদ নাই, সকলেই ধর্ম্মের অধিকারী। কিন্তু এক জন জ্ঞানী, আর এক জন প্রেমিক। দলে দলে লোক আসিয়া চৈতন্যের হরিগুণ কীর্ত্তনের উন্মত্ততায় যোগ দিল,—সংসার পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, ভেক লইয়া, ভিখারী হইয়া, বৈরাগীদল বাহির হইল,—মূলমন্ত্র, "—নামে রুচি, জীবে দয়া। সকলকে প্রেমালিঙ্গন কর, পাপী পুণ্যাত্মার ভেদাভেদ নাই, সকলের কর্ণেই হরিনাম শুনাও, সকলকে মাতাও, পরিবার পরিজন নাই,—আত্মীয় বান্ধব নাই; সকল একাকার হইয়া হরি প্রেমে মত্ত হও।" চৈতন্যের গভীর প্রেমে লোক তখন মাতিল বটে, কিন্তু বুদ্ধের প্রেম-শূন্য জ্ঞান যে কারণে ভারতের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারে নাই, সেই কারণে চৈতন্যের জ্ঞান-শূন্য প্রেমও ভারতের সার্ব্বভৌমিক স্থায়ী ধর্ম্ম হইল না। সন্ন্যাস ধর্ম্ম সকলের উপযোগী হইল না, ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায় মিশিয়া এক হইল না;—সাম্যে অসাম্য মিশিল। চৈতন্যের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক হইল না, ইহা বুঝিয়া, নবীন অবতার সোণার চাঁদ অসময়ে

অন্তর্হিত হইলেন। বুদ্ধের প্রেমশূন্য জ্ঞান, আর চৈতন্যের জ্ঞান-শূন্য ভক্তি, উভয়ই যুদ্ধে পরাস্ত হইল,—ভারতের উদ্ধার হইল না। প্রেমের ভিতরে কি এক অভাব ছিল, যাহাতে প্রেম সম্বন্ধে অপ্রেমের কার্য্য করিল। প্রেমে কত বলিদান,—কত অপবিত্রতা—কত কি অস্বাভাবিক ভাব মিশিল। স্বর্গের স্বরূপা পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইল! আর চৈতন্যের প্রেমের রূপান্তরিত অবস্থা দেখিলে কাহার চক্ষে না জল পড়ে? মানুষের চক্ষে জল পড়ুক আর না পড়ুক, ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা এদেশের অভাব বুঝিলেন! ভারত আবার অবনতির পথে যখন চলিতে লাগিল,—ধর্ম্মে যখন অধর্ম্ম, পুণ্যের মাঝে যখন পাপ মিশ্রিত হইতে লাগিল,—অদ্বৈতবাদ যখন অহঙ্কার আনিল; মায়াবাদ যখন অলসতা বৃদ্ধি করিল; জ্ঞানবাদ, প্রেমবাদ, যখন পরাস্ত হইল; পৌরাণিক শাক্ত ধর্ম্মের আর বৈষ্ণব ধর্ম্মেও যখন নানা প্রকার দুর্নীতিময় কদাচার সদাচার বলিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন ভারতের বিধাতা চক্ষের নিমেষে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। মানুষেরা দেখিল, পলাশীর সমরে বিশ্বাস-ঘাতকতায় সিরাজের সিংহাসন অপহৃত হইল। কিন্তু তাহা নয়; বিধাতার ইঙ্গিতে সে ঘটনা ঘটিল। মুসলমানের রিপু-বিলাস, বৈষ্ণবধর্ম্মের পঙ্কিল প্রেম, পৌরাণিক শাক্তধর্ম্মের রিপু-প্রদীপ্ত ভাব এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলুপ্ত-প্রায় জ্ঞানকাণ্ডের স্থলে কর্ম্মকাণ্ডের রাজত্ব আরম্ভ হইল।* সুসময়ে ইংরাজ সিংহাসনে বসিল;—রিপু-সেবা, কুসংস্কার, অন্ধ-প্রেম, এবং কঠিন জ্ঞানের স্থলে খ্রীষ্টের কর্ম্মবাদ, রাজত্ব স্থাপন করিতে উপস্থিত হইল। ইংরাজ রাজত্বে কলঙ্ক আরোপ করিতে চাও, কর, কিন্তু যদি তুমি চিন্তাশীল হও, তবে তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইংরাজরাজত্বের সহিত খ্রীষ্টের কর্ম্মকাণ্ডের জয়ধ্বনি ভারতে নিনাদিত হইতেছে। "তুমি ততক্ষণ স্বর্গের উপযোগী হইবে না, যতক্ষণ তোমার ভ্রাতার সহিত মিলিত না হও"—এই গভীর সংসার-ধর্ম্মশাস্ত্র ভারতে প্রচারিত হইল। "ভ্রাতার সহিত কলহ বিবাদ করিয়া—ভ্রাতার রক্তে শরীরকে রঞ্জিত করিয়া—সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বার্থপরের ন্যায় আসিয়াছ?—স্বর্গ তোমার নিকট হইতে অনেক দূরে। যাও আগে মিলিত হও,—অহঙ্কারকে বলি দাও,—মান সম্ভ্রমকে বিসর্জ্জন দাও,—ভ্রাতা ভগীর

* পূর্ব্বে ভারতে যে কর্ম্মকাণ্ড ছিল, তাহা প্রকৃত কর্ম্মকাণ্ড নহে। যাগ যজ্ঞাদি, হোম সাধনাই প্রকাশ বিশেষ ছিল। প্রকৃত কর্ম্মের [illegible] ভারতে প্রাচীন সময়ে ছিল না।

সহিত একীভূত হইয়া উদিত হয়।"—এই মধুর ধ্বনি স্বর্গ হইতে প্রচারিত হইল। মানুষের সেবায় দেখিতে হইবে,—মানুষের জন্য ভাবিতে হইবে,—অসৎকে সৎ করিতে হইবে,—ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে হইবে,—পরিবারকে প্রতিপালন করিতে হইবে;—আপনার সহিত স্বদেশের উন্নতি করিতে হইবে;—খ্রীষ্টনীতির এই কর্ম্মের প্রবল স্রোত আসিয়া জগৎ ভারতকে প্লাবিত করিল। কিন্তু তখনও বুদ্ধের কঠোর জ্ঞান, চৈতন্যের প্রেম, আর খ্রীষ্টের বিনয় ও কর্ম্মকাণ্ড ভারতে পৃথক হইয়া রহিল। অনেকে মিলনের মর্ম্ম না বুঝিয়া, একেকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যকে আলিঙ্গন করিল,—বুদ্ধের আত্ম ও পরমার্থ জ্ঞান, চৈতন্যের বিশ্ব-প্রেমকে ভুলিয়া, কর্ম্মের মাহাত্ম্যে পা ঢালিয়া খ্রীষ্টের উপাসক হইল! ভারতের সে দুর্দশার কাহিনী আর বলিব কি? জ্ঞান, প্রেম ভুলিয়া কি ধর্ম্ম হয়? কুসংস্কারের পঙ্কিল স্রোত ভারতের অনেক রত্নকে ডুবাইয়া দিল! কেবল কর্ম্ম স্রোতে মজিয়া ইংলণ্ডের হৃদয়ে যে শুষ্কতা, [illegible] প্রবেশ করিতেছে, তাহাদেরও সেই দশা ঘটিল। ঘোরতর ঘৃণা বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল,—হিন্দু খ্রীষ্টানে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল;—ভারতে আর এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হইল। ঘনীভূত মেঘে ভারত আবার আচ্ছন্ন হইল। এই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়—এই তিনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, তিনকে মিলাইয়া এক করিতে চেষ্টিত হইলেন। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সত্য মিলিয়া এক হইবে,—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম মিলিলে তবে ভারত রক্ষা পাইবে, এই মহামন্ত্র সেই তমসাচ্ছন্ন দিনে তিনি গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিলেন। সম্প্রদায় নাই—ভেদাভেদ নাই,—হিংসা বিদ্বেষ নাই,—জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ নাই—সকলে এক সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্যে মিলিত হইব; এই কথা তিনি প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তখনও সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে নাই,—উদার,—সার্ব্বভৌমিক,—ঘনীভূত মিলনের ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিলেন। একে তিন, তিনে এক। জ্ঞান ভিন্ন প্রেম প্রেম নহে; প্রেম ভিন্ন জ্ঞান শুষ্ক; কর্ম্ম ভিন্ন প্রেম নাই;—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম ভিন্ন ব্রহ্ম নাই। বিধাতার কৃপায় এইরূপে ভারত এক আশ্চর্য্য সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। আজ শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ ভাব, বিশেষ স্রোত সর্ব্বত্রই প্রবাহিত হইতেছে;—
—"যুক্তি ভিন্ন শাস্ত্র মানি না; আবার শাস্ত্র মানি বলিয়াই যুক্তি মানি;—আবার যুক্তি মানি বলিয়াই কোন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করি না;—কোন

শাস্ত্র অন্যায় সহ্য করিয়া, বেদবেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, সকলই বহাল ?" এইরূপে পাশ্চাত্য বোধ, বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায়, ভারতের হৃদয় ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার গতি উহার দুর্বল দেহকে কম্পিত করে ? দুঃখের কষাঘাত সহ্য করিয়া যে সুখ পায়, সে কি পুন দুঃখে পড়িতে চায় ? অন্ধ যদি একবার চক্ষু পায়, তবে সে কি আবার অন্ধ হইতে বাসনা রাখে ? শিক্ষার মাহাত্ম্য যে একবার বুঝে, সে কি পুন অশিক্ষিত হইতে চায় ? —যুবক কি বালক হইতে চায় ? ধনী কি চিরদরিদ্র হইতে চায় ? জ্ঞানী কি মূর্খ হইতে ইচ্ছা করে ? যে কঠোর অবস্থা হইতে ভারত চলিয়া আসিয়াছে, শত সহস্র চেষ্টা কর, কাহারও সাধ্য নাই যে, ভারতকে আবার সেই প্রাচীন কঠোর অবস্থায় লইয়া যাইবে। ব্রহ্মপুত্র পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে, মানুষ তোমার কি শক্তি আছে যে, তুমি পুন পদ্মা গঙ্গাকে গোমুখীতে, ব্রহ্মপুত্রকে ব্রহ্মকুণ্ডে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে ? সকল শক্তি এখানে পরাস্ত। কাল্পনিক নিষ্কাম ধর্ম আর ভারতে ফিরিবে না, পৌরাণিক (unpractical ?) কল্পনার ধর্ম আর মাথা তুলিবে না ;—বৈষ্ণবধর্ম—সন্ন্যাস-ধর্ম আর স্থান পাইবে না ;—আর্য্য মিলিয়াছে—অনার্য্যের সহিত ; জ্ঞান মিলিয়াছে—কর্ম্মের সহিত ; প্রেম মিলিয়াছে—জ্ঞানের সহিত ; পূর্ব্ব পশ্চিম এক হইতেছে,—শাক্য, চৈতন্য, খ্রীষ্ট এক হইতেছেন ;—এমন সুখের মিলন ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, সঙ্কীর্ণমনা, কর্ম্মশূন্য, ভক্তিশূন্য, জ্ঞানপিপাসু, তুমি ? জাতিভেদের মূল ভারত-হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইয়াছে,—সাধ্য কি তোমার যে, তুমি পুন তাহাকে সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবে ? বিধবার অশ্রু ঘুচিবে,—ভ্রূণহত্যা,—পাপ ব্যভিচার,—দগ্ধ মাংস, এ সকল আর ভারতে স্থান পাইবে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর উদার বিবেক-প্রধান ভারতে টিকিবে না। আমার হইয়া তুমি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, আর আমি অলস ভাবে বসিয়া থাকিব, এই অর্থশূন্য ধর্ম আর ভারতে স্থান পাইবে না। যদি মানুষ হও, যদি দেশের হিতৈষী হও, এই বিশেষ সময়ের বিশেষ ডাক হৃদয়ঙ্গম কর—করিয়া বল, চাই—জ্ঞান, চাই প্রেম, চাই কর্ম। মহা মিলনের দিনে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য কর, আর বল, চাই—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম। মত লইয়া ভারতে অনেক কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে,—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে ভারতের অস্থি মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে,—ভ্রাতার বুকের রক্তে অনেক ভ্রাতার রক্ত-পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে। আর না। যে যেখানে থাক,

এস। জ্ঞানী, প্রেমিক ও কর্ম্মী, সকলে একবার বিবেক ও বুদ্ধের অমৃত সিন্ধুতে বহু সুখে ডুবিয়া এস। ঘৃণা বিদ্বেষ দূর হউক,—শান্তির রাজ্য প্রতি-ষ্ঠিত হউক। তোমার পরিবারের পার্শ্বে অজ্ঞান অাঁধারে আমি থাকিলে, ভাই, তোমার পরিবার কখনই জ্ঞানী হইতে পারিবে না। আমার চরিত্র দূষিত থাকিলে, কখনই ভাই, তোমার চরিত্র ভাল থাকিবে না। তবে ভাই এস, তোমার চরণধূলি আমার মাথায় ছোঁয়াও। এস, পরস্পরে পরস্পরের বিশেষ বিশেষ ভাব গ্রহণ করি। প্রেমিক প্রেম দেও, জ্ঞানী জ্ঞান বিলাও, কর্ম্মী কর্ম্ম শিখাও; আবার প্রত্যেকেই প্রশস্ত পথ খুলিয়া যাউক। একের জীবনে যাহা নাই, তাহা অন্যের নিকট পাইয়া কৃতার্থ হই, ধন্য হই। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে একেবারে পরিত্যাজ্য কিছুই নাই, কে কাহাকে ঘৃণা করিবে? সকলই ভাই ভাই,—সকলের ভিতরেই বিশেষত্ব লুক্কায়িত। তবে এস, মত ভুলিয়া, বাহির ভুলিয়া, অহংত্ব ভুলিয়া, পরস্পর এই মহা মিলনের দিনে মিলিত হই; মিলিয়া, এক হইয়া মহা সিন্ধুর দিকে ধাবিত হই। এস, আনন্দের দিনে মহানন্দে নৃত্য করি। এমন মনোমুগ্ধকর মিলনের স্থলে সঙ্কীর্ণতা, সন্দেহ, বিবাদ, বিসম্বাদ কেন আনিতেছ? কেবল পূর্ব্বকে লইয়া থাকিবে, পশ্চিমকে তুচ্ছ করিবে? কেন পশ্চিম কি বিধাতার সৃষ্ট নয়? পশ্চিমে কি বিশেষত্ব নাই? পশ্চিমের কর্ম্মকে আদর করিতেই হইবে। ঈশা, চৈতন্য ও বুদ্ধ এক হইয়াছেন এই ভারতে, একবার চাহিয়া দেখ। যদি মনুষ্যত্ব লাভের বাসনা থাকে, তবে অগ্রে সিদ্ধি লাভের জন্য নিভৃত হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর, পরে মানবের উদ্ধারের জন্য, আপনাকে কর্ম্মের স্রোতে ভাসাইয়া দেও। সিদ্ধ হইয়া, জ্ঞান-কর্ম্মকে জীবনের ভূষণ করিয়া, ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম, তিনকে হৃদয়ে বাঁধ;—বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা, এই তিনের বিশেষ ভাবকে অবলম্বন কর। বিশেষ সময়ের বিশেষ ভাব বুঝিয়া দেশের জন্য চিন্তিত হও। পূর্ব্ব পশ্চিম মিলিয়াছে, উত্তর দক্ষিণ মিলিবে যে ধর্ম্মে, সে ধর্ম্মের ভাব এই। পাশব বল ভারতে নাই বলিয়া দুঃখ নাই; ভারতের বিশেষ ভাব এই, ভারত জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মে মিলিয়া আধ্যাত্মিক বলে পৃথিবীকে এক হৃদয়ে বাঁধিবে। হিংসা বিদ্বেষ সকল নাশ করিয়া, অহ-ঙ্কারকে ডুবাইয়া, গঙ্গা যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা সকল একীভূত হইয়া, মহা-সিন্ধুকে মিলিবে। সে দিন কবে আসিবে, যে দিন ভারত, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই তিনের সমন্বয়ীভূত সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পৃথিবীর সকল নর-

নারীকে এক ভাবে থাকিয়া, যেখানে তার অমৃতময় জীবন জানাইতে পারিবে ! তবে সেই শুভ মুহূর্ত দেখা দিবে, যখন এই সব নারীগণ উত্থান হইয়া, প্রেম দিয়ে, আমাদের আনন্দময়ীর মত জীবনে মধুময়ীরা, ভারতবর্ষে, আত্ম প্রভাব বিস্তার করিয়া, কুসংস্কারের মলিন আবরণ ছিন্ন করিয়া, কর্ত্তব্যের কঠোর ভাবে বিভোর হইয়া, পৃথিবীতে অমৃতময়ীরূপ উন্নতি-আনন্দের বার্ত্তা শুনাইবে,—তবে সমস্ত দেশ বিনাশুক মরুভূমি ভেদ করিয়া, তাই জ্যোতি বিকিরিয়া, আর প্রেম ও বর্ষের মধুময় পুণ্য পর্ব্বতার মত হইবে,—তবে ভারতের চির-অন্ধকার ছিন্ন হইবে,—তবে ভারত প্রকৃত জীবন পাইবে !!

আমি-রহস্য।*

"Our God is an indwelling encompassing reality, present in every force and illumining all space. Not only in contemplation and prayer, but in all the secular details of our daily life, in all our social and domestic duties, yea in our eating and drinking, there is God always speaking to us and showing Himself to us. But unbelievers have ever ascribed to human agency things which belong to God."

"Held fast in His encircling arms I cannot move, but am moved; I cannot speak, but I am made to speak."—*Keshub Chunder Sen*

আমি কি, আমি কেন ?—এ এক গভীর রহস্য। অতি অল্প লোক এ গভীর রহস্য ভেদ করিতে পারে। অথচ মানুষ যতই উন্নতশীল হইতে থাকে, ততই হৃদয়ের নিভৃত স্থানে,—যেখানে পৃথিবীর কোলাহল বা আন্দোলন পৌঁছে না—পৃথিবীর ফুল ফুটে না, আকাশের চাঁদ হাসে না, সেই অতি নিভৃত,—অতি নিভৃত স্থানে জাগিয়া উঠে—আমি কি, আমি কেন, আমি কোথায় ? এই চিন্তাই ধর্ম সাধনার প্রথম সোপান। এই চিন্তা যখন মানবের হৃদয়কে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে, তখনই মানুষ স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হয়।

কিন্তু সে দূরের কথা। আমি কি, একথা অতি অল্প লোকই বুঝিতে পারে। এই গভীর চিন্তাতে বুদ্ধদেব বনবাসী হইয়াছিলেন, খ্রীষ্ট আত্মহারা হইয়াছিলেন, মহম্মদ উন্মাদের ন্যায় হইয়াছিলেন। এবং সেদিন আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেশবচন্দ্র সেন কত দুঃখ-কাতর হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন ? এ গভীর রহস্য কেন ? আত্মবোধের শেষ নাই কেন ?—স্থূল অণুতে পরিণত কেন ? সীমা অসীমে লীন হয় কেন, অদ্ভুত রূপে এ গভীর তত্ত্ব ভেদ করা বড়ই কঠিন। ধরি-ধরি-ধরিতে পারি না, পাই-পাই-পাই-না করিতে করিতেই তত্ত্বান্বেষী মানুষের জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। এ গভীর রহস্যের উত্তর কোথায় ?

উত্তর পাওয়া যা'ক বা না যা'ক, তবু মানুষকে বাধ্য হইয়া কিছু দিন পৃথিবীতে থাকিতেই হইবে। আদি-বোধ নাই ;—পরিণাম ধারণা নাই ;—অথচ মানুষ রহিয়াছে। কি জন্য যেন, মানুষ ভূতের ব্যাগার খাটিয়া মরিতেছে। আমিত্ব হইতেই সমাজের উৎপত্তি ;—আমিত্ব না থাকিলে বন্ধন বা সমাজ, কিছুই থাকিত না। আমিত্ব না থাকিলে পৃথিবীর কোলাহল বা জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকিত না। যদি তাই হয়, তবে আমিত্বের বিনাশ সাধন না করিয়া মানুষ কেন কষ্ট দুঃখের দাসত্ব স্বীকার করিয়া মরিতেছে ? কেন দুঃখ, কেন জ্বালা ভুগিতেছে ?—এ কোন কথারই উত্তর নাই ;—অথচ মানুষ আসিয়াছে, থাকিতেছে !—থাকিবে, রহিবে ! কি এক অবিনাশী শক্তি পশ্চাত হইতে মানুষকে ঠেলিতেছে যে, মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া, যে পথ সে জানে না, সেই পথের দিকেই ছুটিতেছে ! সে পথ অতি ভীষণ পথ,—সে পথ মৃত্যু !

মানুষ কি ? মৃত মানুষের শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেল,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত পৃথক পৃথক করিয়া ফেল—শিরার পরে শিরা, মাংসের পরে মাংস, অস্থির পরে অস্থি, স্নায়ুর উপরে স্নায়ু—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, তাহা হইতে আরো সূক্ষ্মতর বাছিয়া বাহির কর ;—কিন্তু এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না, যাহাতে আমিত্বের সূক্ষ্ম বীজ—নিহিত। শোণিতই বল, আর মজ্জাই বল, তেজই বল, আর বীর্য্যই বল, সময় তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন সাধিতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ। মৃত্যুর পরে মানুষকে পৃথিবীর বাজারে অন্বেষণ করিতে যাও—দেখিবে, আর সে মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপ মিলাইয়া গিয়াছে, শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া কি হইয়া গিয়াছে ! হায়, হায়, শ্মশানে ভস্মীভূত মৃত শরীরের পরিণাম কে না দেখিয়াছে ? এই ছিল, এই নাই, দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে কি হইয়া গেল ! ইহা দেখিয়া দেখিয়াও মানুষ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত ! আপনাকে লইয়া থাকাতেই যেন মহত্ব ! আমার শরীর

যে আত্মার [illegible] হইতে, [illegible] অবস্থা,—পৃথিবীর [illegible] মানুষের জন্য চেষ্টা। [illegible] —তাহা [illegible] হইবে, অনন্ত মানবের এই চেষ্টা। এমন লোক পৃথিবীতে নাই,—যে উন্নতির জন্য পিপাসিত নয়। এমন লোক জগতে দেখা যায় না, যে আপন উন্নতিকে পছন্দ করে নাই। পাপী আর পুণ্যাত্মা, ধনী আর দরিদ্র, মূর্খ আর জ্ঞানী—সকলেরই লক্ষ্য উন্নতি। শ্রেষ্ঠত্ব—অনন্ত। অনন্তের পথই মানবের একমাত্র আপনার পথ। পাইলে আরো পাইতে ইচ্ছা হয়, বাড়িলে আরো বাড়িতে ইচ্ছা হয়। মানুষ অনাগত ভবিষ্যৎ উন্নতিতে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই যে চেষ্টা—ইহার শেষ নাই। নিশ্চেষ্ট মানুষ এই পৃথিবীতে নাই। খাটিয়া খাটিয়া মানুষ মরিতেছে। মরিবার জন্যই মানুষ ছুটিতেছে। শত শত ব্যক্তি মরিয়াছেন—চক্ষে দেখিয়াও মানুষ আসক্তি-রজ্জু ছিঁড়িতে পারে না। মানুষ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে মানুষকে চিতায় ভস্মীভূত করে, কিন্তু কভু আপন পরিণাম ভাবে না। যে মরিয়াছে, সে ইহ মরিবে, কিন্তু তাহা ভাবিয়া, ভাই, তুমি কি জীবন-মমতা ছিন্ন করিতে পার? —আপনার উন্নতির চেষ্টা ভুলিতে পার?—তাহা অসম্ভব। তুমিও পার না, আমিও পারি না।' নিরাশার স্বপ্ন মানুষকে চিরকাল ভুলাইতে পারে না। মানুষের জন্ম আশা পরিপূর্ণ [illegible]—মানুষ সকল নিরাশা হইতে উদ্ধার পায়। মরিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত প্রাণের সম্বল—উন্নতির আশা। মৃত্যুর পরের কথা জানি না, বলিতে চাই না, কিন্তু ইহা ঠিক যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত মানুষের প্রাণের সম্বল—উন্নতির পিপাসা আশা। পিপাসা-আশা এক সঞ্জীবনী শক্তি। চক্ষের জল পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া যায়—ভগ্ন হৃদয় দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে। শোক, তাপ ও বিপদ আপদের ভ্রূকুটী দেখিতে দেখিতে মানুষ ভুলিয়া যায়। অবশেষে হাসিতে হাসিতে মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। মানুষ নিশ্চয় মরিবে, কিন্তু তাহাও তাহার বিশ্বাস-যোগ্য নয়—তাহাও ধারণা নাই। অন্ধকার যে মানুষের পরিণাম, তাহা কে ভাবিতে পারে? ভাবিতে পারিলে কি জীবন-ভার বহন করা যাইত? —কষ্টের পরে হাঁটা যাইত?—কখনই নহে। এই জন্যই জীবন তাহা ভাবিতে পারে না। মৃত্যুর কোলে এক পা দিয়াও মানুষ পৃথিবীর দিকে

৬

জীবনের স্বরূপ অজ্ঞাত। কিন্তু যে আশা—এই যে প্রবল আশা, ইহা কি মৃত্যুতেই শেষ হইবে নাকি? আমার অন্তরে এই আশা ছিল, তাহার নিকটের কথা যত সব নাই নিশ্চয় হইল, যদি মৃত্যু আসিল, অমনি আশা মিথ্যা হইল, ইহা আমি বুঝি না। আমি মানি না, তুমি কি মানিতে পার? ইহা মানা তোমার পক্ষেও অসম্ভব। পৃথিবীর কেহই মানিতে পারে না যে, মৃত্যুই সকল উন্নতি-আশার পরিসমাপ্তি। পূর্ণবিশ্বাসী হও, বা আমার কথাই স্বীকার কর, তোমাকে মানিতেই হইবে যে, উন্নতি-আশার পরিসমাপ্তি নাই। না মানিলে ধর্ম টিকে না।

এই আশাই—বিশ্বাস। কে যেন বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে। কে যেন মানুষকে অবিরত টানিতেছে। জরা-মৃত্যু-চিন্তা আসিয়া যখন রাজপুত্র গোপার প্রিয় সিদ্ধার্থের হৃদয়কে মলিন করিয়া ফেলিল, তখন কে যেন নীরব ভাষায় ডাকিয়া বলিল—"সন্তান, চাহিয়া দেখ, আমি আছি।"—সিদ্ধার্থ অনশনে অনাহারেও জীবিত রহিলেন। আশার জীবন্ত শক্তিবলে মানুষ মরিয়াও জীবিত। মৃত্যু কোথায়?—মৃত্যু একটা অবস্থা মাত্র। মৃত্যুর অস্তিত্ব নাই,—মৃত্যুর ভয় নাই—এই আশার নিকটে! বিশ্বাসীর নিকট আবার মৃত্যুর ভ্রূকুটী? অনাহারই বল, আর অনিদ্রাই বল,—রোগই বল আর শোকই বল—বিশ্বাসীর নিকটে এ সকলের পরাক্রম নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, তাহাকে বিশ্বাসী কেন ভয় করিবে? বিশ্বাসীর মরণের ভয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, উন্নতির আশা নাই, এমন মানুষ নাই; সুতরাং অবিশ্বাসী মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নাই। সুতরাং মৃত্যুর ভয় করিয়া মানুষ কোন দিন উন্নতিকে বিস্মৃত হইতে পারিল না। ঈশা অনশনেও মরেন নাই। ঈশা মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন, তোমরা কি জান না? ইহা কল্পনার কথা নহে, ইহা জীবন্ত কথা। সকলেই ঈশার ন্যায় মৃত্যুর কবলগ্রাস হইতে অবিরত উত্থিত হইতেছে। এই মরিতেছি, এই উঠিতেছি—আমি। উঠি আবার মরি, মরি আবার উঠি। উত্থিত উন্নতির পথে মৃত্যুর গ্রাস ধারণ করিয়া মানুষ অমরত্ব লাভ করিতেছে। অমৃতের সন্তান যিনি, তুমি, আমাকে এবং তাহাকে পড়িতে দেখিয়া ইহা ভাবিতেছ? মিথ্যাই বলিয়া তুমি উপহাস করিতেছ? ভাই, দেখিতে দেখিতে আবার উঠ। শিশু একবার পড়ে, আবার উঠে। অনন্তের শিশু মানুষের ইতি হবার পতন হয়, তবে সহস্রবার উত্থান হয়,—তবে সহস্রবার জীবন লাভ

হয়। [illegible]
[illegible]
[illegible]
না। কেন করিবে? [illegible] সকল মানুষের হাতে বাঁধিয়া কেন দণ্ড করিবে? করিবার আছে কি? আশা—কেবল আশায়, কেবল বিশ্বাস। এই যে বিশ্বাস, ইহার অধিকারী সকলেই। ধর্ম্ম কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ধর্ম্ম ভক্তকে আবদ্ধ করে, মুক্তকে নিবদ্ধ করে, সকল এ ভাবের অধীন নহে। যিনি আমাকে আমার পথ দেখাইয়াছেন, তিনিই তোমাকেও তোমার পথ দেখাইতেছেন। যিনি আমাকে রাখিয়াছেন, তিনিই তোমাকে রাখিয়াছেন। আমি আমার পথ পাইয়াছি, তুমি পাও নাই, ইহা আমি স্বীকার করি না। সকলেরই প্রাণের বিশ্বাস এক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিতে;—তা সাকারই হউক বা নিরাকারই হউক। সাকারও নিরাকার, নিরাকারও সাকার। সাকারও গুণের সমষ্টি, নিরাকারও গুণসমষ্টি। কিন্তু মানিতেই হইবে, অবিশ্বাসী বাঁচিবার যো নাই। অবিশ্বাস লইয়া কেহই বাঁচে নাই। আপনার অস্তিত্ব যে মানে, তাহাকেই মায়ের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। মা ভিন্ন সন্তানের আবির্ভাব জগতে অসম্ভব। সকলেই মায়ের সন্তান; সকলেই বিশ্বাসী। মায়ের নিকট সকল সন্তান সমান। আমি বড়, তুমি ছোট, কিম্বা আমি ছোট, তুমি বড়, ইহা তুমি ও আমি ভাবি বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট তুমি ও আমি সমান। মায়ের সকল সন্তানই সমান। অন্য দিকে, বড় আর ছোট কি? তুমি ধনী হইয়াও উন্নত হইতে পার, আমি কাঙ্গাল দরিদ্র হইয়াও হইতে পারি। তোমারও লক্ষ্য—উন্নতি, আমারও লক্ষ্য—এই উন্নতি। তোমাকেও যে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, আমাকেও সেই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, যে বায়ু তোমার জীবন ধারণের কারণ,—তাহাই আমার জীবন ধারণের কারণ হইয়াছে। তোমারও পরিণামে মৃত্যু, আমারও তাহাই। ভেদাভেদ, কেবল ক্ষুদ্র বুদ্ধিপ্রসূত কল্পনা বই আর কিছুই নহে,—কেবল অহঙ্কার হইতে প্রসূত পাপ-পঙ্কল মাত্র। এ সকল ভেদাভেদে কিছু আসে যায় না। ধনের ভিতরে থাকিয়াও এক জনের উন্নতি হইতে পারে, দারিদ্র্যের ভিতরে লালিত পালিত হইয়াও পারে। উন্নতি সকলেরই লক্ষ্য। মৃত্যুর পরে নবজীবন লাভ—সকলেরই পরিণাম। অতএব ভেদাভেদ করিয়া যে কুতর্ক করে, সে বড়ই মূর্খ। হজরতের গৃহে ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন;

আর বাবার পুত্রে সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াও অমর হইয়া গিয়াছেন। সময় ও দেশের ঘোর আবরণ ছিন্ন কর, বুঝিতে পারিবে—যীশু ও বুদ্ধ সকল ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছেন। কে সুখী, কে দুঃখী, কে বড়, কে ছোট? এ সকল গণনা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। যে, যে অবস্থায় পতিত, তাহাই তাহার ভাল। দুঃখে পড়িয়াও লোক উন্নতির দিকে চলে, সুখে ভাসিয়াও লোক ঐ পথে হাটে। লোক হাটে, লোক চলে? ভুল কথা। কে যেন হাঁটায়, কে যেন চালায়। রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র—সকলেরই পরিণাম মৃত্যু ও উন্নতি। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে মরিতেই হইবে। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে মরণের ভিতর দিয়া নব-জীবন লাভ করিতেই হইবে। ইচ্ছা কোথায়? আমিত্ব কোথায়? সকলই তিনিত্ব—সকলই তিনিময়। তুমি ইচ্ছা করিয়াই শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিতে পার না;—অনাহারে মরিতে পার না। তোমাকে কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে। তোমার শরীর ধারণ করিবার জন্য অন্নের গ্রাস মুখে দিতেই হইবে। লোভ নামে যে একটা কথা আছে, সেটা তুমি আমি কিছু সৃষ্টি করি নাই। আহারে স্পৃহা প্রত্যেকেরই আছে—কেবল বাঁচিবার জন্য। শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেই হইবে; পরিবার প্রতিপালন করিতেই হইবে; অসহায় দরিদ্রের অশ্রুজল ফেলিতেই হইবে—পৃথিবীর মঙ্গল চিন্তা করিতেই হইবে। এ সকল কি জন্য? কেবল আপনার উন্নতির জন্য। পৃথিবীর সকল কর্ত্তব্য বোধ, আপনার উন্নতির জন্য। কর্ত্তব্য নামে যে একটা কথা আছে, সেটা কেবল আপনার উন্নতির জন্য। তুমি যে চেষ্টা কর, কেন, তুমি ঠিক বলিতে পার না। কি এক অবিনাশী শক্তি পশ্চাৎ হইতে ঠেলিতেছে, মানুষ অবাক হইয়া আত্মহারা হইয়া কেবল চলিতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—মানুষ ক্রমাগতই চলিতেছে। হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানত্ব—বৌদ্ধত্ব—সকলত্বই উন্নতির নিম্নতর সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতেছে। খুব গভীর ভাবে মানুষ যখন চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখনই মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়, তখনই পিতা পুত্রে সম্মিলন হয়। তখনই পুত্র বলে "Not I, but my father in me," আমি নহি, পিতাই আমাতে বিদ্যমান! কি উচ্চ কথা। পুত্রত্ব ঘুচিয়া কেবল—পিতৃত্ব! কি আত্মত্যাগ—কি স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত! পিতৃত্বে ডুবিলে পুত্রত্ব ঘুচিয়া যায়। এ শরীর তাঁহারই [illegible]

শোণিত তাঁহারই শোণিত। তাঁহারই সব—আমি কিছুই নই। আমিত্বের অস্তিত্ব, অহঙ্কার মূলক কথা—অজ্ঞত্ব থেকে উঠা কিছুই নহে। তাঁহারই ইচ্ছাতে আছি, তাঁহারই ইচ্ছাতে যাইব।" সকলময়ের সকল ইচ্ছাই নিয়ত হয়। মানুষ তাঁহারই হাতের পুত্তলিকা মাত্র। তিনি যন্ত্র চালাইতেছেন—আমরা কেবল জড়-যন্ত্র মাত্র। আমি যে কলম ধরিয়া লিখি, সেই কলম যেমন আমি নহি, তিনি আমাদের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন বলিয়া—আমরাই তিনি নহেন। মানুষ, তোমরা ভুল বুঝিও না। মানুষ ঈশ্বর নহে; কিন্তু মানুষে ঈশ্বর। বস্তুই ঈশ্বর নহে, কিন্তু বস্তুতে—ঈশ্বর। দ্বৈতবাদের ভিতরে, অতি সূক্ষ্ম স্থানেই অদ্বৈতবাদ লুকায়িত। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, আমি-মহত্ত্ব ঘুচিয়া যায়। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। ছায়া মিলিয়া যায়। মোহ আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়। তখনই মানুষ বলে, "হে আশা, হে বিশ্বাস, হে শক্তি, তুমিই সর্ব্বস্ব, আমি কিছুই নই।" বুদ্ধ, "আমিই যে তুমি, তাহা নও, কিন্তু তুমিই সকল, আমি কিছুই নই। সকল তুমি, সর্ব্বস্ব তুমি, শক্তি তুমি, মুক্তি তুমি, জীবন তুমি, উন্নতি তুমি।" অনন্ত অপার চক্রে পড়িয়া মানুষের অস্তিত্ব-অস্থি তখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তখনই ঈশা সন্তান বেশে পুনরুত্থিত হইয়া পুত্রত্ব প্রচারের জন্য বিনয়াবতার ধারণ করে—বুদ্ধ তখন নির্ব্বাণপদ লাভ করে। তখন আকারগত বা মতগত বা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ আর থাকে না। পৃথিবী তখন স্বর্গ হইয়া যায়। অনন্তের সন্তানগণ, অনন্ত কণ্ঠে তখন কেবল মায়ের নামই গান করে। তখন পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বই সর্ব্বস্ব বলিয়া সন্তানের নিকট বোধ হয়। অবোধ অনন্তের শিশু সন্তান তখন পিতা মাতা বই আর কিছুই জানে না। তখন মানুষ দেখে, তিনি যেন সকল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। অস্থিতে তিনি, মাংসে তিনি, মজ্জায় তিনি, প্রতি লোমকূপে তিনি, শোণিত বিন্দুতে বিন্দুতে তিনি—সব যেন তিনিময়,—আকাশ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র তিনিময়, বন উপবন তিনিময়,—ফুল ফল, নদী সাগর, পাহাড় পর্ব্বত—সব তিনিময়। একই শক্তি সকলে, একই প্রাণ সকল বস্তুতে। প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। আপন সত্তা তখন বিশ্বসত্তায় বিলয়। ক্ষুদ্র বারিবিন্দু অপার অতলস্পর্শ সাগরে তখন মিশিয়া গিয়াছে। পৃথকত্ব, বৈচিত্র্য, বৈষম্য সকল ঘুচিয়া, একত্ব, এবং সাম্য সকল ঘটে তখন বিরাজমান। একরূপ ভাঙ্গিয়াই বিভিন্ন, এক হইতেই বহুত্বের উৎপত্তি। বিভিন্ন মিলিয়া আবার একত্বে পরিণত।

এই প্রকার যখন মানুষ চিন্ময় হইয়া যায়, তখন শান্তিপুরের শান্তিঘাটে বসিয়া একতারা লইয়া গগন ফাটাইয়া মায়ের সন্তান কেবলই মায়ের নাম গান করিতে থাকে। সকল সুখ—সকল সম্পদ তখন তাহার জীবনে অবতীর্ণ হয়। অজ্ঞানান্ধ হইয়া সে তখন মহাজ্ঞানী হয়, আত্ম ভাবে। মানুষ তখন দেবতা হয়। পশুত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব হয়। মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হয়। সংসার-ঘোর হইতে পাপ-মুক্ত-চিত্ত মানব তখন ঈশ্বর পুনর্মিলিত হয়। বিশ্বাস যখন যাহার অন্তরে সত্য হয়, তখন তাঁহাকে এই প্রকারে আমি-রহস্যের মীমাংসা করিতেই হইবে। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

প্রেম-খনি বা প্রকৃত ধর্ম।

"We are the miracle of miracles,—the great inscrutable mystery of God. We cannot understand it, we know not how to speak of it, but we may feel and know, if we like, that it is verily so."—*Thomas Carlyle.*

সচরাচর সকল বস্তুরই দুটি দিক দেখিতে পাওয়া যায়,—এক বাহির, আর এক ভিতর। ভিতর আর বাহিরে ঘনীভূত যোগ থাকিলেও, উভয়ের প্রকৃতি, উভয়ের রূপ ও গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মনুষ্যের বাহিরের আকৃতি ভিতরের ছায়ায় চিত্রিত হইলেও; ভিতর ও বাহির সম্পূর্ণ পৃথক। বাহিরের অন্তরালে আর এক সূক্ষ্ম রাজ্য সর্বদা বিরাজিত। তোমাকে প্রথম যখন দেখিলাম, তখন কেবল তোমার রূপ দেখিলাম, আকৃতি দেখিলাম, সৌন্দর্য্য দেখিলাম। ক্রমে দুচারি বৎসরে পরিচয়টা যখন জমাট হইল, তখন তোমাকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপ দেখিলাম। যতই তোমাকে বুঝিতে লাগিলাম, ততই যেন ভিতর হইতে তুমি নব নব শোভায় ফুটিতে লাগিলে,—তোমার কতই শক্তি, কতই গুণ, কতই দয়া, কতই জ্ঞান প্রকাশ পাইল; অথবা তুমি যদি অসৎ লোক হও, তবে সময়ে তোমার কতই নির্দয়তা, আবেগ, কুজ্ঞান—কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রকাশ পাইল। কিছু দিন পরে বুঝিলাম, তোমাকে প্রথম যাহা দেখিয়াছিলাম, তুমি প্রকৃত পক্ষে তাহা নহ;—বুঝিলাম, তোমার বাহিরই সর্বস্ব নহে,—ভিতর আছে। এই প্রকারে জীবজগৎ হইতে জড়জগৎ, জড়জগৎ হইতে পুনঃজীবজগৎ, সর্ব্বত্রই বাহির ও ভিতর, এই দুইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল কুসুমের সুগন্ধময়, সৌন্দর্য্যময়, প্রফুল্লতাময় বহিরাবরণ ভেদ

করিয়া ভিতরে যাও, দেখিবে, সেখানে স্থূল-জগতের ভাব মাত্রও নাই, সৌন্দর্য্য নাই, সেখানে বীজভাবে সূক্ষ্ম বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে;—আকারের ভিতরে প্রাণ খেলিতেছে। এক বট অশ্বত্থের বীজ, তাহার বর্ণ আছে, বিস্তৃতি আছে, আকৃতি আছে,—ঔজ্জ্বল্য আছে,—কত কি আছে। তাহাকে ভেদ কর, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেখ, দেখিবে, স্থূলের সকলগুণ মিলাইয়া যাইতেছে; ক্রমে আরো চূর্ণ কর, দেখিবে, আরো মিলাইয়া যাইতেছে। শেষে দেখিতে পাইবে, অবয়ব যেন আর নাই—সকল মিলাইয়া গিয়াছে, কেবল কি যেন এক অব্যক্ত, অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয় শক্তি রহিয়াছে। এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, পদার্থের দুই রূপ,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। নদী-তীরের বালুকণা যে হিমালয় প্রভৃতির অবস্থা, কেহ কি তাহা বুঝিতে পারে? ক্ষুদ্র বটবীজের অন্তর্নিহিত বিরাট বটবৃক্ষকে দেখিয়া উহারই পরিণতি বলিয়া কি কেহ তাহাকে মনে আনিতে পারে? শারীরিক বলের ক্রীড়া দৃষ্টিগোচর হওয়ায় দেখিয়া যে তাহার ভিতরের অলক্ষিত মানসিক বলের অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চায়? আবার, অভ্রভেদী হিমালয়কে ভেদ করিয়া ভিতরে যাও, দেখিবে, সেখানে শক্তি মিলিয়া পরমাণু হইয়াছে, পরমাণু মিলিয়া বালুকণা হইয়াছে, বালুকণা মিলিয়া মিলিয়া প্রকাণ্ড পর্ব্বত হইয়াছে! কত সূক্ষ্ম হইতে কত বড় হইয়াছে? অথবা বাহিরের রূপ ও ভিতরের শক্তিতে কত প্রভেদ!

ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে উহারই ভিতরে বৃহৎ বৃক্ষের অঙ্কুর; আবার বটবৃক্ষের দিকে তাকাও, দেখিবে উহারই ভিতরে কত অনন্ত বীজ পরিপুষ্ট হইতেছে। একটি ক্ষুদ্র বটবীজে কত অনন্ত বৃক্ষের অঙ্কুর রহিয়াছে, একবার দেখ; নদীর বাহিরে বড় হইলেও, কত ক্ষুদ্র; আর ক্ষুদ্রের ভিতরে কি অনন্তই প্রকাশিত হইতেছে! এক হইতে সংখ্যাতীত বহু উৎপন্ন হইতেছে। মানুষকে তাকাও; দেখিবে, সেখানেও কত সূক্ষ্ম কত স্থূলে পরিণত হইতেছে; এক হইতে কোটী হইতেছে;—একের ভিতরে কোটি কোটি ভাবী জীবের অঙ্কুর রহিয়াছে। শরীরের বলকে ভিন্ন ভিন্ন কর,—দেখিবে ভিতরের বল ভিন্ন শরীরে বল নাই,—মৃতের শরীর নির্ব্বল। শরীর সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু ভিতরে যে বল, তাহার পরিমাণ নাই;—সে অনন্তেরই তুল্য। পণ্ডিতেরা যাহাকে স্থূল শরীর বলেন, তাহারই ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনন্ত শরীর লুক্কায়িত। আবার নানারূপ বহু পরিত্যাগ করিয়া যখন এই প্রকাণ্ড

ব্রহ্মাণ্ডের দিকে ক্ষণকাল দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন এই স্থূল অবয়বের ভিতরে যে অনন্তরহস্য নিহিত—তাহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হই, বিস্ময়ে ডুবিয়া যাই। স্থূল যাহা, তাহাই তখন নগণ্য বলিয়া বোধ হয়;—সাধারণ যাহা, তাহাই অসাধারণ বলিয়া বোধ হয়;—উপেক্ষিত যাহা, তাহাই সার বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বত্রই অনন্ত যেন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। চক্ষুর সীমা অতিক্রম করিলেই—অনন্ত শক্তির লীলা স্পষ্ট অনুভব হইতে থাকে।

কি ছাই লিখিতেছি? বাহির ও ভিতরের কথা বলিতেছি কেন?—বর্ত্তমান যুগ প্রত্যক্ষ বা জড়বাদ বাহির ভিন্ন আর ভিতর মানিতে চায় না;—যাহা দেখা যায়, অনুভব করা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাহা ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় না। এই পরিদৃশ্যমান শরীরের ভিতরে জড় ভিন্ন আর যে কিছু শক্তি আছে, জড়বাদী তাহা মানেন না, জগতের ভিতরে আর কোন চিন্ময়-শক্তি আছে, তাঁহারা স্বীকার করেন না,—ইহকালের পরে আর কোন কাল আছে, তাহা মানিতে চাহেন না। বাহিরে যাহা দেখা যায়, ইহাই সর্ব্বস্ব—আর যেন কিছুই নাই। "আমিত্ব আর কিছুই নহে, কেবল এই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট শরীরমাত্র এবং মরণেই আমিত্বের শেষ। ধর্ম্ম, কল্পনা বই আর কিছুই নহে।"—এই কথাই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতেছে। অথবা ধর্ম্ম কেবল শরীরের সুখ। নাচ, গাও, খাও, এই জীবের মূল মন্ত্র। এই প্রকারে বাহির ধরিয়া লোকেরা কেবল বাহিরেরই পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বাহিরকে প্রত্যক্ষে পাইয়া কেবল সীমাবদ্ধ বাহিরেরই সন্ধান করিতেছে! বাহিরে আরম্ভ করিয়া কেবল বাহির লইয়াই মজিতেছে!

এই প্রত্যক্ষবাদ বা স্থূলবাদের প্রবল স্রোত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রত্যক্ষবাদের সংস্রব দোষে মানবসমাজের [illegible] ক্রমে বাহির-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মটা এক প্রকার লোকদেখান হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের আড়ম্বরে আদর, বাহিরেই ধর্ম্ম [illegible]। বাহির ভিন্ন আর যাহা কিছু আছে, তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি যায় না। বাহির-বিলাসের সাধন-ভজন, [illegible] ন্যায় হইতেছে। কি এক ভয়ানক দুর্দশার দিন উপস্থিত হইয়াছে!! প্রাচীন ঋষিগণের স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্মের সেই উজ্জ্বল তত্ত্ব, ক্রমে ক্রমে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। [illegible] নারিকেলের কঠিন আবরণ ভেদ না করিলে ভিতরের

জলময় দুর্গের কোমল, সুস্বাদু, সারবস্তু বীজ-কোষণ বা অমৃতের বিন্দু কি কখনও পাওয়া যায়? মানবশরীরের ভিতরে প্রবেশ না করিলে, দয়া বল, আর ভালবাসা বল, নীতিবল আর পুণ্য বল, সাহস বল আর অধ্যবসায় বল এ সকলের পরিচয় কি পাওয়া যায়? কিন্তু হায়, বাহিরের কোলাহলে মজিয়া মানুষ ভিতরকে একবারে ভুলিয়া যাইতেছে. নীতিবলের পরিবর্তে পাপবল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে,—দয়া বা প্রেমের বদলে দ্বেষ হিংসাবান নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—সারের পরিবর্তে অসারের পূজা জগতে দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অসার বলিতেছি?—হাঁ অসার বই কি! তোমার শরীর আর তোমার ইন্দ্রিয় কাহিদের? বীজ ভিন্ন ফল কাহিদের?—ফল বা সারভিন্ন তুষই বা কাহিদের? একবস্তু ভিন্ন রূপ ধরিবে—সকল দ্রব্যই অবিনশ্বর, সে পৃথক কথা। তোমার ও আমার শরীরের অবশিষ্ট শ্মশানের ভস্ম যদি কেহ দেখে, তবে সে কিছু তোমাকে ও আমাকে দেখিল না। সুপক্ব আম্রফলের পরিবর্তে, পরিপক্কতিতে যে মৃত্তিকা হইয়াছে, তাহা খাইলে কিছু আম খাওয়া হইল না। রূপান্তরের কথা ভিন্ন কথা। ভিতরের সার বস্তু বাদ দিলে,—জড় বা চেতন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না,—তুমি থাক না, আমি থাকি না। জীবনী-শক্তি বাদে, মানুষ, কৃমিকীটের আবাসভূমি বই আর কি? জড়ের ভিতরের শক্তিকে বাদ দিলে, জড়ই বা কি, বলিতে পার? কিন্তু এমনই হইয়া উঠিয়াছে,—বাহির-সর্বস্ব জড়ের আদরই সর্বত্র। মানুষের দৃষ্টি এমনই স্থূলদর্শী হইতেছে, ইন্দ্রিয়-লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুকেই সে মানিতে চাহে না। মানুষ, মানুষের ভিতরের পরিচয় চাহে না—বাহিরের পরিচয়ে অথবা বাহির দেখিয়াই সন্তুষ্ট। এই জন্যই দিন দিন ধর্ম্মসমাজ সকলে ভয়ানক সাম্প্রদায়িকতা,—ব্যক্তিত্ব বা জড়ত্ব প্রবেশ করিতেছে। যে ব্যক্তি, মানুষকে কেবল পৃথিবীর কোলাহলময় হাটে বাজারে, কেবল বাহিরে বাহিরে দেখিল, নির্জন হৃদয়-গৃহে একবারও দেখিল না, সে ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্বের কি পরিচয় পাইবে? চৈতন্যের বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রেমবাহিনীর নিগূঢ় তত্ত্ব যে জানে নাই, সে গৌরাঙ্গের বাহ্য রূপ দেখিয়া তাঁহাকে কি চিনিবে? বিনয়-ভূষিত খ্রীষ্টের সাম্যনীতির মূল কোথায়, যে জন তাহা না বুঝিয়াছে, সে ক্রুশে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত মহাযোগীর মহত্ত্ব কি জানিবে? ভিতর না দেখায় সকল মানুষ আর মানুষকে প্রকৃত অবস্থায় চিনিতে পারিতেছে না;—

মানুষের বুকের ভিতরে মিলনের যে গভীর স্থান আছে, তাহা ধরিতে পারিতেছে না,—প্রেমের যে অপরূপ খনি আছে, তাহা পাইতেছে না। ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ। বিন্দু বিন্দু জল মিলিয়াই মহাসমুদ্র। ব্যক্তি ছাড়িয়া সমাজে যাই, সেখানেও দেখি, এক সমাজ অন্য সমাজের কেবল বাহির দেখিতেছে, এক দল অন্য দলের শরীর ও ইন্দ্রিয়-প্রভৃতি কেবল দোষ দেখিয়া মরিতেছে। হিন্দুসমাজ, খ্রীষ্টসমাজের কেবল বাহির দেখিয়া নিন্দা করিতেছে; মুসলমানসমাজ, হিন্দুসমাজের কেবল বাহির দেখিয়া ঘৃণা করিতেছে। হিন্দুতে আর খ্রীষ্টানে, মুসলমানে আর বৌদ্ধে কত বিবাদ বিসম্বাদ, কত কাটাকাটি চলিতেছে। ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে কত রক্তপাত হইতেছে! অথচ খুব চিন্তা করিয়া দেখিলে, দেখা যায়, এই যে বিবাদ বিসম্বাদ সোনার পৃথিবীকে ছারখার করিতেছে, ইহার মূল কারণ অতি সামান্য। সে সকল যেন কিছুই নহে বলিয়া মনে হয়;—সে সকল অধিকাংশ স্থলেই নশ্বর শরীরের স্বার্থ লইয়া। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া যেমন শিশুরা মারামারি করে, প্রবীণ লোকেরাও সেই প্রকার সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া কাটাকাটি করিতেছে। সামান্য একটু জ্ঞানে অনৈক্য হইলেই, বা সামান্য একটু স্বার্থের হানি হইলেই কত ঘৃণার চক্ষে পরস্পরকে পরস্পরে দেখিতেছে। অথবা ভিতরে দৃষ্টি না থাকায়, ভিতরের আদর না থাকায়, মানুষ মানুষকে প্রকৃত রূপে না চিনিতে পারিয়া, কেবলই বিদ্বেষের আগুনে পুড়িতেছে। আজ কাল ধর্ম্মটা এক প্রকার কথা-কাটাকাটির উপায় হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়,—প্রমাণ পাই না, ঈশ্বরকে মানিব কি? অথচ সকলেই কোন রকমে একটা কিছু ধরিয়া আছেন। একজন পণ্ডিত বলেন,—"ঈশ্বরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কিছুই বুঝি না",—অথচ তিনিই নাকি একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারক নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন! কেহই কিছু বুঝি না, অথচ বাহিরে, বুদ্ধি খাটাইয়া একটা না একটা কিছু খাড়া করাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত! আজকাল মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত ধর্ম্মই সর্ব্বত্র দেখিতেছি। এইজন্য পার্থক্যও বড়ই দেখা যাইতেছে। বুঝি না কেহই,—অথচ সকলেই ধার্ম্মিক! ধার্ম্মিক সকলেই, অথচ পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা, মারামারি কাটাকাটি, অশান্তি অপ্রেম ঘুচিতেছে না! এ যে কি বিষম অবস্থা, চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। মানুষের মনই অহঙ্কার, ক্ষুদ্র হইয়াও, আপনার জ্ঞানে বা বুদ্ধিতে, তর্কে বা যুক্তিতে

সে ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করিবেই করিবে! বামন হইয়া মানুষ চাঁদ ধরিবে! কিন্তু হায়, মানুষ চাঁদ ধরিতে যাইয়া জোনাকী ধরিতেছে ;—প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া—মানুষ আজ এক সোণার চাঁদকে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্রিত করিয়াছে, একবার দেখ। মুসলমানের "আল্লা" আর বেদীর "ঈশ্বর" খ্রীষ্টানের "গড" আর বৈষ্ণবের "শ্রীকৃষ্ণ" আজ কত বিভিন্নরূপে জগতে পরিচিত! মূলে এক হইয়াও আজ ধর্ম্ম কত পৃথক পৃথক হইয়া পড়িতেছে। মানুষের কূটবুদ্ধি পরিচালনার ফল যে ইহা নহে, তুমি বলিতে পার? সূক্ষ্ম-ভাবে চিন্তা কর, প্রত্যক্ষবাদ বা বাহিরবাদ, প্রমাণবাদ, বা জড়বাদ জগতের কি মহা অনিষ্ট সাধিতেছে, বুঝিতে পারিবে। তর্ক যুক্তিতে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস জন্মে, তাহাকে আমরা বিশ্বাস বলি না, সে কল্পনার ক্রীড়া—মস্তিষ্কের খেলা। লোকের বুদ্ধি শক্তির তারতম্য অনুসারে, সে বিশ্বাস রূপান্তরিত হয়। জ্ঞানীর ঈশ্বর আর মূর্খের ঈশ্বর—পৃথক হইয়া পড়ে। তাহাই হইয়াছে, এই পৃথিবীতে। দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তাই কত কাটাকাটি চলিতেছে। বাস্তবিক মানুষ যতদিন ভিতরে চাহিয়া না দেখে, ততদিন সারবস্তু সে পায় না। মাটীর শরীরের ভিতরে চিন্ময়ী যে আত্মা বিরাজিত, যে কেবল মানুষের বাহির লইয়াই রহিল, সে তাহা কিরূপে বুঝিবে, কিরূপে জানিবে? আবার ঐ চিন্ময়ী আত্মার মূলে যে পরমাত্মার অরূপ-রূপ মাধুরী মিলিয়া রহিয়াছে, তাহাইবা সে কি বুঝিবে? এক স্থানে অসার ও সার মিলিত রহিয়াছে। অসারের ভিতরে সারের ঘনীভূত যোগ রহিয়াছে। জড় শরীরে চিন্ময়ী আত্মা, চিন্ময়ী আত্মার মূলে জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা। অরূপ জমিয়া সেখানে রূপ হইতেছে,—অসীম ঘুচিয়া সেখানে সীমা পাইতেছে। বহির আবরণের ভিতরে এক অপরূপ,—ভিন্নরূপ। দুই যেখানে এক হইয়াছে,—জড় আর চিৎশক্তি যেখানে মিলিয়াছে, সে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মিলনের স্থল, জড়বাদী বা প্রত্যক্ষবাদীর চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না। প্রত্যক্ষবাদী পরমাণু দেখিয়াই নীরব হয়, পরাজিত হয়, মাটীর শরীর দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু ভিতরবাদী বা বিশ্বাসবাদী, প্রেমবাদী বা সাম্যবাদী, এক চিন্ময়ীরূপ, এক মনোমোহন শক্তি-তরঙ্গ প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে অবিনশ্বর ভাবে বিরাজিত আছে, অনন্ত দেখিতে পান। তাঁহারা তাহা কি ব্যাখ্যা করিব? বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিলে, সকলেই দেখিতে পান, সেখানে

কি এক মহৎ ইচ্ছা শক্তির কার্য্য অবিরত চলিতেছে,—সেখানে কি এক মনোমোহন প্রেমখনির কারখানা খোলা রহিয়াছে। আমার ইচ্ছা নাই, অথচ শরীরে রক্ত চলিতেছে, ইচ্ছা নাই, অথচ পাকস্থলীতে, প্লীহাতে, যকৃতে, ফুস্ফুসে, এবং হৃদযন্ত্রে অবিরত কল চলিতেছে। আমার ইচ্ছা নাই, অথচ বাহিরের জ্ঞান মস্তিষ্কে স্থান পাইতেছে। ইচ্ছার উপরে এক মহৎ ইচ্ছার রাজত্ব বিস্তৃত হইতেছে, আত্মার মূলে কি এক অবিনাশী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যাইতেছে। সকলেই কি সেই মহতী শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন? আত্মদর্শী বা ভিতরদর্শী ব্যক্তিরা সকলেই বুঝিতে পারেন। অথবা যাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। ঘড়ির কাটা চলিতেছে, যে দৃষ্টি ফিরায়, সেই দেখে। মানুষ এমনই বধির যে, বুদ্ধিপ্রসূত নশ্বর জ্ঞানের কথা শুনিতেছে, কিন্তু সে অবিনশ্বর ধ্বনি শুনিতেছে না। সম্প্রদায় হইবে না কেন? মিলনের প্রকৃত স্থানে না মিলিয়া মানুষ কেবল বাহিরে মিলিতেছে। বাহিরের শব্দে কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, তাই মানুষ সে স্বর শুনিয়াও, শুনে না। ভিতরের শব্দ শুনিতে পারে—সকলেই। শুনিয়াও তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি, মায়ামোহের দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সকলেরই ভিতরে অবিরত সে শব্দ হইতেছে! অশব্দ অরূপ সেখানে রূপ ধরিয়া শব্দ করিতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষ তাহা মানুষকে কি বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। তিনি আপনি স্বয়ং স্ব-প্রকাশ,—আপনি আপনাকে সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন! মানুষের সাধ্য নাই, তাঁহাকে ব্যক্ত করে। ভিতরের দিকে চাহিয়া, গৃহে বসিয়া, মায়ের জীবন্ত মূর্ত্তি আপন চক্ষে না দেখিয়া, যে ব্যক্তি লোকের তর্ক যুক্তিপ্রসূত মাকে দেখিতে চায়, সে ভ্রান্ত। মাতার প্রকৃত স্বরূপ কখনই সে বুঝিতে পারিবে না। মানুষের বাক্য মন যাহাকে ধারণাও করিতে পারে না, তাঁহাকে মানুষ আর কি প্রকাশ করিবে?—পারে না, পারে নাই, পারিবে না। ইতিহাস পাঠ কর,—ধর্ম্মান্দোলনের মূল তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, দেখিবে বুঝিবে, মানুষ মানুষের নিকট ঈশ্বরতত্ত্ব অতি অল্পই জানিয়াছে;—যাহা জানিয়াছে, তাহা মানুষের কল্পনার ঈশ্বর,—মস্তিষ্কের দেবতা। তাহা সার বস্তু হইতে কত বিভিন্ন, কত পৃথক। অথচ মানুষের এমনি প্রকৃতি, মানুষ ভিতরে একবারও চাহিবে না, একবারও কাণ পাতিয়া সে শব্দ শুনিবে না! বিশ্বেশ্বরীর অপরূপ যেখানে চিত্রিত, চিন্ময়ীর মহামিলন যেখানে, সে দিকে

ভ্রমেও চাহিবে না! মানুষ মানুষের অসার কথা শুনিবে,—কুসংস্কারের পূজা করিবে,—অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ক্রিয়া কাণ্ড মানিবে, অথচ ভিতরে যে চিদ্ঘন আনন্দ বিরাজিত, সে দিকে চাহিবে না! তাই দেখ, আজ পৃথিবীতে কতই বিচ্ছেদ, কতই অমিলন, কতই বিবাদ বিসম্বাদ,—বিদ্বেষ, ঘৃণা। দার্শনিক পণ্ডিতের নাম লইতে চাও, এবং আপনি দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতে চাও, কিন্তু একবার বলত, সসীম তুমি, সে অনন্ত-গভীর তত্ত্বের কি প্রচার করিতে পার, সে তত্ত্বের কি অকাট্য প্রমাণ দিতে পার? তিনি স্বপ্রকাশ, ইহা ভিন্ন আর তাঁর কি প্রমাণ আছে? নিজে যে অজ্ঞান, সে অনন্ত জ্ঞানবস্তুকে কি প্রকাশ করিবে?—নিজে যে অসিদ্ধ, সে সিদ্ধ-পুরুষকে কি ব্যাখ্যা করিবে? জ্ঞানী নিউটনের জ্ঞান কি একজন সামান্য মূর্খ কৃষক প্রকৃত রূপে প্রচার করিতে পারে? কখনই নহে। সে একবিন্দু যাহা পারে, তাহার সহিত নিউটনের কত প্রভেদ! নিউটনকে সে নিজের বুদ্ধিতে ধারণা করিতেও পারে না। বালক নিজে বৃদ্ধের তত্ত্ব-কথা কি বলিবে? যে বলিতে চায়, লোকে তাহাকে জেঠার শিরোমণি বলে। যে দুই দশ খানা বই পড়িয়া দর্প সহকারে সামান্য বুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রমাণ দিতে চায়, সে আপনি প্রমাণহীন,—সে আপনি আপনার বুদ্ধির পাকে ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রকৃত ঈশ্বর-তত্ত্বের নিকট দিয়াও যায় না। সে গভীর তত্ত্বের যে প্রমাণ দিতে যায়, সে কিছুই জানে না। প্রমাণহীনের প্রমাণ অসিদ্ধ, জ্ঞান-হীনের জ্ঞান প্রচার বিধাতার ক্রীড়া, প্রেমহীনের প্রেমকাহিনী প্রচার কল্পনার খেলা। প্রকৃত প্রেমিক, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, প্রকৃত সিদ্ধ যোগী পুরুষ বলেন, “—তিনি স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে তাঁকে কিছুই জানিতে পারি না;”—বলেন, “শুনি বটে একজনের কথা, কিন্তু কি শুনি বলিতে পারি না, দেখি বটে এক জীবন্ত মহাপুরুষকে আত্মার মূলে বিরাজিত, কিন্তু কি যে দেখি, বলিতে পারি না;—অকূল সাগর দেখি বটে, কিন্তু ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করিতে পারি না!” বুদ্ধিমন, জ্ঞান বিদ্যা, সকল সেখানে পরাস্ত হয়। সামান্য সসীম সাগরের ব্যাখ্যা হয় না, সসীম মানুষের ব্যাখ্যা হয় না,—জড়ের ব্যাখ্যা হয় না, আর সেই অনাদি, অনন্ত, ভূমা, মহান, অপার, অগম্যের ব্যাখ্যা হইবে? ভুল কথা। যে ব্যাখ্যা করে, সে প্রতারক; যে সে ব্যাখ্যা শুনিয়া বিশ্বাস করে, অজ্ঞান,—নির্ব্বোধ। তবে কি ধর্ম্ম জগতে টিকিবে না? তবে কি ঈশ্বর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন না? একথাও যে মনে ভাবে,

সেই ধর্ম। ধর্ম অবিনাশী, অবিনশ্বর। সমস্ত জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে,—সাগর পর্বতে পরিণত হইতে পারে, এবং পর্বত সাগরের বেশ ধরিতে পারে,—রাজার রাজসিংহাসন টলিতে পারে; কিন্তু ধর্ম চিরস্থায়ী,—অবিনাশী, অবিনশ্বর। ঈশ্বর আপনি স্বপ্রকাশ, আপনিই শিক্ষক, আপনিই প্রচারক, আপনিই গুরু, আপনিই নেতা! তিনি আপনি আপনাকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার দুর্জ্জয়বাণী সমস্ত আত্মার ভিতরে নিনাদিত হইতেছে। সে বাণী শুনিয়া রাজা কম্পিত হইতেছেন, কৃষকের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিতেছে! আমি তুমি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই স্বরূপে নিমগ্ন রহিয়াছি। যখনই ভিতরে যাইতেছি, কি এক মহাবাণী শুনিতেছি! অনেক সময়ে বাহিরে থাকিতেছি বটে, কিন্তু যখনই ভিতরে যাই, কি এক দুর্জ্জয় মহাশক্তির তরঙ্গ দেখিতে পাই। আবার প্রমাণ কি?—ইহাই জলন্ত প্রমাণ। মিথ্যা কথা নয়, কল্পনার কথা নয়, জল্পনার কথা নয়, কিন্তু নিত্য সত্য, জাগ্রত সত্য। তাঁহাকে ভিতরে যেভাবে যে দেখিতে পায়, সেই ভাবেই সে পূজা করুক, বিশ্বাস করুক, পৃথিবীর কিছুই অনিষ্ট হইবে না। যে তাঁহাকে যেরূপে, যে স্বরূপে দেখিতেছে, সরল প্রাণে, অকপট ভাবে সে সেই স্বরূপের পূজা করুক, কখনও সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে না। যে সাগরের কূলে তুমি, সেই সাগরের কূলেই আমি;—অমিলনেও গভীর যোগ, গভীর মিলন! জ্ঞানী যদি বিশ্বাসী হয়, তবে প্রেমিকবিশ্বাসীর সহিত তাঁহার অমিল থাকে না; আর কর্ম্মী যদি বিশ্বাসী হয়, তবে ভক্তের সহিত অমিল থাকে না।—এক মাত্র ধর্ম্মবিশ্বাসে বহুর মিলন সংসাধিত হয়। যে জন তাঁহার দুর্জ্জয় বাণী শুনে নাই, সে যেন কখনও ভণ্ড হইয়া ধর্ম্মের নাম মুখে আনে না। যে ব্যক্তি সে স্বর শুনে নাই, সে যদি অবিশ্বাসী থাকিয়া থাকে, তাঁহাকে নিন্দা করিও না। ঈশ্বরকে না বুঝিয়া, না জানিয়া, জানিয়াছি, বুঝিয়াছি বলার অপেক্ষা আর মহা পাপ নাই। যে ব্যক্তি আপন হৃদয়কে সেই অরূপ রূপের আলোকে আলোকিত দেখে নাই, সে যেন লোকের মুখে প্রবাদের কথা শুনিয়া ঈশ্বরের কথা বলে না। সর্প লইয়া খেলা? আগুন লইয়া ক্রীড়া? না ধরিয়া, না বুঝিয়া, ধরিয়াছি, পাইয়াছি বলার তায় মহাপাপ আর নাই। ধর্ম্মের প্রথম উপদেশ এই, মানুষ বাহির পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করুক—নীরবে গভীর ধ্যানে, নির্জ্জন আত্মঅরণ্যে প্রবেশ করুক। সেখানে স্বরূপের সহিত সাক্ষাৎ হইবে—জগতের

শব্দ শ্রুত হইবে, অস্পর্শকে স্পর্শ করা যাইবে ;—সকল অসম্ভব সম্ভব হইবে। শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া, সাক্ষাৎ করিয়া, তবে ধর্ম্ম ধন লাভ হইবে। নচেৎ কি অমূল্য ধর্ম্ম-ধন পাওয়া যায় ? এ ত কল্পনার কথা নয় ;—নিত্যসত্য, অনন্ত সত্যের কথা। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যক্ষবাদীর দল এরূপই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, বুঝি বা ধর্ম্ম আর জগতে টিঁকে না। আমরা বলি, ভয় কি ? মানুষের চেষ্টা বড়, না ঈশ্বর বড় ?—মানুষের সাধ্য কি যে, সে স্বপ্রকাশকে কুসংস্কার বা কুজ্ঞানে চিরকাল ঢাকিয়া রাখিবে ? আমার তোমার ভিতরে যাঁহার করুণাস্রোত অবিরত প্রবাহিত, তিনি কি জগৎকে ভুলিয়া রহিয়াছেন ?—থাকিতে কি পারেন ? তাঁহার পক্ষে এ সকল অসম্ভব। ভয় নাই—আপনাকে তিনি আপনিই চিরকাল প্রচার করিয়াছেন, চিরকাল করিবেন। কে এমন শক্তিশালী পাপী, অবিশ্বাসী আছে, যে ভগবানের রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে ? সর্ব্বদর্শীর নিকট সকলই প্রকাশিত। তিনি আমাকে ধরিবেন, তোমাকে ধরিবেন,—জগৎকে ধরিবেন। বাহির লইয়া অন্ধ হইয়া আছি যতক্ষণ, ততক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না বটে,—শরীরের বিলাস সুখ, ভোগ বিলাস, মায়া মোহ, অবিদ্যা অজ্ঞানে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ বুঝিতেছি না বটে ; কিন্তু যখনই ভিতরে দৃষ্টি ফিরিবে, অমনি ধরা পড়িব। চিন্তাহীন, বিশ্বাসহীন, তর্কযুক্তির দাস হইয়া চির দিন কখনই থাকিতে পারিব না। আজ আমার সামান্য জ্ঞানে তোমাকে বাঁধিতে চাহিতেছি বটে, কিন্তু যখন অনন্ত জ্ঞান সাগরে ডুবিব, তখন আর এ ভাব থাকিবে না ; যখন বাঁধা পড়িব, তখন আর বাহির হইব না। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে ? সে দিন কবে আসিবে, যে দিন বিদেশ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া গৃহে যাইয়া মায়ের মুখ দেখিব ! সে দিন কবে আসিবে, যে দিন ক্ষুদ্র বুদ্ধি-প্রসূত অহঙ্কারের পূজা পরিত্যাগ করিয়া, ভিতরে যাইয়া, আনন্দময়ীর অনন্তক্রোড়ে শুইয়া ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হইয়া যাইব ! সে দিন কবে আসিবে যে দিন বাহিরের অন্তরালে সেই চিৎ শক্তির অস্তিত্ব অনন্ত রূপে দেখিতে পাইব ! প্রমাণ লইয়া, তর্ক যুক্তি লইয়া কাটাকাটি করিলে আর কি হইবে ! সময় যথেষ্ট গিয়াছে,—এস, একবার সকলে হৃদয়-অরণ্যে প্রবেশ করি। রূপাতীতকে প্রত্যক্ষ না দেখিলে কখনই আমরা সম্প্রদায় বা দল ভুলিতে পারিব না। যে প্রেম-খনিতে আমরা মিলিত হইব, অগ্রে তাঁহাকে প্রাণে দেখি। তিনি ত প্রাণের প্রাণ। বাহিরের

ভিতরেই প্রাণ, প্রাণের মূলেই তিনি। জড়ের ভিতরে তিনি, জীবের ভিতরেও তিনি। তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির কার্য্য সতত সর্ব্বত্র হইতেছে। তাঁহারই ইচ্ছা শক্তির বিকাশ, জড়ে এবং জীবে। তাঁহারই ইচ্ছার সৃষ্টি, জড় বা জীব। মজিব কেন?—ভুলিব কেন?—অবিশ্বাসী হইব কেন? তোমার কল্পনার কথা শুনিব কেন? যাহা না দেখিয়াও দেখা যায়, না বুঝিয়াও বুঝা যায়, তোমার কল্পনার প্রমাণে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিব? বায়ুকে যেমন না দেখিয়াও স্পর্শ করা যায়, তাঁহাকেও সেইরূপ স্পর্শ করা যায়। বিদ্যুৎ কি পদার্থ, না জানিয়াও যেমন তাহার কার্য্য দেখা যায়, সেইরূপ তাঁহাকে সৃষ্টির মূলে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অব্যক্ত হইলেন, তাহাতে কি? বায়ু নিত্য সত্য, বিদ্যুৎ নিত্য সত্য; ব্যাখ্যা হয় না বলিয়া কি ইহাদিগকে অস্বীকার করিতে পার? শরীরের ভিতরে আর কিছুর অস্তিত্ব না থাকিলে, তুমি ও আমি শ্মশানের ভস্ম। সে কিছু যে কি, তাহা জানি না, ব্যাখ্যা করিতে পারি না বলিয়া কি সত্যকে অস্বীকার করিব? জীবন্ত খেলা, জীবন্ত লীলা দেখিয়াও মানুষ কেমনে অবিশ্বাসী থাকিবে? গৃহে প্রবেশ করিলেই আত্মার মূলে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়। তাঁহাকে যে দেখিয়াছে, তাঁহাকে যে বুঝিয়াছে, সে বিবাদও জানে না, বিসম্বাদও জানে না, ঘৃণাও জানে না, বিদ্বেষও জানে না। সাক্ষাৎ লাভ হইলে—ভিতর ও বাহির এক হইয়া যায়। ভিতরই বাহির, বাহিরই ত তার নিকট ভিতর হয়। সে যখন ভিতরে যায়, এক জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ তখন দেখে। দেখে আর তাহাতে নিমগ্ন হয়, নিমগ্ন হয় আর তাঁহাকে দেখে। তাঁহার নিকট রাজা প্রজা, পাপী পুণ্যাত্মা, জ্ঞানী মূর্খ, বিষ্ঠা চন্দন, সকল একাকার হইয়া যায়। একই রূপ, একই ভাব, একই চিন্তা। একই ধ্যান, একই জ্ঞান। একই ধর্ম্ম, একই মন্ত্র, সকলের ভিতরে সে দেখে। ভাল মন্দ সকলের ভিতরেই এক জনকে সে দেখে। পৃথিবীর বাজারে মত লইয়া সে ঝগড়া বিবাদ করে না, আপনার সত্যে আপনি অটল হইয়া বসিয়া থাকে। সে মনে করে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইলে কুসংস্কার বা কুজ্ঞান, মানুষের মধ্যে থাকিবে না, তবে কেন ভেদাভেদ মানিব? একই শক্তির রূপান্তর,—সাগর পর্ব্বত, নরনারী, জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ, সকল। ছোট বড়, এ ভেদাভেদ আর তখন তাঁহার থাকে না। মাটী সোণা, এক হয়। সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ এক হয়;—সে অভেদাত্মক

মহাযোগী বুদ্ধ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া মুক্তি লাভ করেন ;—জীবিতাবস্থাতেই নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনিই চৈতন্য, তিনিই বুদ্ধ, বা তিনিই খ্রীষ্ট নামে পৃথিবীতে অবতার বলিয়া পূজিত বা সম্মানিত হন। মানুষ যদি সে মনুষ্যত্বকে পায়, তবেই জগতের নরনারীর ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, সকলের সহিত একাত্মক হইতে পারে, আসক্তিহীন হইয়াও প্রেমে মজিতে পারে—সকলকে কোলে তুলিয়া হৃদয়ে পুরিয়া পূজা করিতে পারে। প্রেম-খনি যাহার নিকট আবিষ্কৃত হয় নাই, সে মরণের কোলে, শুষ্কতার শ্মশানে, তর্ক যুক্তির স্তূপে নিমগ্ন রহিয়াছে। যে, তাঁহাকে স্পর্শ করে, যে তাঁহাকে দেখে, সেই মিলনের মহামন্ত্র পায় ;—সেই জ্ঞান প্রেম, নীতি পুণ্য—প্রকৃত ধর্ম্ম-ধন পায়। ঈশ্বর এই করুন, আমরা তাঁহাকে জীবনের মূলে জীবন্ত ভাবে দেখিয়া প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত হইতে পারি। ঈশ্বর এই করুন, সম্প্রদায়গত তর্কযুক্তি-প্রধান মতের ঝগড়া-বিবাদ পৃথিবীর বক্ষকে পরিত্যাগ করুক ;—সকলে পরস্পরের ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিতে পারি ;—সকলের ভিতরের লুক্কায়িত অনন্ত সুধা সার বস্তু দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। কেবল খোসা, কেবল অসার, কেবল বাহির, কেবল কূট মত,—কেবল ঝগড়া লইয়া কি হইবে ?—এই করুন, স্থূল শরীরের ভিতরের অনন্তভাব, অনন্ত সলিলে ডুবিতে পারি। এই করুন, সকলে অনন্তে ডুবিয়া একাত্মক হইয়া শান্তির রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হই এবং ইন্দ্রিয়ের ভিতরে মহা ইন্দ্রিয় জয় দেখি,—জড়ের ভিতরে চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া তাহাতে নিমগ্ন হই।

স্বাধীনতা ও অধীনতা।

"I know no wisdom but that which reveals man to himself, and which teaches him to regard all social institutions, and his whole life, as the means of unfolding and exalting the spirit within him."—*W. E. Channing, D.D.*

বড় শুভক্ষণে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভারতের অতীত সভ্যতার নির্ব্বাপিত স্মৃতিচিহ্ন আমাদের পশ্চাতে, বর্ত্তমান সভ্যতার চমৎকারের উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সম্মুখে। এক, পশ্চাৎ হইতে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া দিতেছে,—অন্য, সম্মুখ হইতে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা অতীতের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া, সম্মুখের টানে

আকৃষ্ট হইয়া, কেবলই অবিরত চলিতেছি। স্মৃতিতে জাগিতেছি, সম্মুখের চিত্র ধরিয়া চলিতেছি। এই যে আমরা, জানিয়া অবিরত অনন্ত উন্নতির দিকে ছুটিয়াছি, আমরা অধীন না স্বাধীন? এই বিষয় সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও অনেক কথা বলিয়াছেন; আমরা উভয়ের সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই কূটপ্রশ্ন সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

স্বাধীনতা শব্দটা, এত বাহুল্যরূপে, এত সাধারণ ভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, উহার মূল কি, মূল কোথায়, উহা নির্দ্ধারণ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক মানুষ স্বাধীন কি না?—স্বাধীনতা বাহিরের কোন পদার্থ, না ভিতরের জিনিস?—এ তত্ত্বের গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, অনেকেই "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" বলিয়া অধীর হই-তেছেন, এবং অধীনতাকে স্বাধীনতা, স্বাধীনতাকে অধীনতা বলিয়া মহা-গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিতেছেন। গভীর চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ আজ পর্য্যন্ত যে তত্ত্বের সম্যক্ মীমাংসা করিতে পারেন নাই, বাহুল্যরূপে সেই তত্ত্ব লইয়া চিন্তাশূন্য আন্দোলন করা কি বিধেয়?

উন্নতির এই চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াও "মানুষ কি",—এ তত্ত্বের পরি-ষ্কার মীমাংসা হইল না। আমি কি, তুমি কি?—বল ত ভাই, তুমি কি?—তুমি যতই চিন্তাশীল হও না কেন, এ অতলস্পর্শ গভীর মানুষ-সাগরকে মন্থন করিবে, তোমার সে সাধ্য নাই। এ সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিতে পার, তাহা নিশ্চয়ই অকিঞ্চিৎকর। মানুষের আদি কোথায়?—মানুষের শেষ কোথায়?—কে জানে, কে বলিতে পারে? সৃষ্টি প্রকরণের আদিতে কি, শেষে বা কি, কে স্থির রূপে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে? আমার মত আমি যদি কিছু জানিয়া থাকি, তবে তাহা এই যে, আমি আছি। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোন্ অনন্তে যাইব, জানি না। জোর করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া যাহা নির্ণয় করি, সে সকলই কল্পনার ছায়ায় চিত্রিত বলিয়া বোধ হয়। আমি আছি—আমি উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি,—ইহা বই আত্মতত্ত্ব আর কিছুই জানি না। কেন আছি, কেন চলিয়াছি, জানি না। আমি কে, তাহাও জানি না। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া কত সময়ে কাঁদিয়াছি—আমি কি? আমার গুরু যিনি, তাঁহাকে আঁধারে

পাইয়া ব্যাকুল প্রাণে কত বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, বল দেব,—আমি কি? কিন্তু আজ পর্যান্ত কেহই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিল না। শরীর প্রভৃতি যে আমি নই, তাহা বুঝিয়াছি, কারণ শরীর যখন মাটিতে মিশাইয়া যায়, তখন শরীর হইতে আমি পৃথক হই। যদি পৃথক না হইব, তবে শবেও আমাতে এত প্রভেদ কেন? জীবিত ও মৃত, একই রূপ হইল না কেন? শরীর হইতে আমি পৃথক, তাহা জানিয়াছি; কিন্তু বুঝিতে পারি না, আমি কে, আমি শরীরের কোন্ স্থানে আছি। আমি কে, তাহাই যদি না জানিলাম তবে আমার স্বাধীনতা কোথায়, কেমনে জানিব? পাঠক বলিতে পার, আমি কি?

পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষ অনন্তের বিন্দু। অনন্তের মধ্যে মানুষের আরম্ভ, অনন্তের মধ্যে মানুষের শেষ। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম,—অনন্ত শক্তির বিন্দু—ক্ষুদ্র মানুষ। মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেও, এ সংজ্ঞা অপেক্ষা তোমার আর উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা পাইবে না। আত্মা বল, মন বল, বা যাহা বল, সে সকলই শক্তির বিন্দু মাত্র। আত্মাকে শক্তি ভিন্ন আর কিছুই ভাবিবার বা বুঝিবার সাধ্য নাই। শরীর কিছুই নহে—কেবল জড়ের খেলা। জড় কিছুই নহে, কেবল শক্তির ক্রীড়া। জড় কিছুই নহে—কেবল মায়ার লীলা। জড় ও আত্মা, উভয়ই শক্তি। শক্তি অনন্ত। এই দুই অনন্ত শক্তির বিন্দু মিলনই মানুষ। কেবল জড়-শরীর মানুষ নহে, কেবল আত্মাও মানুষ নহে। এই যে শরীর, আত্মাযুক্ত হইলে আর ঐক্য টিকে না। জড়শরীরের সহিত জগতের যোগ, আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ। মানুষ জড়ের ভিতর দিয়াও শক্তি পাইতেছে, আত্মার ভিতর দিয়াও পাইতেছে। জড় শরীরের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, ভোগ-বিলাস—এ কিছুই চিরস্থায়ী নয়। শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জড় রূপ ধরিয়াছে। সুখ, সুখ নয়; এই দুঃখও দুঃখ নয়। একের দুঃখ অপরের নিকট সুখ; একের বিপদ, অপরের সম্পদ। তুমি গোলাপ ফুলের যে বর্ণ দেখিয়া মোহিত হইতেছ, যে ঘ্রাণ-সুখে উন্মত্ত হইতেছ,—ইন্দ্রিয়ের একটু তারতম্যে, ঐ বর্ণ, আর ঐ ঘ্রাণ-সুখ, অপরের হৃদয়ে দুঃখের ঘোরতর কালিমা ঢালিতেছে। এই জন্য কেবল ইন্দ্রিয়ের দিকে পৃথিবীকে কখনই একরূপ হইল না। একজন যাহাকে ভাল বলিতেছে, অপরে তাহাকেই মন্দ বলিতেছে। জিনিস এক—অথচ লোক ভাবে, পৃথক পৃথক। শক্তি এক,—রূপ পৃথক—আর

পৃথক। একতায় যেন স্বাতন্ত্র্য মিশিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান নির্ণয় করিয়াছেন—মানব-শরীরের অস্থি মাংস স্নায়ু ও শিরার সংখ্যা সর্ব্বত্রই সমান; অথচ মানুষের রূপ দেখিতে কত বিভিন্ন প্রকারের—এক অখণ্ড উপকরণে প্রস্তুত হইয়াও, মানুষ কত পৃথক পৃথক। মানুষের ইন্দ্রিয়-পরীক্ষার সিদ্ধান্তও এমনি করিয়া পৃথক পৃথক বোধ হইতেছে। তুমি একজনের মধ্যে যে গুণ দেখিয়া তাহাকে স্বর্গের উপযোগী ভাবিতেছ, আমি তাহার সেই গুণের পরিবর্ত্তে আর একটা দোষের অঙ্কুর দেখিয়া তাহাকে নরকে ফেলিতেছি। একজন সুধা হইতে গরল বাহির করিয়া পান করিয়া মরিতেছে, আর এক জন গরলকে সুধা করিয়া ধরিয়া স্বর্গে উঠিতেছে। একই পদার্থ, একই জিনিস হইতে ভিন্ন ভিন্ন ফল বাহির হইতেছে। এতই স্বাতন্ত্র্য, এই জগতের শিরায় শিরায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ একতার ভিতরে থাকিয়াই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন, প্রয়োজন মারক কোন জিনিস পৃথিবীর বাজারে নাই। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর কোন দ্রব্যই মানবের অপকারী নহে। বাস্তবিকও তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। সকলই মানুষের উপকারী—সকলই মঙ্গল। বাহিরের সকলই মঙ্গলজনক, মানুষের ভিতরেই যত কিছু গলদ। ভিতরের ভাব তারতম্যে—একজনের পাপ, অপরের পুণ্য, একের পুণ্য অপরের নিকট পাপ বলিয়া বোধ হইতেছে। মানুষের ভিতরে যেমন চশমা লাগান রহিয়াছে, মানুষ তেমনই দেখিতেছে। ভিতরের তারতম্যানুসারে—এক বস্তু, এক জীবনের উন্নতির সহায় হইতেছে, আর একের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। পাপবীজ মানুষের ভিতরে—বাহিরে নহে। ইচ্ছাতেই পাপ—নচেৎ পাপ নামে অন্য কোন পদার্থ এই পৃথিবীতে নাই। বাহিরে যাহা কিছু রহিয়াছে, সকলই মঙ্গল সাধনের জন্য। মঙ্গলময়ের রাজ্যে, অমঙ্গল সাধনের জন্য কোন দ্রব্যই সৃষ্ট হয় নাই। সকল সৃষ্ট বস্তু, অবিরত, কেবল মঙ্গলই সাধন করিতেছে। মানুষই, মঙ্গলকে সময়ে সময়ে অমঙ্গল করিয়া তুলিতেছে। কেহ, আমার মঙ্গল করিতেছে; কেহ তোমার মঙ্গল করিতেছে। শিক্ষা, অবস্থা, ও দেশ কালানুসারে, কেহ আমারই মঙ্গল করে, আর কেহ তোমারই মঙ্গল করে। আমরা অবিরত মঙ্গলের মধ্যে বাস করিতেছি।

প্রকৃতি, সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া, স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ মানুষকে কেবলই দিতেছে।

আমরা অবিরত পাইতেছি। দিবার বস্তুই জগতের সৃষ্টি, নিবার বস্তুই যেন আমার সৃষ্টি। প্রকৃতি দিতেছে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে প্রকৃতির অধীনতায় কাতর হইয়া আমি আপন প্রকৃতি অনুসারে, আপন পথে চলিতেছি। অথবা প্রকৃতি যখনই আমার স্বাতন্ত্র্যকে ডুবাইতে চাহিতেছে, তখনই আমার পথে আমি চলিতেছি। মানুষের তবে দুইটী অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির দান, অবনত মস্তকে, মানুষ, কখনও গ্রহণ করিতেছে, আবার কখনও উন্নত মস্তকে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য-নিয়ন্ত্রণকারী উপহারকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে। মানুষ একবার প্রকৃতির অধীন, আর একবার স্বাধীন। প্রকৃতির দান গ্রহণে, মানুষের বশ্যতা বা অধীনতা;—প্রকৃতিকে বিকৃতিতে পরিণত করা বা মানুষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাতে মানুষের স্বাধীনতা। খুব নিগূঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাই বোধ হইবে—মানুষ অধীন, আবার মানুষ স্বাধীন। মানুষ প্রকৃতির দান চায়, মানুষ আপন পথও চায়। মানুষ—একতাও চায়, স্বাতন্ত্র্যও চায়। সৃষ্টিসিন্ধুতে ডুবিয়া মিশিয়া, তবে মানুষ স্বাতন্ত্র্য পাইতেছে। অধীনতা না থাকিলে অঙ্গের স্বাতন্ত্র্য থাকে না, স্বাধীনতা না থাকিলে আপন ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অধীনতা—একতার মূল; স্বাধীনতা—স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্বের মূল। অধীনতা—প্রেম; স্বাধীনতা—জ্ঞান। প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বিদূরিত হইলেই উন্নতির স্রোত বন্ধ হয়। মানুষ, তাহা সহিতে পারে না। আবার একতা না থাকিলেও স্বাতন্ত্র্যে সৌন্দর্য্য থাকে না; মানুষ, সে অবস্থায় প্রকৃতির নিকট কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারে না। প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যেরও পূজা করিব, আপন স্বাতন্ত্র্যকেও রাখিব। প্রকৃতির অধীনতাও স্বীকার করিব, আপন স্বাধীন ভাবকেও রাখিব। প্রেমের সেবাও করিব, জ্ঞানের আদরও করিব। জ্ঞান ভুলিয়া, স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া, প্রেমের বা একতার সেবা, কুসংস্কারের সেবা,—জগতে অজ্ঞাত মহাপুরুষের পূজা—নরকভোগ। আবার প্রেম ভুলিয়া, একতা ভুলিয়া—সৃষ্ট জগৎকে ভুলিয়া, জ্ঞানের পথে চলিলে—অহঙ্কার স্বেচ্ছাচার—নরক ভোগ। উভয়ের পরিণাম একই প্রকার। অধীনতা স্বীকার করিলেই যে অকল্যাণ আসিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করে, এ কথার মূলে গভীর চিন্তা নাই। আবার স্বাধীন হইলেই যে সকল সময়ে স্বর্গ-সুখ পাওয়া যায়, তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে। অধীনতা-বিহীন স্বাধীনতা—স্বেচ্ছাচার; আবার স্বাধীনতা-বিহীন একতা—নরক। ঈশ্বরের

দান, সকলই সমান। আমি আপন ব্যক্তিত্ব রাখিতে যাইয়া অন্যকে ভুলিব না; আবার অন্যের সম্মান করিতে যাইয়াও আপনাকে বিস্মৃত হইব না। অদৃশ্য রাজ্য হইতে, গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, যখন মায়ের কোলে, শক্তির বিন্দু—আমি, অবতীর্ণ হইলাম, তখন আমি অধীন হইয়া আসিলাম। জগদীশ্বর আমাকে স্বাধীন করিয়া শূন্যে কেন ছাড়িয়া দিলেন না, তাহা জানি না। জন্ম গ্রহণ করিয়া যে প্রকৃতির ভাণ্ডারপূর্ণ বাজারে আসিলাম, সেও ঘোরতর অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য। দেখিলাম, সেখানে কেবলই বিনিময় চলিতেছে। সেখানে অম্লান চিত্তে একে, অন্যের দান গ্রহণ করিতেছে। মাতার ক্রোড়ে শিশু মানব হাসিল, কাঁদিল, নাচিল, গাইল, উঠিল, বসিল—সকলই অন্যের ইঙ্গিতে। তুমি বল, শিশু স্বাধীন;—আমি বলি, শিশু অধীন এবং স্বাধীন—এ দুই ই। মা, কেন শিশুর নিকট আসিলেন, কেন শিশুকে কোলে তুলিলেন? শিশুই বা মায়ের উপর নির্ভর না করিয়া, কেন আপনার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিল না? তুমি একদেশদর্শী স্বাধীনতার পক্ষপাতী জীব, বলিতে পার? শিশুর মাথায় বিচার-শক্তি নাই, পায়ে বল নাই,—সে তোমার মত ভাবিয়া চিন্তিয়া, তোমার ন্যায় জীবন পথে চলিতে পারিল না। সে অবোধ, কেবলই মায়ের কোলে পড়িয়া রহিল; আর মায়ের ইঙ্গিত মত কার্য্য করিল। কেন বল ত এ বিড়ম্বনা? শিশু বিষ ধরিয়া মুখে দেয়, মাতার নিষেধে ক্ষান্ত হয়; বিপদের পথে হাটে, জ্ঞানী, উন্নত, শিক্ষিত জননী তাহাকে রক্ষা করেন। আমি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না—মায়ের ঋণ এজন্মে পরিশোধ করিতে পারি নাই। আমার জননী এবং ব্যবস্থাপূর্ণ পৃথিবীর প্রত্যেকের অধীন হইয়াই আমি এত বড় হইয়াছি। মায়ের নিকট পাইয়াছি, আত্মীয় পরিজনের নিকট পাইয়াছি, সমাজের নিকট পাইয়াছি, তবেত এতু বড় হইয়াছি। সকলেই যেন আমার মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর বাজারকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। তোমার স্বাস্থ্য দারিদ্র্য, আমারই উন্নতির জন্য; আমার স্বাতন্ত্র্য তোমারই জন্য; নচেৎ সংসারে এত বৈচিত্র্য থাকিত না। দুই বস্তুর প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ উপকারের কথা, কোন মানুষই অস্বীকার করিতে পারিল না বলিয়া, আজও মানুষ সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই। অধীনতার কত কষ্ট; তবু মানুষ, মানুষের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। আমি যাহা বুঝি না, তুমি তাহা বুঝ; আমাতে যাহা পাই না, তাহা তোমাতে

পাইয়া উপকৃত হই। এই প্রকারে, পৃথিবীর জল বায়ু, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, লতাবৃক্ষ, চন্দ্র সূর্য্য, নরনারী, পণ্ডিত মূর্খ, শিশু বৃদ্ধ—সমস্ত সৃষ্ট বস্তু, জোট বাঁধিয়া অকৃত্রিম বন্ধুর বেশে মানুষের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া, কেবলই উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে; মানুষ দাসানুদাস হইয়া, সকলের দায়, সকলের সাহায্য ধরিয়া চলিতেছে। যখনই কষ্ট হইতেছে, সকলের বিশেষ বিশেষ উপদেশ, পরামর্শ, উপকারকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে মানুষ যাইতেছে,—অন্যের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বকে অবহেলা করিতেছে, তখন পাপ-গরল উৎপন্ন হইয়া তাহাকে ঘোর অন্ধকারে ডুবাইতেছে। সবাইকে তুচ্ছ করিয়া কোন্ মানুষ বড় হইয়াছে? প্রকৃতির সাহায্য না গ্রহণ করিয়া, কে উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে? মানুষের সে সাধ্য নাই, কারণ সৃষ্টির সে বিধান নহে। আমি আছি বলিয়াই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র—নরনারী সকলেই আমার নিকটে রহিয়াছে। নচেৎ আমি এসকলের অস্তিত্বকে কল্পনা বলিয়া মনে করিতাম। আমার উপকারের জন্যই, তাই তারা—আমার চতুর্দ্দিকে, তোমরা। তোমাদিগকে ধরিয়াই ক্রমে ক্রমে অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। নচেৎ অনন্ত, আমার নিকট কেবল স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইত। তোমরা ধন্য, সৃষ্ট সকল বস্তুই ধন্য। আমি তোমাদের গোলাম, দাসানুদাস—ভৃত্য। কত উপকার পাইয়াছি, আরো কত উপকার পাইতেছি;—কেমনে তাহা বিস্মৃত হইব? —কেমনে অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহা ঠেলিয়া ফেলিব! স্বর্গের কেশব, স্বর্গের শ্রীগৌরাঙ্গ, স্বর্গের যিশুখ্রীষ্ট—আমার চতুর্দ্দিকে—আমি পদানত ভৃত্য, দাসানুদাস। মানুষ সৃষ্টি-সিন্ধুর কণা—সকলের দাসানুদাস। অহঙ্কারী মানুষ, অধীনতাকে গরল দেখিয়াছ, সুধা দেখিতেছ না? মানুষ মানুষকে কেমন অধীন করিয়া, আপনার বস্তু নিতেছে, একবার দেখ। অধীনতাই যে স্বাতন্ত্র্যের পথ পরিষ্কার করিতেছে,—তাহা একবার দেখ। অধীনতা না থাকিলে, আমি আমাকে জানিতে পারিতাম না, তুমিও তুমিত্ব পাইতে না। অধীনতাই স্বর্গের প্রশস্ত পথ। সকলেই সকলের অধীন। আমার প্রাণ চলিতেছে—সকলে ঘুরিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে, পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিয়া সুখী হইতেছে। স্ত্রী, স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিতেছেন; স্বামী, অন্তরালেতে স্ত্রীর অধীনতা স্বীকার করিতেছেন। রাজা প্রজার অধীন, প্রজা রাজার অধীন। প্রজাশক্তির অভাবে রাজশক্তির

অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকে না। স্বামীর অভাবে স্ত্রীত্ব থাকে না, স্ত্রীর অভাবে স্বামীত্ব নাই। আমার অভাবে তুমিত্ব নাই, তোমার অভাবে আমিত্ব কেবলই কল্পনা। চতুর্দ্দিকে, কেবলই অধীনতার লীলাখেলা দেখিতেছি। পরস্পরের মঙ্গল সাধনই, পরস্পরের লক্ষ্য। তুমি বল, সন্তানের উপকারের জন্য মাতার কোন চেষ্টা করা উচিত নহে, অথবা সন্তানের মতের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত নহে। আমি বলি, বাধ্যবাধকতা না থাকিলে, আদান প্রদান না চলিলে, উন্নতি লাভ করা যায় না,—মাতার উপদেশ ভিন্ন, অবোধ সন্তান মানুষই হইতে পারে না। অজ্ঞ, বিজ্ঞের কথা শুনিবেই শুনিবে; মূর্খ, জ্ঞানীর কথা শুনিবেই শুনিবে; বোকা, বুদ্ধিমানের কথা মত চলিবেই চলিবে। যাহার যাহা নাই, সে অন্যের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবেই করিবে। মানুষ, আপনার ধন অপরকে না দিয়া, এবং অপরের ভালটুকু আপনি গ্রহণ না করিয়া, কখনই সুখী হইতে পারিবে না। এমনই অধীনতার স্রোত চলিয়াছে। রাজার অধীন সমাজ; সমাজের অধীন নরনারী। আবার নরনারীর অধীন সমাজ—সমাজের অধীন রাজা। ব্রত বল, অনুষ্ঠান বল, ঘটনা বল, আর কার্য্য বল, মানুষ সকলেরই অধীন। অধীনতার বিশ্বব্যাপী রূপ, তবে মানুষ একবার ভাল করিয়া দেখ।

এই যে পরম উপকারী অধীনতা, ইহা তখনই বিষতুল্য হয়, যখন ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করে। স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলেই, অধীনতা, নরক-তুল্য হয়। তোমাদের অনন্ত উপকার লইতে লইতে, যখন আমাকে আমি একেবারে ভুলিয়া যাইতেছি—আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতেছি; তখনই অধীনতা আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে,—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়া ফেলিতেছে। এরূপ স্থলেই মানুষ, একের ভাল ভাবের সহিত মন্দ ভাবও লইতেছে;—গুরু পুরোহিতের সৃষ্টি হইতেছে;—অবতারবাদ ঘোষিত হইতেছে;—স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব হইতেছে; পুরুষত্ব, স্ত্রীত্বে মিশিতেছে;—ভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে, ব্যক্তি ভিন্ন হইতেছে। স্বর্গ—নরক হইয়া যাইতেছে। অধীনতা, এই প্রকারে এক এক সময়ে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট করিতেছে। প্রভুত্ব, সকলের ব্যক্তিত্ব নাশ করিতেছে;—অত্যাচারে দেশ পূর্ণ হইতেছে—অশান্তি ও অধর্ম্ম, মানবকে গ্রাস করিতেছে। অতএব অধীনতাই কেবল লক্ষ্য নয়। অধীনতার মূলে স্বাধীনতার অঙ্কুর লুক্কায়িত। মানুষ অধীন হইয়াও স্বাধীন,—অধীন হইয়াও, আপনার পথে চলিতে, মানুষ লালায়িত। পথে

পথে, সাহায্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু পাইয়াছি যে আমি,—আমি পৃথক। সকলের পরামর্শে চলিয়া, সকলের উপদেশ শুনিয়া আমি আমিই হইয়াছি,—আমি আমারই পথে চলিতেছি। তুমি ও আমি পৃথক। তোমারও স্বাতন্ত্র্য আছে, আমারও আছে। পৃথিবীতে তোমারও কার্য্য আছে, আমারও আছে। তোমার নিকট উপকার পাইয়া, আমাকে যদি তোমার সহিত এক করিয়া দিই, তবেই ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইবে। যাহা আমাতে নাই, তাহাই তোমার নিকট চাহিব; যাহা তোমার নাই, তাহাই তুমি আমার নিকট লইবে। বিনিময় করিয়া, তুমি তুমিই থাকিবে, আমি আমিই থাকিব। তুমি আমার স্বাতন্ত্র্যকে মান্য করিবে, আমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিয়া চলিব। নচেৎ ভয়ানক বিপদ ঘটিবে—সৃষ্টির বৈচিত্র্য ঘুচিয়া যাইবে—পৃথিবীর আদান প্রদানস্রোত থামিয়া যাইবে;—সমাজ উঠিয়া যাইবে। তোমাতে আমিও ডুবাইব না;—আমিতেও তোমাকে ডুবিতে দিব না। তোমার ভাল লইব বলিয়া, তোমার মন্দ লইব না। অথবা আমার যে বস্তুর অভাব নাই, তাহা তোমার নিকট লইব না। ভাল মন্দ বিচার করিবে, আমার স্বাধীনতার রাজা—বিবেক। আমার রাজা বিবেককে ভুলিয়া, তোমাতে মজিব না। তুমি খ্রীষ্টানই হও, আর তুমি হিন্দুই হও, তোমরা পৃথিবীর সুধাপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে যে সকল উপদেশ করিয়া আপন বুকে রাখিয়াছ, আমি তাহা লইব না। ভাল বই তোমাদের মন্দ লইব না: এই স্থানেই মানুষের স্বাধীনতা। আত্মার যে শক্তি মানুষকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে লইয়া যাইতেছে, তাহাই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বাহিরের কোন অবস্থা নহে, ইহা ভিতরের জিনিস। অধীনতা—আসক্তি, —বাহিরের জিনিস; কারণ এই জড়-শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। স্বাধীনতা—মুক্তি, ভিতরের জিনিস, একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা—শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প। আসক্তি আসিলেই মুক্তির প্রয়োজন। আসক্তি মানুষকে ডুবায়, স্বাধীনতা মুক্তির পথে লইয়া যায়। আমি স্বাধীন সেই স্থানে, যেখানে বিজ্ঞাপিত লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি। অধীন হইয়াও আমি ততক্ষণ স্বাধীন, যতক্ষণ বিবেকের কথা মত চলিতে পারি। তোমার বিবেক ও আমার বিবেক একই প্রকার, কিন্তু অবস্থার তারতম্যে, শিক্ষার তারতম্যে, তুমি হয়ত জ্ঞানের পথে যাইতেছ, আমি হয়ত প্রেমের পথে হাঁটিতেছি, এরূপ স্থলেই বিবেকের গতি পৃথক পথাবলম্বী, দুই হয়।

মানুষ ছাড়িয়া দেখ—এই হিসাবে সকল মানুষই স্বাধীন। তোমার নিকট ইহা শুনিয়া, আমি বিবেকের কথায়ই কেবল আমিত্বে আসিতেছি। বিবেককে বিসর্জ্জন দিলেই পাপ—আমিত্বকে ডুবাইলেই পাপ। যেখানে বিসর্জ্জন, সেই খানেই পাপ। অধীনতা মঙ্গল—কিন্তু বিসর্জ্জন মঙ্গল নহে। প্রেম—স্বর্গের জিনিস, কিন্তু আসক্তি নহে। কোন কিছুতে আসক্তি হইলেই মরিতে হয়। আত্মবোধ না থাকিলে, মন্দ ভিন্ন ভাল ধরা যায় না। আত্মবিসর্জ্জনই পাপ। আমি প্রকৃতির অধীন হইয়া, যখন দুই বস্তুর মধ্য হইতে সৎ ও মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারিতেছি, তখনই আমি স্বাধীন। অধীনতা ও স্বাধীনতা, একত্রে এক স্থানেই বাস করিতেছে। এক বাহিরে, অন্য ভিতরে,—এক শরীরকে ধরিয়া আছে, অন্য আত্মাকে ধরিয়া রহিয়াছে। অধীনতা সেই শক্তি, যে শক্তি মানুষকে টানিয়া সংসারে লইয়া শিক্ষা দিতেছে; স্বাধীনতা সেই শক্তি, যে শক্তি মানুষকে সংসার হইতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টানিতেছে। আবার দেখ, স্বর্গের পথেই সংসার। অধীনতা এই সংসারে রাখিয়া মানুষকে [illegible] করিতেছে; স্বাধীনতা, সংসার-শিক্ষিত মানুষকে লইয়া স্বর্গে তুলিতেছে। একত্রে দুইয়ের কার্য্য চলিতেছে। সংসার ও স্বর্গ, একত্রে মানুষের প্রাণে অবতীর্ণ হইতেছে। আসক্তির পশ্চাতেই মুক্তি বিরাজমান। যখন এ সংস্থানের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে,—তখন হয়, মানুষ স্বাধীনতাকে হারাইয়া, সংসারের দুঃখপঙ্কময় নরকে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া মরিতেছে; নয় ত—অধীনতাকে ভুলিয়া সংসার-বিচ্যুত মানুষ, স্বেচ্ছাচারী ও অহঙ্কার-স্ফীত হইয়া, স্বর্গের পরিবর্ত্তে কল্পনার পূজা করিয়া বৃথা জীবন ক্ষয় করিতেছে,—উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির সেবা করিতেছে। অধীনতা যখনই বিসর্জ্জন ও আসক্তির পথে মানুষকে লইয়া যায়, তখনই আধ্যাত্মিক-শক্তি স্বাধীনতা তাহাকে বাধা দিয়া আপন পথে লইয়া আইসে। আবার স্বাধীনতা যখন পথ ভুলাইয়া মানুষকে বাহিরে লইয়া অহঙ্কারে স্ফীত করিয়া তুলে,—এমনই করিয়া তুলে যে, মানুষ আর অন্য মানুষের স্বাতন্ত্র্যভাব মনে দেখিতে পায় না, তখনই মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়। এই সময়ে অলক্ষিত শক্তির অনন্ত ঢেউ বা ঘটনা, দণ্ড বিশেষের ভিতর দিয়া ছুটিয়া, মানুষের অহঙ্কারকে চূর্ণ করে এবং সামঞ্জস্যদান করিয়া শিক্ষা দেয়। স্বাধীনতা যখন মানুষকে এতদূর লইয়া যায় যে, মানুষ, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হয়, তখনই স্বাধীনতার স্বর্গীয় ভাব লোপ পায়—তখন তাহাকে স্বাধীনতার

নামে স্বেচ্ছাচারিতা বিক্রীত হয়। মানুষ তখন এতই ভুলিয়া যায় যে, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় পার্থক্য বিচার করিবারও আর জ্ঞান থাকে না। বস্তুতঃ নিগূঢ় রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাই স্পষ্ট বোধ হয়, অধীনতা ও স্বাধীনতা, উভয়ই মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট। অধীনতা মানুষকে সংসারের পথে লইয়া যাইয়া শিক্ষা দিতেছে;—একের জ্ঞান আনিয়া অপরকে দিতেছে—আকর্ষণী আবদ্ধতার সৃষ্টি করিতেছে—সমাজ গড়িতেছে—মিলনের সৃষ্টি করিয়া পরস্পরকে বাঁধিতেছে; স্বাধীনতা মানুষকে সংসার-আসক্তির পথ হইতে টানিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে লইয়া যাইতেছে, সংসার-মুক্ত করিতেছে। মানুষ যখনই বাহিরের সংসার জগতে ডুবিতে যাইতেছে, স্বাধীনতা তখনই ভিতরে টানিতেছে। অধীনতা, একতার সৃষ্টি করিতেছে; স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। একতা ও স্বাতন্ত্র্য, উভয়ে মিলিয়া মানবের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছে। কেবল একতা, পাপ; কেবল স্বাতন্ত্র্য, মহাপাপ। স্বাতন্ত্র্য-বোধের সঙ্গে ঐক্য বোধ থাকা চাই। কেবল অধীনতা, নরক; কেবল স্বাধীনতা, বিষ। শরীর-বিচ্যুত মানবাত্মার বিষয় কল্পনায় করিতে পারি না। সংসার-বিচ্যুত মানবাত্মার উন্নতিও চিন্তার অতীত। স্বাধীনতাকে ভুলিলে, অধীনতা মানুষকে পাপ-আসক্তির পথে লইয়া গিয়া ডুবায়; অধীনতাকে ভুলিলে, স্বাধীনতা, মানুষকে স্বেচ্ছাচারিতার পথে লইয়া বিষ-প্রয়োগে নষ্ট করে। দুই পাশাপাশি থাকিলেই মঙ্গল। শরীরের ভিতরে আত্মা, শরীরের ভূষণ অধীনতার ভিতরে আত্মার ভূষণ স্বাধীনতা। শরীর ভিন্ন মানুষকে ভাবা যায় না, অধীনতা ভিন্ন স্বাধীনতা যে কি, বুঝাই কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে পৃথিবীতে মানুষের উন্নতি হইত না, স্বাতন্ত্র্য থাকিত না,—সকল একাকার হইয়া যাইত; আবার অধীনতা না থাকিলে মানুষ, স্বাতন্ত্র্যে মাতিয়া অহং জ্ঞানের পূজা করিত—সকলকে অমঙ্গল করিয়া তাহাতে পুড়িয়া মরিত। অধীনতাকে ভুলিয়া, স্বাধীন মানুষ, পৃথিবীতে কত পাপের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কে না দেখিতে পাইতেছেন? আবার স্বাধীনতাকে ভুলিয়া, কত মানুষ, মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া মরিতেছে, তাহাই বা কাহার অবিদিত আছে? অধীনতাকে ভুলিলে, স্বাধীনতা পাপ উৎপন্ন করে; স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিলে মনুষ্যের অনন্ত উন্নতির স্রোত থামিয়া যায়। এই দুই চাই—দুইকেই রাখিবে, রাখিতেই হইবে। ঈশ্বরের বিধানই এই। আমরা এখানে

চলিবে। ক্ষুদ্র মহতের মিলন হইবে,—রাজা প্রজা থাকিবে। বাহিরে—অনন্ত দুই জগৎ শাসন করিতেছে; ভিতরে ঈশ্বরবাণী বিবেক শাসন করিতেছে। বাহিরে যতক্ষণ আছি, অধীন হইয়া আছি;—ভিতরে যখনই আছি, স্বাধীন হইয়া আছি। বাহিরে অধীনতা টানিতেছে;—ভিতরে স্বাধীনতা আলো জ্বালিয়া নির্ব্বাণের পথ দেখাইতেছে। অধীনতা যখনই ডুবাইতে চাহিতেছে, তখনই স্বাধীনতা, মানব সন্তানকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইতেছে,—তখনই মানুষ, অধীনতাকে বিষের ন্যায় মনে করিতেছে। স্বাধীনতাকে ভুলিয়া অধীন হইলেই ব্যক্তির লোপ পায় ও মানুষের মৃত্যু ঘটে। অধীন-স্বাধীন মানুষ আবহমান কাল বাস করিতেছে, অনন্ত কাল বাস করিবে। কেহ শত সহস্র চেষ্টাতেও একজনকে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, মানুষকে উন্নতির রাজ্যে লইয়া যাইতে পারিবে না। আমার তত্ত্ব যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে ইহাই বুঝিয়াছি, আমি অধীন ও আমি স্বাধীন;—তোমার তত্ত্ব যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে তাহা এই,—তুমিও অধীন এবং স্বাধীন। দুটী বিসদৃশ চিত্র হইলেও, এই দুইয়ের মিলনেই মানবের মঙ্গল হইতেছে। মানুষ, এ তত্ত্ব না বুঝিয়া বৃথা চিৎকার করিয়া ফিরিতেছ কেন? একদেশদর্শী মানুষ, তুমি স্বাধীনতার ভাণ করিয়া, সংসারের উপকার বিস্মৃত হইয়া, সংসারের পথে না চলিয়া,—সংসারের পরামর্শ ও উপদেশ না শুনিয়া,—একত্বকে আলিঙ্গন না করিয়া, আমাকে কেবলই স্বাতন্ত্র্য—কেবলই স্বেচ্ছাচারের পথে হাঁটিতে বলিতেছ?—তুমি দূর হও। আর তুমি হে মানব-সমাজের গুরু, উপদেষ্টা, বা অত্যাচারী রাজা, তুমি আপন স্বাধীনতাকে অপ্রতিহত প্রভাবে বজায় রাখিয়া, আমার স্বাধীনতাকে,—স্বাতন্ত্র্যকে ডুবাইয়া—জীবনের মূলমন্ত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া, আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন করিয়া, আপন ক্রোড় পরিপূর্ণ করিতে বা আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিতে যে চেষ্টা করিতেছ, তুমিও দূর হও। কেবল একতা স্বর্গের পথ নহে;—কেবল স্বাতন্ত্র্যও স্বর্গ-সোপান নহে। অধীনতার পরিণাম—একতা বা প্রেম; স্বাধীনতার পরিণাম—মুক্তি বা জ্ঞান। একতা, সংসারের দুর্লভ পদার্থ। স্বাতন্ত্র্যও স্বর্গের অমূল্য জিনিষ। কিন্তু একের বিহনে, অপর, অসার—দূষিত জিনিষ—নরকের সোপান। তাই বলি, একতার সঙ্গেই স্বাতন্ত্র্য চাই। মূল কথা, সংসারের অধীনতাও চাই, স্বর্গের স্বাধীনতাও চাই। জড়-শরীরও চাই, নিরাকার আত্মাও চাই—তবে ত মানুষ, মানুষ। স্বাধীনতা যাহার

আছে,—যাঁহার জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে, সে মহা পরাক্রমশালী রাজার অধীন হইয়াও স্বাধীন; একতা বোধ যাহার হইয়াছে—প্রেম যে পাইয়াছে,—স্বাধীন হইয়াও সে অধীন। ভিতরে স্বাধীনতা থাকিলে, রাজা বল বা সমাজ বল, আইন বল বা শাসন বল, কেহই আমাকে একেবারে বাঁধিতে পারিবে না। আবার স্বাধীনতা আছে বলিয়া কাহাকেও মানিব না, কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিব না, ইহাও ঠিক নহে। ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করেন নাই,—সম্পূর্ণ অধীনও করেন নাই। মানুষ অধীন হইয়াও স্বাধীন; আবার স্বাধীন হইয়াও অধীন। অধীনতা যেখানে, স্বাধীনতাও সেইখানে। মানুষ চিরকাল অধীন-স্বাধীন হইয়া উন্নতি লাভ করিতেছে, চিরকাল করিবে।

মহা নির্ব্বাণ।

"Who knows whether that which is called living be not indeed rather dying, and that which is called dying, living." *Plato.*

প্রকৃতির কোলে সদাই হরগৌরী ভাব,—দুই বিপরীত স্বরূপ বিকশিত। ফুলের মিষ্ট হাসি, পাখীর মধুর কাকলি, আকাশের নীলিমায় চাঁদের স্নিগ্ধ কূটস্থ জ্যোতি, উৎসের মৃদু-মধুর শন্‌শনি, মানুষের হৃদয়ের নবীন প্রেম,—এ সকলই চির মধুময়, চির শান্তিময়, চির আরামময়। প্রকৃতির নৃত্যের তালে তালে কত আনন্দ, কত শান্তির প্রস্রবণ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। কবির লেখনী পাইয়া তাহা শেষ করিতে পারে না—ভাবুক ভাবিয়া অন্ত পাইতে পারে না। কত আলো—কত শোভা—কত আনন্দ—চতুর্দ্দিকে নিমিষে নিমিষে ফুটিয়া পড়িতেছে। কিন্তু হায়, কেবল ইহাই প্রকৃতির লক্ষ্য নহে—ইহাই শেষ নহে। আলোকের কোলে গাঢ় অন্ধকার, হাসির পাছে ক্রন্দন, আনন্দের পাছে বিষাদ, জীবনের পাছে মরণ,—অনন্ত মরণ লীলা খেলা করিতেছে। ফুলের হাসিময় পাপ্‌ড়ী ঝরিয়া পড়িতেছে,—পাখীর মধুর কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—আকাশের চাঁদের জ্যোতি আঁধার-রাহু গ্রাস করিতেছে। সরল হাসিময় শিশুকে মরণ-বিষাদে চুম্বন করিয়া, মাতৃ অঙ্কে অসময়ে ঢলাইয়া ফেলিতেছে;—স্ত্রীর প্রেমের বসন্ত যাহার স্বামীর হৃদয়ে চির-উৎস ঢালিতে পারিতেছে না। মরণের ইঙ্গিতে, কে জানে কেন, সুখের পাছে শোক—আনন্দের পাছে নিরানন্দ—সদাই বিরাজ করিতেছে। এইভাবে, বিরূপ-

মধ্য সংসারে—মানুষ কেমনে শান্ত চিত্তে বসবাস করিবে ?—এই কুহকময়ী জগতের সজীব রহস্য মানুষ কেমনে ভেদ করিবে ? আসক্তি এবং বৈরাগ্যের সহিত একই সময়ে মানুষ কেমনে সন্ধি স্থাপন করিবে ? জীবন এবং মরণের সমতায় একই সময়ে কেমনে মানুষ মজিবে ? এই কথার উত্তর যে দিতে পারে, সে ই প্রকৃত বীর—সে ই প্রকৃত সাধু, সে ই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

সকল মানুষ কিন্তু এই দুই অবস্থাসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যে ধন পাইয়াছে,—সে কেবলই ধন চায়,—আরো চায়, আরো চায়। কি এক দারুণ পিপাসা তাহার প্রাণে অবতীর্ণ, সে কিছুতেই ধনের মমতা ছিঁড়িতে পারিবে না। মাটীর টাকা মাটীতে পড়িয়া থাকিবে, মাটীর দেহ শ্মশানে নির্ব্বাণ হইবে,—আগুন এবং কাঠ জীবনের শেষ কাহিনী লিখিবে, একথা শত বার, সহস্রবার তাহার কাণে কাণে বল, সে কিছুতেই ঐ ধন-মমতা ছাড়িবে না। দারুণ পিপাসা—কিছুতেই যায় না। কাহার পিপাসা বা যায় ? ধন-পিপাসার ন্যায় জ্ঞান-পিপাসা, সৌন্দর্য্য-পিপাসা, রূপ-পিপাসা—যশ-পিপাসা, প্রেম-পিপাসা—কোন পিপাসারই শান্তি নাই ;—ক্রমাগতই রাবণের চিতার ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষ রূপ দেখে, আরো দেখে, আরো দেখে,—কিন্তু দেখার সাধ কিছুতেই আর মিটে না ;—সুখের আশা কিছুতেই ঘুচে না। মানুষের এ যে কি দারুণ ব্যাধি, বুঝি না—মানুষ কিছুতেই মানুষের সঙ্গ-ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিবে না। "রূপ দেখাও, আরো দেখাও ; শ্যাম, তোমার পায়ে ধরি, দূরে যাইও না।" শ্যাম-পিপাসায় ভোর রাধিকা কেবল এই কথাই বলিতেছে ! অদর্শন তীক্ষবাণ কিছুতেই রাধার প্রাণে সয় না। আরো প্রেম-মদিরা ঢালো, আরো ঢালো—আরো মাতো, আরো মাতো। ডুবিলেও আরো ডুব। কুল নাই, জাতি নাই,—কিছুই নাই ;—শ্যামের জন্য রাধিকা সর্ব্বস্ব দিয়াছে। রাধিকার আদর্শে গঠিত বঙ্গ সমাজের দশা কি হইয়াছে ?—বঙ্গসমাজও আসক্তির এই মধুর সহবাস-স্রোতে এতই পিপাসিত হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কিছুতেই তার মন নাই। সে মান নাই, সে অবোধ্যা নাই—সে প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি কলাপ কিছুই নাই ; নাই বা থাকিল ! ঢালো আরো ভ্রান্তি,—ঢালো আরো মদিরা—আরো মত্ততা। রিপুর উত্তেজনায় বাঙ্গালী আজ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, কে ভাবিতে পারে ? কুল নাই, জাতি নাই—জাতি নাই, কুটুম্ব নাই, শ্যামের নামে নহে, রিপুর নামে বাঙ্গালী-রাধিকার

সর্ব্বস্ব দিয়াছে ! কিন্তু দিয়াছে কোথায় ? কাহার চরণে ? ঐ আসক্তির মধুর চরণে। মানুষ যাহা পারে নাই, মানুষ তাহা কেমনে পারিবে ? মানুষ সুখের সময় দুঃখের কথা কেমনে ভাবিবে ?—মানুষ মিলনের সময়ে বিচ্ছেদ-কাহিনী কেমনে সহ্য করিবে ? মানুষ সহবাস-সুখ উপভোগের সময় কেমনে শোকের সঙ্গীত শুনিবে ? এ সকল নাকি অসম্ভব। বালিকার প্রণয় ভোলা অসম্ভব। বনের পিপাসা ভোলা অসম্ভব, সুরার মাদকতা ভোলা অসম্ভব। চাঁদের হাসি ভোলা অসম্ভব। ফুলের মধু ভোলা অসম্ভব। রমণীর প্রণয় ভোলা অসম্ভব। অসম্ভব, কিন্তু মানুষ প্রকৃতির হাত এড়াইবে কেমনে ? ইচ্ছা করিয়া মানুষ এ সকল ভুলিতে পারে না—আসক্তির হাত ছাড়াইতে পারে না বটে—কিন্তু প্রকৃতি ত ছাড়িবার নয়। সে বৈচিত্র্যের মধু দিয়া ঢালিবেই ঢালিবে ! তোমার প্রাণ চায় না, তাতে কি ? সে আলোর মাঝে আঁধার মেশিবেই মেশিবে। সে সুখের মাঝে দুঃখের তীক্ষ্ণ বাণ ছুড়িবেই ছুড়িবে ! সে জীবনের মাঝে মরণকে রাখিবেই রাখিবে ! হায়, একি বিষম ব্যাপার ! হায়, একি নিদারুণ কাহিনী ! হায়, প্রকৃতির একি ভয়ানক রব !!

মানুষের প্রাণে প্রকৃতির কশাঘাত সময়ে সময়ে বড়ই বাজে। এমন করিয়া কি মজিতে হয় ? এই সুখ, এই আনন্দ—এই উৎসব, এই ভরা-সংসার,—হায়, মুহূর্ত্তের মধ্যে এ কি হইল !! স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রী হাসিতেছিল, হঠাৎ ঢলিয়া পড়িল ! মাতার কোলে সন্তান ফুটিতেছিল, হঠাৎ মলিন হইয়া যাইল ! আজ স্ত্রী, কাল স্বামী, আজ পুত্র, কাল পিতা—সুখের সংসার হইতে একে একে কত আত্মীয়, কত আত্মীয়া এইরূপে প্রাণে শেলাঘাত করিতে লাগিল ! "সংসার কি তবে দুঃখের ? সংসার কি তবে বিষাদের ?" —বক্ষে করাঘাত করিয়া মানুষ অবশেষে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আসক্তির তীরে পৌঁছিয়া, অবশেষে মানুষ, বৈরাগ্যের ভিতরে বাধ্য হইয়া প্রবেশ করিতেছে ! মানুষের উৎসাহ, উত্তেজনা, সাহস, বীর্য্য—সব মিলিয়া যাইতেছে ; প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মানুষ, প্রকৃতির হাতের পুত্তলিকার ন্যায় এমনই করিয়া জীবন এবং মরণের মধ্য দিয়া, কে জানে কোথায়, ভেসে যাইতেছে ! বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এমনই করিয়া কে যেন অনন্তের দিকে টানিয়া লইতেছে ! আমার ইচ্ছা ত, কেবল সুখ লইয়া থাকি ; কিন্তু প্রকৃতি তা দেয় কই ? ইচ্ছা ত আনন্দ উল্লাসে সংসার করি,—কিন্তু পোড়া প্রকৃতি সে ইচ্ছার কথা কিছুতেই শুনে না। মানুষ যে

কেমন অধীন—তা এই প্রবন্ধে কতক কতক মানুষ বুঝিয়াছে। কিছুই যে করিবার শক্তি নাই। মানুষ যে কত হীনবল, তাহা অনেকই ভাবিয়া সময় সে ভাবিয়াছে। মানুষ যে কত ক্ষুদ্র—তাহা সময়ে অনেকেই ভাবিয়া, সে বুঝিয়াছে। "নাহং, নাই, নাই, নাই—নহি, নহি, নহি"—মানুষ ঠেকিয়া বুঝিয়া তবে প্রকৃতিকে এই কথা বলে। মানুষকে যে কেবল অধীন বলে, তার বাড়া ভ্রান্ত আর কে আছে? মরণের ভিতরে মানুষ যাইতে চায় না—তবুও যাইতে হয়। শোক দুঃখের তীক্ষ্ণ কশাঘাত মানুষ সহিতে চায় না, তবুও সহিতে হয়। তবেই দেখ, মানুষ কত অধীন। অধীন হইতেও অধীন। মানুষ প্রকৃতির দাসানুদাস। স্বাধীনতা কি তবে মানুষের নাই? আছে। আমরা পূর্বে এক প্রবন্ধে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছি। স্বাধীনতা ও অধীনতা, দুইই মানুষের আছে। দুই ভাব, দুই রূপই প্রকৃতির। কেবল স্বাধীনতা সত্য নয়; কেবল অধীনতাও নয়। মানুষ স্বাধীন-অধীন। মানুষ, মরণের পথে, দুঃখের পথে, বৈরাগ্যের পথে, আপন ইচ্ছায় যায় না। মরণের পথে, দুঃখের পথে, বৈরাগ্যের পথে—অনন্ত জীবনের আরম্ভ। অনন্ত জীবনের পথে, মানুষ ইচ্ছা করিয়া যায় না। মানুষ সীমার পথে, অস্থায়িত্বের পথে—পাপের পথে—আপন ইচ্ছায় যায়। স্বেচ্ছার কথা এই খানে। যাহা চিরকাল আমার নয়, তাহাকেই মানুষ আপনার ভাবে—আপন ইচ্ছায়। যাহা বিষ, তাহাকেই সুধা ভাবিয়া চুম্বন করে, লোক আপন ইচ্ছায়। মানুষ ধন চায়, মানুষ যশ চায়, মানুষ সংসার চায়—মানুষ রিপু চরিতার্থ করিতে চায়। এ সকল কদিনের বলত? আজ আছে ত, কাল নাই। এক নিমেষের জন্য যাহা, তাহাকে লইয়াই মানুষ থাকিতে চায়। এইখানে স্বেচ্ছামূলক মানুষের স্বাধীনতা। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে নরকের পথে লইয়া গিয়াছে—আরো যাইবে। মানবের অবনতি—কেবল স্বেচ্ছা-মূলক স্বাধীনতায়। মানবের দুর্গতি—কেবল স্বেচ্ছাচারিতায়। যে রিপু দুদিন দশদিন বই থাকে না, তার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকে মানুষ স্বেচ্ছায়। আর ঐ যে অন্ধকার—গভীর হইতেও গভীর—ঘন হইতেও ঘনতর, ঐ যে অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় শোক দুঃখ, ঐ যে শ্মশান আগুন এবং কাঠ দিয়া মহা নির্ব্বাণের মহাপাঠ লিখিতেছে, উহার ভিতরে যে মানুষ ঢুকিতে চায় না, উহার ভিতরে কি তা জান?—উহাই নব জীবনের আরম্ভ। কি শাস্ত্র লিখিতেছে—আগুন জ্বালিতে ঐ মহা বৈরাগ্যের শ্মশান?—শাস্ত্র এই—"মুক্তি

স্বাধীন দেখা যায়—অনন্ত জীবন-পথে বিচরণ করে।” আলোক ও সীমাকেই দেখাইয়া দেয়—আসক্তি ও সুখেরই পরিচয় দেয়। এ সকল লইয়া কেন চিরকাল ভুলিবে? ভাবিয়া দেখ,—অন্ধকার অসীমের কাহিনী বলে, বৈরাগ্য অনন্তের রূপই দেখাইয়া দেয়। আলোক—সসীমব্যঞ্জক, অন্ধকার অসীমব্যঞ্জক। আলোক, স্বাধীনতার লক্ষ্য; অন্ধকার অধীনতার পরিণাম। স্বাধীনতা অন্ধকার হইতে মানুষকে স্বর্গের দিকে টানিতেছে,—স্বাধীনতা বিবেকের জন্য;—স্বাধীনতা বা ঈশ্বরের অধীনতা, স্বারাজ্যের সোপান। মানুষ স্বাধীন এই অর্থে যে, সে যাহের অধীন। বিশ্বময় গম্ভীরা অন্ধকারা রজনী—মহাশ্মশানে মানুষের পরিণামে আগুন কালিতে লিখিত হইয়াছে—অনন্ত। অনন্ত কি? না, মানুষ যাহা ধারণা করিতে পারে না। মরণ কি? না, মানুষ যাহা বুঝিতে পারে না। অনন্তে ডুবাইবার জন্য আলোকের পরে অন্ধকার। অনন্তের পথে লইয়া যাইবার জন্য, জীবনের পরে মরণ। অনন্তের তত্ত্ব শিখাইবার জন্য, সংসারের কোলে শ্মশান। অনন্তে লক্ষ্য ফিরাইবার জন্য—আসক্তির কোলে—মহানির্ব্বাণ। অনন্তের কাহিনীকে নিরস্ত করিবার জন্য, স্বাধীনতা বলিয়া অধীনতা। তোমার ইচ্ছা থাক, না থাক, তাই, অহঙ্কারী, সংসার-আসক্তি-নিরত মানুষ, তোমার পরিণাম ঐ শ্মশান, ঐ মরণ, আর ঐ অনন্তের পথ! ক্ষুদ্র হইয়া কি মানুষ চিরকালই ক্ষুদ্র থাকিবে? না—তা নয়। অনন্তের শিশু অনন্তের পথ ধরিবেই ধরিবে। আসক্তি নয়—সুখ নয়—আলোক নয়—সীমা নয়—কিছুই মানুষের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য—ঐ অনন্ত; লক্ষ্য, যাহা মানুষ জানে না, তাহাই। লক্ষ্য, যার ভিতর মানুষ যাইতে চায় না, তাহাই! কেন তবে বসিব? কেন আসক্তি বা সুখ, ধন বা যশ, আলোক বা সীমা, স্বেচ্ছাচার বা নরক লইয়া ভুলিয়া থাকিব? চাই না, কিছুই চাই না। সংসার থা'ক, আসক্তি থাক, সুখ থাক, আনন্দ থাক, মিলন থাক—শরীর থাক—কিছুই চাই না। আমার এই ইচ্ছা, আমি [illegible] হইয়া—একের কোলে মাথা রাখিয়া, অভয় ব্রত গ্রহণ করিয়া, ঐ অনন্ত মরণকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া পড়ি। আরো ইচ্ছা এই—সকল বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য করি; কর্ম্মযোগীর সাধনা বুঝি; স্বাধীনতা ও অধীনতার মর্ম্ম ভেদ করি। 'আয় শ্মশান, আয় দুঃখ, আয় শোক, আয় মরণ, তবে তোরা আয়, আমার কাছে তবে আয়।' দেবতাকে নাশ কর, স্ত্রী পুত্রের আসক্তি নির্ব্বাণ কর'—আমি সংসারে থাকিয়া থাকিয়া তোকে ডুবব

করিয়া মহা বৈরাগ্যের মহা শান্তির মহত্ত্ব বুঝি। ইচ্ছা, মহানির্ব্বাণে আসক্তিকে ডুবাইয়া—জীবনত্ব, দেবত্ব, সংসারের অতীতত্ব যাহা কিছু, তাহাই লাভ করি। চিরকালের জন্য সীমাকে লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়া অসীমের দাস হইয়া যাই। ইচ্ছা, তন্ময় হইয়া যাই। ভয় কি!—ভাবনা কিসের? মাটীর ভিতরেই সোণা। জীবনের ভিতরেই মরণ। মরণের ভিতরেই অনন্ত জীবনের আরম্ভ। মহাকালী, মহামায়ার জাল ছিন্ন করিয়া, উগ্রচণ্ডা, রণরঙ্গিণী, উন্মাদিনীবেশে বিকট হাসি হাসিয়া কেবল অসুরদলন করিতেছেন! অসুর পরাজিত হইবে না? রিপুর গর্জ্জনা নিবিবে না? স্বাধীনতা ডুবিবে না? মায়ের ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। মহাকালীর মহা প্রতিজ্ঞা অবশ্য পূর্ণ হইবে। মানুষ, পশুত্ব বা অসুরমনত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব বা তন্ময়ত্ব লাভে অবশ্য বাধ্য হইবে। মানুষ, অবশ্য রক্ষা পাইবে। যাইতে যাইতে হবে, মানব-তনয় একদিন না একদিন অনন্তের দিকে ধাবিত হইবেই হইবে। ধূলি মাটীর খেলা—অসুরত্ব বা বালকত্ব, এ সকল চিরকাল মানুষকে জীবনের পথ হইতে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে না। মহাশ্মশানের ভিতর দিয়া মানুষ সেই মোক্ষ, সেই স্বর্গের দিকে যাইবেই যাইবে। অমৃত-সন্তান আবার অধীন হইবে। রাধিকা, আসক্তি ডুবাইয়া আবার বৈরাগ্যের গীতি গাইতে গাইতে ভগবৎভক্তিতে পূর্ণ হইয়া, মহা নির্ব্বাণের পথে উল্লসিত চিত্তে ধাবিত হইবেই হইবে। মানুষ, তোমার সাধ্য কি যে, তুমি এই অপরিহার্য্য বিধানের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে? সাধ্য নাই বলিয়াই, মহানির্ব্বাণ-মন্ত্রে সকলেই দীক্ষিত। রাজা, প্রজা, ধনী দরিদ্র—বড় ছোট সব একাকার, ঐ মহানির্ব্বাণে। সংসার ছিন্ন করিয়া, ধূলিবালির আকর্ষণ ঠেলিয়া—মানুষ মায়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া, ঐ দেখ, কেমনে মহানির্ব্বাণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে! মাতার কোলে এই শিশু হাসিতেছিল, খেলিতেছিল,—এই দেখ, ঢলিয়া পড়িল! স্বামী, প্রেমালিঙ্গনে জীবনকে কৃতার্থ করিতেছিল—হায় হায়, ঐ দেখ প্রেমের ডোর ছিন্ন, স্বামীর কোলে সতীর দেহ মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত। পতঙ্গ কেমন উল্লাসে পুড়িয়া মরিতেছে! মানুষ, অনায়াসে সকল বন্ধন ছিন্ন করিতেছে। কিসের আশায়? কাহার ইঙ্গিতে? আশা না থাকিলে কি শোককে জয় করা যায়? আশাই মৃত্যুঞ্জয় বীজ মন্ত্র। কিসের আশা? জীবনের আশা;—মহা জীবনের মহা আশায় মহা

আসক্তির মায়ায় সংসারাসক্তি মানুষ, ভুলিতেছে! প্রাণের মূলে সেই আশার বাণী—মহাজীবন-কাহিনী সদা নিনাদিত হইতেছে। যখনই মানুষ সেই সুধা-বিনিষিক্ত আশার কাহিনী শুনিতেছে, তখনই বন্ধন ছিঁড়িয়া, সে-চ্ছাকে ডুবাইয়া, মহানির্ব্বাণে ডুবিতেছে। এক দিন না এক দিন, হে মানুষ, তোমাকে এই মহানির্ব্বাণে ডুবিতেই হইবে। অহঙ্কার, জ্ঞান বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য সুখ, সব একাকার হইবে। গৃহে শ্মশান, জগতে শ্মশান, আকাশে শ্মশান; চতুর্দ্দিক অন্ধকার, মহা অন্ধকার!—বায়ু শো শো বহিতেছে, আগুন হু হু করিয়া জ্বলিতেছে! একদিন ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতেই হইবে। প্রকৃত মানুষ তাঁহারা, যাঁহারা এই অপরিহার্য্য মহানির্ব্বাণ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সময় থাকিতে থাকিতে, জীবন, মরণ, সুখ দুঃখ, আসক্তি এবং বৈরাগ্যকে একই সময়ে আলিঙ্গন করিতে পারেন। এই কঠোর সংসারে—এই প্রলোভন পূর্ণ সংসারে, এই নিষ্ঠুর হাসিমুখময় সংসার-শ্মশানে যাঁহারা প্রকৃত শ্মশা-নের হৃদয়ঙ্গম করিয়া, চক্ষুকে ঐ মহা অন্ধকারের অতীত স্থানে ফিরাইতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। আসক্তির কোলে বৈরাগ্য, সংসারের কোলে শ্মশান, জীবনের কোলে শব-সাধনে সিদ্ধ হইয়াই, মহাদেব, মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকালের জন্য অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই মহানির্ব্বাণকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইয়াই খ্রীষ্ট চিরকালের জন্য অমর! শব-সাধনে সিদ্ধিলাভ করা চাই, মরণের অতীত হওয়া চাই—শরীর-মায়াকে বিসর্জ্জন দেওয়া চাই। যে ইচ্ছা করিয়া আত্মহত্যা করে, সে পাপী, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ইচ্ছাকে বলি দিয়া, অপরিহার্য্য মায়ের বিধানে যে মরণকে আলিঙ্গন করিতে পারে, সে অমর, সে চিরজয়ী মহাপুরুষ। অতএব মরণের ভিতরে যে জীবন, মাটীর ভিতরে যে চিন্ময় বস্তু, আসক্তির অতীত যে মহাপদার্থ, তাতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া যত দিন লক্ষ্য-সিদ্ধ করিতে না পারিবে, তত দিন কিছুতেই মানুষের মরণের ভয় যাইবে না। অমর সে ই, যে মৃত্যুকে ভয় করে না। সুখী সে ই, যে দুঃখে কাতর হয় না। প্রকৃত প্রেমিক সে ই, যে বৈরাগ্যকে,—বিচ্ছেদকে ভয় করে না। মৃত্যুর ভয়, দুঃখের ভয়, বিচ্ছেদের ভয়কে অতিক্রম করিয়া—এ সকলের অতীত যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহারাই মহানির্ব্বাণ-মন্ত্রে দীক্ষিত। সংসারে থাকিয়াও তাঁহারা সংসারে নন; সংসারে না থাকিয়াও তাঁহারা সংসারে আছেন। ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য উভয়কে আয়ত্ত করিয়া যাঁহারা চিরস্থায়ী অনন্ত জীবন-পথ প্রাপ্ত

হইয়াছেন—প্রকৃত অমরত্ব লাভ করিয়াছেন,—তাঁহারাই মানুষ, তাঁহারাই জীবিত, তাঁহারাই দেবতা, তাঁহারাই অমর। তাঁহারা পৃথিবীতে থাকিয়াও মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন। আর সকলই মৃত, সকলই অসার।

একাকীত্ব।

একাকীত্ব-সাধন, সকল সাধনার মধ্যে কঠোর সাধনা। বহুজনাকীর্ণ সংসারকে না ভুলিতে পারিলে,—সংসারের মন-মুগ্ধকর মায়া মোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে—যশ নিন্দাকে তুচ্ছ করিতে না পারিলে, স্বর্গই বল আর বৈকুণ্ঠই বল, সকলই কল্পনা। আমি যদি চতুর্দ্দিকে তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে বা তোমার মুখের প্রশংসা শুনিতেই নিমগ্ন রহিলাম, তবে আর আমার কর্ত্তব্য পালন হইবে কি প্রকারে?—আমি যদি সর্ব্বক্ষণ তোমার ভাবেই বিভোর রহিলাম, তবে আর পরমার্থ চিন্তা করি কখন? —আমি যদি তোমার চিন্তার খনিতে নিমগ্ন হইয়া আত্ম-হারা হইয়াই চিরকাল থাকিব, তবে আর আপন চিন্তার উৎকর্ষ সাধিত হইবে কিরূপে? কিন্তু মানুষ সংসারে একাকী থাকিতে চায় না। মানুষ, মানুষে ডুবিয়া আত্মবিস্মৃত হইবার জন্যই লালায়িত। মানুষ, মানুষের প্রশংসার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। ইহাতে যে মানুষের কোনই উপকার হয় না, তাহা নহে। পৃথিবীতে আজ কাল কত অসংখ্য দল দেখা যাইতেছে। খ্রীষ্টের দল, মহম্মদের দল, নানকের দল, গৌরাঙ্গের দল, বুদ্ধের দল,—হাজার হাজার দল এই সোনার সংসারকে দগ্ধ করিতেছে। মানুষ, মানুষের অস্তিত্বে আপনাকে ডুবাইয়া সুখী হইতেছে। স্পেন্সরের দল, ডারউইনের দল, মিলের দল, কম্‌টীর দল, দলে দলে দেশ গুলজার। মানুষ, অন্যের প্রতিভার আদর করিতে যাইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। স্বাধীন চিন্তার আদর নাই, ব্যক্তিত্বের সম্মান নাই। অন্যের মহত্ব স্মরণ বা গ্রহণ করা ভাল, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাকে বজায় রাখা আরো ভাল। পৃথিবীর আদি সময় হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথকত্ব বা একাকীত্ব সাধনা অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে, তাই পৃথিবীতে এত দলের সৃষ্টি। দলের সৃষ্টি হওয়াতে, লোকেরা, দশজনের মহত্বে মুগ্ধ হইয়া, আর দশজনকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে,—আর দশজনেরি মহত্ব গ্রহণে অক্ষম হইয়াছে। এই কারণে জ্ঞান বা প্রেম,

উভয়ই মানব হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা দান করিয়েছে ;—উদারতা বা প্রশস্ততা মানব হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতেছে। দলাদলি পৃথিবীর মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

দলাদলিতে যে পৃথিবীর মহা অনিষ্ট করিয়াছে, ইহা মনুষ্য জগৎ বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু তবুও আবার দলের জন্য লালায়িত হইতেছে। এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য লোক প্রাচীন দলের মমতা ছিঁড়িয়া আবার নূতন দলের সৃষ্টি করিতেছে। ক্রমাগতই দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার সহিত হিংসা বিদ্বেষ, পরনিন্দা বা ঘৃণাও রাজত্ব বিস্তৃতি পাইতেছে। মানুষ, মানুষের মহত্ত্ব দেখিবার জন্য সমুৎসুক, কিন্তু আজ মানুষ, কেবল মানুষের দোষ ও ত্রুটীই দেখিতেছে। এ রোগের প্রতিকার কিরূপে হইবে, সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি না।

মানুষ, মানুষের মহত্ত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু আপনাকে হারাইয়া ডুবাইতে আইসে নাই। সকলের দ্বারা উপকৃত হইব বটে, কিন্তু হইব যে আমি, সে আমি পৃথক। মাতার স্নায়ু-পঙ্ক মাতার শোণিতে আমার সৃষ্টি, কিন্তু মাতা ও আমি পৃথক। পৃথকত্ব যদি সৃষ্টির বিধান না হইত, তবে সকলই একাকার হইয়া যাইত। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র থাকিত না, বাগানে ফুল ফল থাকিত না, সাগর পাহাড় থাকিত না,—নর নারীতে বিভিন্নতা থাকিত না। তাহা হইলে তুমি ও আমি এক রূপ ধরিয়া আসিতাম। অসংখ্য ঘুচিয়া এক অখণ্ড জিনিস থাকিত। বৈচিত্র্য ঘুচিয়া মিলন ঘটিত। বৈষম্য বা বিভিন্নতা ঘুচিয়া সাম্য বা একরূপত্ব থাকিত। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বে কি দেখিতে পাইতেছি ? এক পাঠশালায়, এক শিক্ষার অধীন থাকিয়াও কত বিভিন্ন হইতেছি,—তুমি ও আমি। বালক বালিকায় কত বৈষম্য, বালকে বালকে কত পার্থক্য, বালিকায় বালিকায় কত বিভিন্নতা। দুটী হৃদয় একরূপ নয়, দুটী মন একরূপ নয়, দুটী জীবন একরূপ নয়,—দুটী ফুল একরূপ নয়, দুটী ফল একরূপ নয়। সকলই পৃথক, সকলই বিভিন্ন। শিখিব, পাইব, এই জন্য প্রকৃতি সৃষ্ট, কিন্তু কাহাকেও ডুবিয়া মরিব না,—আত্মবিস্মৃত হইব না। ইহাই কঠোর সাধনা। তোমার ভালভাব গ্রহণ করিব বলিয়া, তোমার মন্দ ভাবে আমার বিশেষত্বকে ডুবাইব কেন ? তোমাকে ভালবাসি বলিয়া, তোমার সহিত একাত্মক হইয়া যাইব কেন ? কবির কল্পনা দূরে যাক, তোমার কর্ত্তব্য ও আমার কর্ত্তব্য যে পৃথক,—তুমি ও আমি যে পৃথক

হইয়াছি, সে কি এই জন্য নয় যে, উভয়েরই দুই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? দলে ডুবাডুবি করিতে, দলাদলি বাঁধিবার জন্য লালায়িত হইতেছ কেন? সকল দল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া সকলে পৃথক পৃথক হইয়া পড়, সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলের মহত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, একাকীত্ব সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও। হিন্দু কেবল হিন্দুর গুণকীর্ত্তনে রত থাকিবে, খ্রীষ্টানের গুণ কীর্ত্তনের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না? মুসলমান কেবল মুসলমানের গুণ গ্রহণে থাকিবে, কাফেরদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না? কি ঘৃণার কথা, কি দুঃখের চিত্র! সকল দল ভাঙ্গিয়া সকল পৃথক পৃথক হউক,—সকলে সকলের গুণ গ্রহণ করুক, সকলে সকলের বিশেষ বিশেষ মহত্ত্ব গ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে রত থাকুক। কিন্তু হায়, তাহা কি সহজে হইতে পারে? ব্যক্তিত্ব সাধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। বহু জনের ঘৃণা, বহু জনের নিন্দা, বহু জনের তিরস্কারকে আলিঙ্গন করিতে পারিলে, তবে ত একাকীত্ব সাধনে জয়ী হওয়া যায়! কত জনের ভালবাসা ছিন্ন করিতে হয়, তবেত একাকী হওয়া যায়! কত জনের প্রশংসাকে তুচ্ছ করিতে হয়, তবে ত একাকী থাকা যায়। সকলের উপরে কত জনের সাহায্য উপেক্ষা করিতে হয়, তবে ত একাকীত্ব বা ব্যক্তিত্ব সাধনে জয়লাভ করা যায়। পৃথিবীর অবস্থা এমনই জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ মানুষকে ভালবাসার দাস করিতে না পারিলে মানুষের কোন প্রকার সাহায্য করিতে চায় না। গোলামগিরি চতুর্দ্দিকে চলিতেছে—দাস-ব্যবসায় সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এমনই জঘন্য অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে, দাসত্বই যেন সকলের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। পৃথক হইয়া দেখিয়াছি, দল ছাড়িয়া দেখিয়াছি, চতুর্দ্দিকের লোক অমনিই দয়ার হস্ত গুটাইয়া লইয়াছে, অমনিই চতুর্দ্দিকের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সকল দল সম্বন্ধেই এ কথা বলিতেছি। দাস করিবার জন্য কে উৎসুক নয়? যে স্বাধীনতার ধ্বজা ধরিয়া বাহিরে চীৎকার করিতেছে, সেও ভিতরে ভিতরে দাসদাসী অন্বেষণে ব্যস্ত। চাকরি-করাকে কেবল দাসত্ব বলা যায় না;—সে দাসত্ব বরং ভাল; মতের দাসত্ব, ভালবাসার দাসত্ব, বড় ভয়ানক জিনিস। মতের দাস-ব্যবসা চতুর্দ্দিকে কি ভয়ানক আধিপত্য করিতেছে, একবার দেখ। তুমি আমার মতে যখনই সায় না দেও, তখনই আমি তোমার উপর চটিয়া যাই। গুরু শিষ্যে এই প্রকার কত কাটাকাটি চলিতেছে। দলে দলে মতের মিল না হওয়ায় কত রক্তা-

রক্ষিত হইতেছে! তোমার মতে না সায় দিলে আর তুমি আমার সাহায্য করিতে চাও না। পৃথিবীর প্রচলিত মতে সায় না দিলে, অমনি পৃথিবীর দয়ার-কুটীরে চাবি পড়িয়া যায়। খ্রীষ্ট যখন সকলের মত রক্ষার জন্য আপনার মতকে বলিদান দিতে অস্বীকার করিলেন, তখন পৃথিবীর লোকেরা খ্রীষ্টের বুকে শেরেক বিদ্ধ করিয়া শোণিত পান করিল! এবং সেই হইতে যে জন আপন পথে, আপন মত লইয়া একাকীত্ব বা বিশেষত্ব সাধন করিতে গিয়াছে, সেই প্রাণে মরিয়াছে! কত সহস্র সহস্র খ্রীষ্টের রক্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিতেছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? এমনই অদ্ভুত অবস্থা এই পৃথিবীর। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আর সকল সাধনা সহজ, একাকীত্ব সাধনই কঠিন। ধন-লোলুপ দস্যুর হস্ত হইতে ধনের মায়া রক্ষা করা সহজ, রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের হাত এড়াইয়া জীবন রক্ষা করা সহজ, কিন্তু স্বাসত্ব-লালায়িত পৃথিবীর মতকে উপেক্ষা করিয়া বনবাস করা বড়ই কঠিন। গ্যালিলিও কত উপহাস ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন, কে না জানে? তবেই দেখ, কত লোকাঘাত, কত নির্যাতন সহ্য করিতে পারিলে তবে বিশেষত্ব সাধন হয়! কত জনের মুখশ্রী ভুলিতে পারিলে তবে একাকী হওয়া যায়;—কত মমত্ব, কত ভাল-বাসাকে, কত সাহায্যকে উপেক্ষা করিলে, এমন কি প্রাণ-মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিলে তবে একাকী হওয়া যায়! এ কঠোর সাধনায় জয়ী হইতে অল্পেই পারে। কিন্তু জয়ী হইতে না পারিলেও নিস্তার নাই,—পৃথিবীতে স্বর্গের আশা নাই, মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। ধ্রুবই হউন, আর প্রহ্লাদই হউন, খ্রীষ্টই হউন, আর শাক্যই হউন, একাকী বিশেষত্বের বিজন-পথে না যাইলে আর সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। সংসারে ভীষণ গহন অরণ্য সৃষ্টি করিয়া কঠোর তপস্যা না করিলে আর মঙ্গলের আশা নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতেছে, দিবসের পরে দিবসের অভিনয় শেষ হইয়া যাইতেছে,—একাকী যাইবার পথ, ঐ দেখ, মানুষের সম্মুখে আসিতেছে! যে একাকী আসিয়াছে, সে কি চিরকালই কোলাহলে মজিয়া, বহুত্বে ডুবিয়া রহিবে? মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম কি সকলই জলে মুক্তা নিক্ষেপের ন্যায় চিরকাল ব্যর্থ হইতে থাকিবে? না—প্রকৃতির বিধান তাহা নহে। মানুষ কি চিরকালই দলাদলির বাজারে মুগ্ধ হইয়া বিশেষত্বের দিব্যপ্রেম ভুলিয়া থাকিবে?° তাহা অসম্ভব। একাকী যে আসিয়াছে, একাকী যাইবার

জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। দিন যাইতেছে, রজনী আসিতেছে! রজনী আসিতেছে,—সকলকে ভুলাইতে, সকলকে বিস্মৃতিতে ডুবাইতে। সমস্ত দিবস কলরব, ব্যস্ততা, জনতা; রজনীতে নিস্তব্ধ, নীরব, ও সাম্য ভাব। গভীর রজনীতে কলরব-প্রিয় পাখী জাগিয়া যখন তান ধরে, তখন সে গানে সংসারের ভাব নাই, তাহাতে পরমার্থ ভাব। গভীর রাত্রে যখন মানুষ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তখন কি এক আশ্চর্য্য ভাব মনে জাগিয়া উঠে! চতুর্দ্দিক নীরব, সকল নিস্তব্ধ—যেন কেহই নাই, যেন কিছুই নাই—একাকী সে বিশ্ব মাঝে জাগিতেছে! একাকী সে জনপ্রাণী-হীন অকূল পাথারে ভাসিতেছে! একাকী গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া, তখন সে যে, কি বৈচিত্র্যময়ী মায়া পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে, দেখিতে পায়, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। অবিশ্বাসী সে নীরব নিস্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া অন্তত মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাসী হয়,—মুহূর্ত্তের জন্য ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া যায়। কিন্তু রজনীর পরে আবার দিবস জাগিয়া উঠে যখন, তখন সকল ভাব আবার নিবিয়া যায়। একাকীত্ব ভুলিয়া মানুষ আবার বহুত্বের আদর করে। কিন্তু মহারাত্রি বা কালরাত্রির কথা মানুষ তখনও জানিতে পারে না। জানুক বা না জানুক, বিধাতার লিপিতে মানুষের ভাগ্যে এক অখণ্ড বিধান লিখিত আছে, তাহার হাত আর এড়াইবার যো নাই। মহারাত্রি যখন আসিবে, যখন মানুষের সকল ভেদাভেদ ঘুচিয়া যাইবে—সোণার অঙ্গ শ্মশানে ভস্ম হইবে—সকল নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, তখন স্বর্গ লাভ বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে। সে বিধান যে মানুষের এড়ানের যো নাই, সে মানুষ কেন জীবন থাকিতে একাকীত্ব সাধন করিবে না? একরূপ, একভাব, এক জ্ঞান, এক ধ্যানে নিমগ্ন হইতে না পারিলে মহেশ্বরের লীলায় কে মজিতে পারে? সংসার মায়া, অবিদ্যার খেলা ভুলিতে না পারিলে কে মহামায়াকে বুঝিতে পারে? সকলের ভিতরেই একরূপ, এক ভাব, এক জ্ঞান, এক শক্তির ক্রীড়া যে না দেখিতে পায়, সে কেমনে দ্বেষ হিংসার দাসত্বের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে? বিশ্বপ্রেম না বুঝিলে, মানুষ কেমনে অন্ধ প্রেম ভুলিবে? এই জন্যই বলিতেছিলাম, এ সাধন অতি কঠোর সাধন। কিন্তু হউক কঠোর, এ সাধনায় জয়ী হইতে না পারিলে আর কিছুতেই কিছু হইবে না। কূল না ছাড়িলে অকূলে ভাসিতে পারিব না, জাল না ছিঁড়িলে, কলাবলি-মুক্ত উদার বিশ্ব-প্রেম-সাগরে ডুবিতে পারিব না, সংসার মমতার জাল না ছিঁড়িতে

পারিলে স্বর্গ বা মুক্তির অধিকারী হইতে পারিব না ;—মানুষের আসক্তির জাল ছিন্ন না হইলে বৈকুণ্ঠ বা ঈশ্বর লাভ হইবে না। কিন্তু মানুষের কি সাধ্য যে এই অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে ?—যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপায় সিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছেন। সে বুদ্ধও নাই, আর সে খ্রীষ্টও নাই। আজ মানুষ দলাদলির আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে। সংসার মায়া বিষম মায়া ; এ মায়াকে ছিন্ন করিতে না পারিলে, এ সাধনার জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। ক্রুশ-কাষ্ঠকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত যে প্রস্তুত হইতে না পারে, তাহার পক্ষে এ সাধনায় জয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভগবানের কৃপা ভিন্ন কে মৃত্যুর কঠোর হস্তে পড়িয়াও প্রসন্নভাবে শান্তি-সুখে থাকিতে পারে,—বিষকে সুধা বলিয়া ধরিতে পারে, কষ্ট দুঃখকে সুখ বলিয়া বুঝিতে পারে ? কিন্তু ভগবানের কৃপা ভিন্ন, কে অসারের ভিতরের সারকে ধরিতে পারে,—প্রলোভনের অতীত হইতে পারে ;—সংসারসুখকে অসুখের হেতু জানিয়া তৃণের ন্যায় তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে ? কৃপাময়ের কৃপার সাধনা কর, তবেই একাকীত্বে সুখ পাইবে। একমনে, এক ধ্যানে মগ্ন হও। অকূল পাথারে তিনি আর আমি ; কেবল আমি আর তিনি। এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইলেই দলাদলি বা ঘৃণা বিদ্বেষের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। করুণাময় এই কঠোর সাধনায় আমাদিগের সহায় হউন।

বাসনার উচ্ছ্বাস।

মানুষ যতই সূক্ষ্মদর্শী হউক না কেন, সে কখনই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে না। সংসারের সর্ব্বত্রই শুনা যায়, যাহার মন পাইবার জন্ত সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিলাম, সেও আমাকে চরণে ঠেলিল। পৃথিবীর পোনে ষোল আনা ঝগড়া বিবাদের কারণ, মানুষ মানুষকে প্রকৃত ভাবে চিনিতে না পারায় ফল সমুৎপন্ন। এই যে মানুষ মানুষকে প্রকৃতপক্ষে চিনিতে পারে না, ইহারও গভীর কারণ আছে। মানুষ কি ভাবিয়া, কি উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্য করে, তাহা মানুষের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন। সকলেই আপন বুদ্ধির চালনা করিয়া, আপন প্রকৃতির প্রতিবিম্ব বা ছবি অন্যের মধ্যে দেখিতে চায় ;—অথবা যাহার মন যেরূপ, সে অন্যকেও সেইরূপ দেখিতে ভালবাসে। তাহার প্রকৃতি যতই বিভিন্ন হউক না, সে বিভিন্ন প্রকৃতির

ভিতরেই আমার পদতুলনা প্রভৃতি দেখিতে চাহিবে। এইজন্য, যে যে প্রকার,—সে অন্যকেও সেই প্রকার দেখে। একজন মন্দলোক একজনের সাধু অভিপ্রায়ের মর্ম্মভেদ করিতে পারে না। একজন ক্ষুদ্র লোক একজন প্রকৃত সৎ লোকের মহত্ত্ব যেমন বুঝিতে পারে না, একজন মহৎ ব্যক্তি এক জন ক্ষুদ্র লোকের মন্দ অভিপ্রায় তেমনই বুঝেন না। শিশুর হাসির মর্ম্ম, বালক বুঝে না। শিশুর হাসি দেখিয়া বালক কল্পনা করে, আমি যে কারণে হাসিতেছি, শিশুও সেই কারণেই হাসিতেছে। কিন্তু উভয়ের হাসির কারণ কত পৃথক্, কত বিভিন্ন! এই প্রকার, পুরুষের মহত্ত্ব, রমণীর কল্পনায় ভিন্ন মনে স্থান পায় না; রমণীর মহত্ত্ব পুরুষ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিতে পারে না। পুরুষ, স্ত্রীকে পুরুষত্বে রূপান্তরিত করিয়া, চিন্তা করে; স্ত্রীও পুরুষকে স্ত্রীদের মনোমোহিনী চিত্র আঁকিয়া মোহিত হইতে চায়। যে যাহা নয়, তাহাই লোকে তাহাকে ভাবে; ভাবিয়া যখন প্রতারিত হয়, তখনই মহা বিবাদ বাধে;—বৈষম্য-সঙ্গীতের উচ্চরবে মানবকণ্ঠ বিদীর্ণ হয়। তোমাকে আমি আমার ছবিতে দেখি;—তুমিও আমাকে তোমার ছবিতে দেখিতে চাও। মানুষের বিভিন্ন রূপ, মানুষের প্রাণে সয় না। মানুষ বুঝিয়াও বুঝে না যে, পরস্পর সকলে বিভিন্ন না হইলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার কোনই আকর্ষণ থাকে না। এই জন্যই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত ছবি, মানুষের নিকট চিরপ্রচ্ছন্ন। এ গভীর রহস্য কেন? প্রকৃতি কেন এমন হইল যে, এক জনের জন্য, একজনের মহত্ত্ব অন্যে বুঝিবে না? কেন প্রেমিক জ্ঞানীকে ঘৃণা করেন, জ্ঞানী ভক্তকে তুচ্ছ করেন? আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক পাই না,—এ গভীর রহস্যের গভীর মর্ম্মভেদ করিতে পারি না।

মানুষ, প্রকৃত প্রস্তাবে যেন মানুষের জন্য নয়,—তুমিও যেন আমার জন্য নও, আমিও যেন তোমার জন্য নই। আর একটা কি যেন উদ্দেশ্য আছে। অথচ তোমার কাছে আমি থাকিতে সুখ পাই, তুমি আমার কাছে বসিতে ভালবাস। কি এক অপরূপ ছবি, কি এক অদ্ভুত ধ্বনি প্রত্যেকের ভিতরে রহিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেককে প্রত্যেকের অনুরক্ত করিবেই করিবে। কত পার্থক্য, কত বিভিন্নতা, কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তবুও স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের জন্য স্বামী কত ব্যাকুল,—মাতার হাসির জন্য শিশুর মন ব্যাকুল,—শিশুর অস্ফুট হাসির জন্য মাতা লালায়িত। তোমাকে ত প্রকৃত প্রকারে চিনিতে পারিতেছি না—তুমি যখন কোল পাতিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে

চাহিতেছ; আমি তখন তোমাকে স্বর্গের দ্বার বলিয়া ভ্রম করিয়াছি, কিন্তু সব ত ছাই, তবুও তোমার জন্য আমি লালায়িত কেন? তুমিও আমার প্রাণ ভাণ্ড হইতে কত সুরভিসলিলের অঙ্কুর বাহির করিয়া কত মিথ্যা রচনা করিয়াছ, কিন্তু তবুও তুমি আমার সংসারের জন্য কেন অস্থির? মানুষ যে মানুষের জন্য অস্থির, তাহাতে আর কোনই ভ্রম নাই। তাহা না হইলে পৃথিবী শূন্য পড়িয়া থাকিত,—গৃহ শূন্য, গ্রাম শূন্য,—দেশ শূন্য—নগর শূন্য। মানুষ মানুষের জন্য লালায়িত না হইলে, কখনই এত কষ্ট যন্ত্রণা সহিয়া, এত বিপদ ভার বহিয়া সংসার পাতিত না। এই অস্থিরতা কেন?—এই ব্যাকুলতা কেন?—কে উত্তর করিবে, কেন?

মানুষের কি লক্ষ্য আছে, কি উদ্দেশ্য আছে, মানুষ তাহা বুঝে না। আমার বোধ হয়, এই যে বৈষম্য, ইহারই মধ্যে সাম্য আছে। জ্ঞানালোক সকলকে পৃথক পৃথক বুঝায়, প্রেমান্ধকার সকলকে এক করিয়া মিলাইতে চায়। প্রেম, সকলকে এমন করিতে চায়, যেন গাঢ় আঁধারে সকল ঢাকা। আঁধার কি? না—ঘনীভূত ছায়া। প্রেম, সকলকে এক ঘনীভূত ছায়াতে পরিণত করিতে চায়। প্রেমের জন্য সকলেই লালায়িত, সুতরাং বিভিন্ন হইয়াও লোক একত্ব, সমত্ব চায়। কিন্তু তাহার ভিতরে যে কাব্য আছে, একথা জগৎ বুঝে না। আঁধারের ভিতরও জ্যোতি আছে। জ্ঞানে যদি একটু জ্যোতি থাকে, প্রেম-আঁধারে তবে আরো জ্যোতি আছে। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। জ্ঞানে বিভিন্নতা; প্রেমে একতা—একাকার। একাকারই ছায়া বা আঁধার। পথক্লিষ্ট রৌদ্রদগ্ধ পথিক ক্ষুধা-কাতর হইয়া যখন শীতল বট ছায়ায় আশ্রয় লয়,—সুধু সেই জানে, তখন সে কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, সেই শূন্য, সেই কিছুই নয়, সেই ছায়া প্রদান করে, কে না জানে? ঘোর নিদাঘ যামিনী, বৈশাখ-যামিনী, কৃষ্ণপক্ষীয় আঁধার আসিয়া যেদিন যখন পৃথিবীতে রাজত্ব বিস্তার করে, তখন অনন্ত-পুলক মানব তাহারই ভিতরে যে কি এক অপূর্ব জ্যোতি দেখে, কে তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে? পৃথিবীর ঘোর বৈষম্যের নরনারীর মধ্যে বাস করিয়াও মানুষ যে কি সুখশান্তি পায়, কে বুঝে? বিজ্ঞান দর্শনের কথা এখন দূর হউক। এই পৃথিবী, শীতল বট ছায়ার ন্যায়। ইহাকে যে কেবল শূন্য বলে, সে মূর্খ। তুমি কায়া, আমি ছায়া—সকলই ছায়াময়। তোমার ছায়াতে আমার উদ্ভব হউক, আমার ছায়ায় তোমার অশান্তি দূর হউক।

তুমি কে, আমি কে?—আমরা ছায়া। কিসের ছায়া, কার ছায়া? ছায়ার পশ্চাতে বট গাছের ন্যায় কিছু না থাকিলে কে ছায়া বাড়াইতে পারে? তোমার তুমিত্ব আমি ব্যাখ্যা করিতে পারি না, আমার আমিত্বও তুমি বুঝ না—কিন্তু তবুও আমরা আছি। যাহা আছে, তাহারই উদ্দেশ্য আছে, তাহাই শূন্য বা কিছুই-নয় নহে। কি আছে, কে আছে, গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, ছায়ার পশ্চাতে এক অবিনশ্বর কায়া আছে;—তাই ছায়াতে বাধা বাঁধে। কেবলই ছায়া ভিন্ন আর কিছুই কি গণনা করিতে পার? তাহা তোমার অসাধ্য। তুমি তোমার ভাব-বই আর কিছুই বলিতে পার না। যাহা দেখিতেছ, উহা যে তোমার দেখারই অনুরূপ, তাহা ঠিক বলিতে পার না। যাহা শুনিতেছ, তাহা যে তোমার শুনারই মত, তাহাও নিশ্চয় জান না। তুমি যাহা যেরূপ দেখিতেছ, আমিও যে তাহা ঠিক সেইরূপই দেখিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয় বলিতে পার না। তোমার সুন্দর আমার নিকট যে সুন্দর হয় এবং আমার ভাল যে তোমার নিকট মন্দ নয়, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। ভাল মন্দ সকলই মনের একটী অবস্থা;—পাপ পুণ্য মনের অবস্থা বই আর কিছুই নহে। তবেই দেখ,—সকলই ছায়ার ন্যায়,—অবস্থাভেদে, পাত্রভেদে, সময়ভেদে, বায়ুভেদে, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন কায়া ধরিতেছে,—তোমার ও আমার নিকটে। অথবা ছায়ার ভিতর হইতেই কায়া ফুটিয়া পড়িতেছে। গগন-স্পর্শী বটবৃক্ষ না থাকিলে শীতল ছায়া কখনই পৃথিবীর অশান্তি হরণ করিতে পারিত না। সকল ছায়ার পশ্চাতেই কায়া লুক্কায়িত। সেই কায়ার মায়াতেই আমরা ঘুরিতেছি, উঠিতেছি, বসিতেছি। সেই কায়ার মায়াতেই আমরা সংসার-পাথারে বিচরণ করিতেছি। কায়া ভিন্ন ছায়া নাই—তুমি নাই—আমি নাই। কায়া ভিন্ন আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু কায়া কি? কে জানে কি?—ক্ষুদ্র মানুষ কেমনে জানিবে, কায়া কি? কিন্তু এক-জন যে আছেন, তাতে সন্দেহ নাই। এক জনের, এক কায়ারই ছায়া—এই পৃথিবীর অসংখ্য জীব জন্তু, পশু পক্ষী, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া সমস্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে কিসের অহঙ্কার? মানুষ যদি কেবলই কায়ার ছায়া, তবে মানুষের অহঙ্কার কিসের? অহঙ্কার—একমাত্র কায়ার। কায়াকে ভুলিলে যে অহঙ্কার থাকে, তাহা কিছুই নহে,—তাহা নরক,—তাহা অসার। আর মহারাজাধিরাজ বিশ্বপতির ছায়া তুমি, ইহা ভাবিয়া যদি আত্মা-

তিরোহিত হইয়া যায়, হয়, আপনি যাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিব, তুমি যাঁহার কায়া, আমিও তাঁহারই ছায়া ;—যে কিছু তোমাতে দেখিতেছ, উহা অবস্থা ও সময়ের ঘোর ফের মাত্র ;—তোমার আমার তেজের বা বাসনা-শক্তির বেগ মাত্র ;—তুমিও যাঁহার ছায়া, আমিও তাঁহারই ছায়া। কিন্তু ছায়াই কায়া নহে, মনে রাখা উচিত। বড় বড় পণ্ডিতেরা এই স্থানে একটী ভুল বুঝিয়া গিয়াছেন ;—ছায়াকেই তাঁহারা কায়ার ন্যায় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা মহাভুল। কায়া ও ছায়া পৃথক। সকল ছায়াই একরূপ,—বটের ছায়া ও বিজনের ছায়াতে বিভিন্নতা নাই ;—সবই অনন্তের প্রতিবিম্ব। ভেদাভেদ, অশান্তি, অপ্রেম, কুজ্ঞান, কুতর্ক, এ সকল শরীর চিন্তাশীলের নিকট কি আর স্থান পায় ?—সেখানে সব একাকার।

আমার বড় ইচ্ছা, আমি যে ছায়া, ইহা আমি প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে পারি। ছায়াকে যেরূপ লোকে শূন্য বলিয়া মনে করে, আমার বড় ইচ্ছা, আমিও সেইরূপ শূন্য হইয়া, আমিত্ব ভুলিয়া পড়িয়া থাকি। তাহাতে ডুবিয়া আমার সকলই শূন্য হইয়া যাইবে ;—অনন্ত বিশ্ব-ছায়াতে বিন্দু-ছায়া মিলাইয়া যাইবে। বাসনা এই, আমার হৃদে যেন সাড়া শব্দ নাই,—শরীরে স্পন্দন নাই,—হৃদয়ে সুখবিলাস নাই,—শোক দুঃখ নাই, ইচ্ছা কামনা নাই, তাঁহাতে আমিত্ব ডুবাইয়া পড়িয়া থাকি। ইচ্ছা এই, সকলের প্রাণে ডুবিয়া,—জগতের হৃদয়ে মিশিয়া এমন হইয়া যাই যে, কেহ তাকিয়াও যেন আসক্তিময় পৃথকত্ব না পায়। আমি সকলের হইয়া যাইব—আমার নিজের কিছুই থাকিবে না। আমার অস্তিত্বে তাঁহারই অস্তিত্ব প্রচারিত হইবে, আমার তিরোধানে তাঁহারই মহিমা কীর্তিত হইবে। আত্ম-ঘটকে উড়াইয়া শীতল ছায়া হইয়া বসিয়া থাকি, এই ইচ্ছা। ছায়ার কাজ, পৃথিবীর তাপ-দগ্ধ নরনারীকে কেবল শীতল করা। আমার ইচ্ছা, আমার কাজও তাহাই হউক। আমি করি, আমি ভাবি, আমি উঠি, আমি বসি, এইপ্রকার না ভাবিয়া, ভাবিব,—তিনি করান, তিনি ভাবান, তিনি উঠান, তিনি বসান। ভাবিব, তিনি কায়া, আমি ছায়া। ছায়াতে কায়ার অনন্ত ভাব দেখিব ; কিন্তু ছায়াকেই কায়া বলিব না। কায়া আছে বলিয়াই আমি ছায়া আছি, ইহা ভাবিব। কিন্তু ছায়া না থাকিলে কায়া থাকেন না, ইহা কখনই ভাবিব না। এমনই হইয়া যাইতে ইচ্ছা,—কেহ আমার রূপ দেখিবে না, আসক্তিময় অস্তিত্ব দেখিবে না—আমার শীতল ছায়ায় বসিয়া

সকলেরই অশান্তি, নিরানন্দ ঘুচিবে—সকলেরই মনে বিশ্বাসের কথা জাগিবে। এ ভবন আনন্দের ভবন হইবে, এ আশ্রম আনন্দ-আশ্রম বলে ঘোষিত হইবে। আমার জিনিষে সকলেরই সমান অধিকার হইবে। মানব জন্ম পাইয়া যদি দেবদুর্লভ পরম ধনের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে না পারি, তবে আর কি হইল? এই অসার জীবন-বিনিময়ে যদি সারাৎসারকে হৃদে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তবে আর কি হইল! তাঁহার জন্য আত্ম-বোধকে যদি ভুলাইতে না পারি, তবে আমার জীবন বৃথা, সকলই বৃথা।

নব্যভারত ও রাজনীতি।

"We protest, then, against all inequality, against all oppression, wheresoever it is practised; for we acknowledge no foreigners; we recognise only the just and the unjust; the friends and enemies of the law of God."

"All inequality brings after it a proportional amount of tyranny; wherever there has been a slave, there has also been a master; both distorting and corrupting in all those who see them, the idea of life." *Mazzini.*

"মাথা নাই তার মাথা ব্যথা"—আমাদের দেশের একটী প্রাচীন কথা। নব্যভারতের রাজনীতির কথা যখনই মনে হয়, তখনই এই প্রাচীন কথাটী আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। যে দেশে রাজা নাই; প্রজা নাই, সে দেশের রাজনীতি কল্পনা বই আর কিছুই নহে। ভারতে প্রকৃত রাজার অনুশাসনের পূর্ব্বে, প্রকৃত রাজনীতি কি, আমরা তাহা বুঝিতেও অক্ষম। রাজা কি? না—প্রজাশক্তির সমবেত বল, প্রজাশক্তির হৃদয়ের দেবতা। ভারতের ইংরাজ রাজ—আপনি উত্থিত, নিজ বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহাকে আমরা প্রকৃত রাজা বলি না। যে রাজা প্রজার ভালবাসা বা ইচ্ছানিচয়ের মুখাপেক্ষা করে না, কেবল শাসন-অস্ত্র বলে রাজ্য শাসন করিতে চায়, সে রাজা রাজাই নয়। প্রকৃত রাজভক্তিশূন্য ভারতে রাজনীতি-চর্চ্চা—কল্পনা,—বৃথা আড়ম্বর—বৃথা হই চই। এ দেশে প্রকৃত রাজনীতি সমালোচনার দিন আজও অঙ্কুরিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমরা বহু ভাবিয়াছি, সরল প্রাণে বুঝিয়া লিখিতেছি।

সকল কথা লিখিবার পূর্ব্বে, দুই একটী অবান্তরিক কথার উল্লেখ করিতে চাই। আমাদের দেশে অনেকগুলি সংবাদ পত্র আছে, যাহাতে 'ইংরাজ নীতির' আলোচনা সময়ে সময়ে দেখা যায়। অনেকগুলি সভা আছে, যাহাদের উদ্দেশ্য ইংরাজনীতির আন্দোলন করা। ভারতের সর্ব্বস্থানেই অসংখ্য অসংখ্য ইংরাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতায় তিনটী বড় সভা পূর্ব্বেই ছিল, সম্প্রতি আবার একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য সকলেরই এক প্রকার, লক্ষ্য সকলেরই এক রকম, সকলেরই উদ্দেশ্য—'ইংরাজনীতির আন্দোলন করা।' এক স্থানে এক উদ্দেশ্য লইয়া এতগুলি সভা কেন?—এক সভা থাকিতে আবার নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কেন?—ইহার দুটী কারণ দেখা যায়। একটী কারণ এই,—কোন সভাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না; দ্বিতীয় কারণ, পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিল নাই। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, জমীদার প্রজা, শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদাভেদ দুর্জ্জয় পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছে! এক দলের লোকের সহিত অন্য দলের মিল নাই—এক প্রাণ অন্য প্রাণের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত। যে কারণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন থাকিতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সৃষ্টি, সেই কারণেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন থাকিতে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সৃষ্টি, আবার সেই কারণেই এই তিনটী সভা বিদ্যমান থাকিতেই আবার "নেসন্যাল লিগের" অভ্যুত্থান হইয়াছে। ইহাকে যাঁহারা মঙ্গলের চিহ্ন বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন। আমরা কিন্তু এই অমিল-বাদ এবং এই বৈষম্য-বাদ প্রচারের মধ্যে বড়ই অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি। নেসন্যাল-লিগ যদি তিনটীকে মিলাইয়া একটীতে পরিণত করিতে পারেন, তবে সুখের পরিসীমা থাকিবে না। যতদিন তাহা না পারিবেন, ততদিন আমরা ইহার মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্নই দেখিব।

পূর্ব্বে যে তিনটী সভা ছিল, সে তিনটী সভারই উদ্দেশ্য, ইংরাজনীতির সমালোচনা করা। পূর্ব্বের বিবাদ সমভাবেই চলিয়াছে,—দেশের প্রকৃত অভাব যাহা, তাহা বরং দিন দিন বাড়িতেছে। এই দুর্দ্দশার দিনে আমাদের কার্য্য হইল কি? না—কেবল ইংরাজের নিকট আবেদন করা। দেশের প্রকৃত বল যাহারা, তাহাদের উদরে অন্ন নাই, রোগের ঔষধ নাই, মনুষ্যত্বের বীজরূপিণী শিক্ষার উপায় নাই—একতা নাই, শান্তি নাই, ধর্ম্ম নাই, নীতি নাই—সে দিকে একবার চাহিব না, পাছেই ভুলিয়া একটী

পশ্চাতে সে দিকে দৃক্‌পাত করিব না, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া একবারও তাহা-দের অভাব স্মরণ করিব না,—কেবল অভাবের জন্য আবেদন করিব; আবেদনের উপর ক্রমাগত আবেদনই চলিতেছে! অশ্রুর বন্যা উদ্বেলিত করিতে কত চেষ্টাই হইতেছে! এই শোচনীয় অবস্থা যে আমরা কতকাল নব্যভারতের অস্থি মজ্জাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে দেখিব, কে বলিতে পারে? সম্প্রদায়গত ঘৃণা বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়িতেছে, চরিত্রহীনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাই-তেছে, উদাসীনতা ক্রমেই সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে, অনাত্মীয়তা ক্রমেই দেশব্যাপী হইয়া পড়িতেছে!! আশা কোথায়, কে বলিতে পারে? আশা-শূন্য, উদ্দেশ্য-শূন্য; তবু সভাগুলির কার্য্য চলিতেছে! হায় হায়, কেবল সাহেবের সম্মান বাড়ান ভিন্ন, সাহেবের নিকট পত্র লেখা ভিন্ন আর এমন কোন মহৎ কার্য্য পাওয়া গেল না, যাহা লইয়া এই সভাগুলি কার্য্য করিতে পারেন? মিলনের গুণগানেই মত্ত হও, বা কটনের যশ ঘোষণাতেই বদ্ধ-পরিকর হও, যত দিন ভারতের শক্তি জাগ্রত না হইবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। ভারতের কোটী কোটী নরনারী যতদিন মরণের কোলে, শ্মশানের তলে শয়ন করিয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না।

কথায় শুনি, এই সভাগুলির উদ্দেশ্য, দেশের উন্নতি সাধন করা; কিন্তু কাজে দেখি, ইংরাজের তুষ্টির জন্যই যেন সকলে ব্যস্ত। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। দেশের কোটী কোটী লোক যে ভাষায় অনভিজ্ঞ, সেই ভাষাতে সমস্ত সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। নেসন্যাল-লিগের প্রাণে একটু উদ্দীপনার বেগ উঠিয়াছে, তিনি কয়েকখানি আবেগপূর্ণ, সুন্দর পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। কত আশার কথা আমরা তাহাতে শুনিলাম। কিন্তু তাহারও ভাষা, ইংরাজি। ভারত সন্তানের নিকট যে ভাষা দুর্ব্বোধ্য ভাষা, সেই ভাষায় "Awake" নামক পদ্যটী লিখিত! কতজন লোক পড়িবে, বলত? কজন লোকের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে, বলত? মুখে বলি ইংরাজি ভাষা, পত্রে লিখি ইংরাজি ভাষা, পুস্তকে লিখি ইংরাজি ভাষা; এদিকে কাজ করি, দেশের। এ কেমন কথা, বলত?

এ সকল-কথা এখন থাকুক। আমাদের বিবেচনায়, মূলেই কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। যে ইংরাজ-নীতি সংশোধন করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যে দারুণ ভ্রম রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা বলি, ইংরাজের আইনগুলি যদি সংশোধিত হয়, ইংরাজের সকল অত্যাচার

যদি দমিত হইয়া যায়, ইংরাজ যদি দেশের শাসন বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তবু প্রাণের পিপাসা অতৃপ্ত থাকিবে। জাতীয়-শক্তি গঠনই—আমাদের লক্ষ্য। ইংরাজের অত্যাচার দমিত হইলে বরং আমাদের জাতীয়ত্ব গঠনেরই উপায় আরো দূরে সরিয়া পড়িবে। অত্যাচার, আরো অত্যাচার, আরো অত্যাচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই চাই। অত্যাচার প্রচারিত হয়, ইহা চাই; কিন্তু সংশোধিত হয়, ইহা চাই না। এখনও হৃদয়-স্পর্শী অত্যাচারের জীবন্ত তাড়না উঠে নাই। উঠিলে—সকল সম্প্রদায় মিলিয়া এক হইয়া যাইত, সকল জাতি জাতিত্ব ভুলিত, সকল ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া এক সার্বভৌম একতার ক্ষেত্রে প্রাণে প্রাণে মিলিত। যে যাতনায় প্রাণ ছটফট করে, হৃদয় ব্যাকুল হয়, সে যাতনা আজও উঠে নাই, এই বিষম দুঃখ। পাড়ায় আগুন ধরিলে, কে স্থির বসে, জাতিত্ব বা ব্যক্তিত্ব লইয়া স্থির মনে বসিয়া থাকিতে পারে? সে সময় সকলকে মিলিতেই হয়। দেশে সেইরূপ আগুন না লাগিলে ভারতে মিলন অসম্ভব। অতএব যে ব্যক্তি সে আগুন লাগাইয়া দেয়, তাহাকে ঘৃণা করিও না। এ হিসাবে লীটন ভারতের উপকারী, কি রিপণ উপকারী, তাহা জানি না। রিপণ অতি উচ্চদরের লোক, ধার্মিক, স্বজাতি-প্রিয়, পরদুঃখকাতর, সহৃদয় ব্যক্তি, সন্দেহ নাই, কিন্তু এক হিসাবে ভারতের বন্ধু, রিপণ অপেক্ষা স্বাধীনতা-নাশক লীটন! কারণ লীটন যেমন আগুন লাগাইতে মজবুত, রিপণ তেমন নহেন। একথা অনেকেরই ভাল লাগিবে না, তাহা জানি। কিন্তু স্বদেশের উন্নতির জন্য, যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা না লিখিয়া পারি না; তা ভালই বল, আর মন্দই বল। আমাদের স্থির বিশ্বাস—আয়র্লণ্ডের অমূল্য-রত্ন যথার্থ এমেটের ন্যায় শত শত লোকের শোণিত-পাত যদি ইংরাজেরা না করিত, তবে ঐ হতভাগ্য দেশ আজ এমন করিয়া জাগিতে পারিত না। মাট্‌সিনির প্রচারিত সংবাদ পত্র যাহারা পাঠ করিত, তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইত!—এরূপ জীবন্ত অত্যাচার না হইলে ইটালি আজ স্বাধীনতার মুখ দেখিত না। অত্যাচার যত বাড়ে, ততই লোকের চক্ষু ফুটে। যতই অভাব বোধ জন্মে, ততই অভাব দূর করিবার চেষ্টা হয়। এই ভারতবর্ষে একটু জীবন্ত ভাব দেখিয়াছি—যে দিন বঙ্গের সুসন্তান সুরেন্দ্রনাথ হরিণ-বাড়ীর ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আর জীবন্ত ভাব দেখিয়াছি—যখন মল্হার রাও গুইকোয়ারকে বন্দী করা হইয়াছিল। অতএব একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিতে

হইবে, ভারতের মৃত জাতিকে—নানাদিকে বিচ্ছিন্ন জাতিকে এক সূত্রে বাঁধিবার প্রধান রজ্জু, ইংরাজ-অত্যাচার। যাঁহারা তাহা সংশোধন করিতে বদ্ধ-পরিকর, আমাদের মতে তাঁহারা ভ্রান্ত! তাঁহাদিগকে হিতৈষী বলিয়া শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভারতের বন্ধু বলিয়া কখনই তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিনা। বিদেশের রাজা—কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। দুই চারি দিনের জন্য বাঞ্ছনীয় হয়, হউক, কখনই চিরকালের জন্য, জাতির লক্ষ্য তাহা হইতে পারে না। এই জন্য, জাতির লক্ষ্য, ইংরাজ-নীতি সংশোধন হইতে পারে না। পুণ্য-প্রসূ ভারতের সর্ব্বস্ব—নীতি আর ধর্ম্ম, একতা আর সাম্য—সব গিয়াছে কেবল অধীনতার তাড়নায়। কিন্তু হায় আবারও অধীনতার সময় বৃদ্ধির জন্যই চেষ্টা হইতেছে! ভারতের পরিণাম কি, কে বলিবে?

দেখিয়া শুনিয়া আমরা কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছি। ১২৮৩ সালে দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনের পূর্ব্বে তীব্র সমালোচনা করিয়াও সম্পাদকগণ নিমন্ত্রণ পাইয়া, সেই ভীষণ যজ্ঞে আহুতি দিতেই উন্মাদে, সেই প্রাণ-নাশী মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষের সময়ে দিল্লীতে গিয়াছিলেন। আর এখনও ইংরেজ-নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াও দেশের বড় বড় হিতৈষীগণ একটু আদর পাইলে, একটু মর্য্যাদা পাইলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ইংরাজ সহবাসের জন্য লালায়িত হন! এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছি। কথায় এবং কাজে মিল বড়ই কম। সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশ হয়, ইংরেজেরা তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, কারণ তাহারা জানে, খোসামুদী পাইলেই সকলে আপন আপন মত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত; কারণ তাহারা জানে, সংবাদ পত্রের মতামত দ্বারা বড় একটা এ দেশীয় লোকেরা চালিত হয় না। আমাদের এক স্বার্থ, টাকা; আর এক স্বার্থ, যশ। এই দুই স্বার্থই আমাদের অনেক কাজের পরিচালক। যেখানে অপমান, যেখানে নির্যাতন, যেখানে তীব্র সমালোচন, সেখানে যাইতেও আমরা কুণ্ঠিত। এমন কয়জন হিতৈষী আমাদের দেশে আছেন, যাহারা, মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, দীনহীন অন্নক্লিষ্ট, দুঃখক্লিষ্ট, বস্ত্রহীন অর্দ্ধ উলঙ্গবৎ ঐ মাঠের কৃষকের সহিত একাত্মক হইয়া যাইতে একটুও সঙ্কুচিত নন? কয়জন শিক্ষিত লোক, অশিক্ষিতের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত নন?—কয়জন ধনী—দরিদ্রের মাদুরে উপবেশন করিতে একটুও লজ্জিত

মন্? হৃদয় কোথায়? তাহা হৃদয়ে। প্রকৃত হৃদয়ের পরিচয় দেখিতে চাও, ঐ আগত ইটালির পানে একবার তাকাও। যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অসংখ্য অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, রাজ্যের পর রাজ্যলাভ করিয়া ঐ বীর গ্যারিবল্ডি সমস্ত রাজ্য, ভিক্টর ইমানিউএলের হাতে উৎসর্গ করিয়া, ঐ দেখ, দরিদ্রের বেশে কাপেরায় (Caprera) ফিরিয়া যাইয়া হল চালনা করিয়া দিনপাত করিতেছেন; বছরের উপর বছর! চতুর্দিক হইতে উপহার আসিতেছে, গ্যারিবল্ডি, মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তাহা অম্লান বদনে অষ্ট্রিয়ার আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার জন্য পাঠাইয়া দিতে বলিতেছেন। যে অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারে এক দিন তাঁহার সর্ব্বশরীরে রুধির প্রবল বহিয়াছিল—যাহাদের পাশব অত্যাচারে প্রাণপ্রিয়া, যুদ্ধ-সঙ্গিনী এনিটার অকাল মৃত্যু-যন্ত্রণার তীব্র যাতনায় তাঁহাকে মুহ্যমান হইতে হইয়াছিল, তাহাদের জন্যই সমস্ত উপহার পাঠাইতে বলিতেছেন। বীরত্ব কি গ্যারিবল্ডির বাহুতে? না, বীরত্ব—গ্যারিবল্ডির হৃদয়ে। হায়, হায়, সে মৃতোক্ত হতভাগ্য ভারতে কোথায়? বীরের বীরত্ব—হৃদয়ীর হৃদয়ত্ব—সব শ্মশানে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। স্বার্থান্ধ হতভাগ্য ভারতের দল, একতা ভুলিয়া, সাম্য ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া, নীতি ভুলিয়া পশুর অভিনয় দেখাইয়া উন্মাদে নৃত্য করিতেছে। পরের কুৎসায় সংবাদ পত্র পূর্ণ,—ঘৃণা বিদ্বেষের আগুন ঘরে ঘরে জ্বলিতেছে। রাজা নাই, প্রজা নাই, সমাজ নাই, ধর্ম্ম নাই। কিছুই নাই। রাজনীতির কথা মনে হইলে, আমাদের প্রাণ অস্থির হয়। কিসের আলোচনা করিব? কার কথা বলিব? কিছুই নাই। হৃদয় নাই যে হৃদয়ের কথা বলি, প্রকৃত সমাজ নাই যে সমাজের কথা লিখি। সব শ্মশান, সব ভস্মময়। ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া উল্লাস বা আনন্দ কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। তাই দুঃখে বসিয়া কাঁদিতেছি; আর বিধাতাকে ডাকিতেছি। যাহার কৃপা ভিন্ন ভারতের আর গতি নাই, তাঁহারই চরণে পড়িয়া রহিয়াছি। তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম আর রাজনীতিকে জগতের লোকেরা দুই ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি একথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—এই দুইয়ের ঘনীভূত যোগ—মেশামেশি ভাব। ধর্ম্ম ভিন্ন রাজনীতি—স্বেচ্ছাচার-নীতি। ধর্ম্ম কি? না মানবীয় সকল শক্তির বিকাশ। ধর্ম্ম কি?—না জ্ঞান, প্রেম আর ইচ্ছার মিলন-বিকাশ। প্রেম ভিন্ন একতা

নাই, জ্ঞান ভিন্ন সাধ্য অসম্ভব—ইচ্ছা ভিন্ন কার্য্য ঘটে না। আর এই তিনের মিলন ভিন্ন, মানব, পবিত্রতা পায় না—চরিত্রবান্ হইতে পারে না। এই তিন মিলিয়া যে হৃদয়ে এক হইয়া গিয়াছে—সেই হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তি অবতীর্ণ। যে দুর্ব্বল তেজের স্ফুলিঙ্গের নিকট জগৎ তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে। জ্ঞান ভিন্ন প্রেমের উদয় অসম্ভব, আর প্রেম ভিন্নও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, আবার জ্ঞান ও প্রেম—কেবল কল্পনায় থাকিয়া যায়, যতক্ষণ না তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। ভারতের উদ্ধারের জন্য এই তিনের মিলন, সামঞ্জস্য-সাধন বড়ই প্রয়োজনীয়। ভেদাভেদ নাশ করিতে, বৈষম্য ঘুচাইতে,—একতা আনিতে, ঐ জ্ঞান, প্রেম, আর ইচ্ছা ভিন্ন আর গতি নাই। এদেশে যে সভার প্রয়োজন নাই, সংবাদপত্রের প্রয়োজন নাই, একথা আমরা বলি না। এ সকলেরই প্রয়োজন আছে—কেবল জ্ঞান আর প্রেম প্রচারের জন্য। ইংরাজ অত্যাচার নিবারণের জন্য এ কিছুরই প্রয়োজন নাই।
* সভা করিয়াছ যদি, তবে যাও, গ্রামে গ্রামে স্কুল বসাও, সাধারণ শিক্ষার জন্য যত উপায় আছে, অবলম্বন কর। দরিদ্রের ঔষধ যোগাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে ডিসপেন্সারি বসাও,—পবিত্রতার জন্য নীতি-রক্ষিণী সভা কর। জ্ঞান ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন, প্রেম ভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। ফরাসী বিপ্লবের শোচনীয় ফল দেখিয়া একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। জাতীয় ধর্ম, এবং জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনে প্রাণপণ বদ্ধপরিকর হও; কারণ ধর্ম্মের মিল এবং ভাষার মিল, জাতীয় একতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। শূদ্রের প্রতি উপেক্ষার ভাব যত দিন, ততদিন প্রকৃত কার্য্য কিছুই আরম্ভ হইবে না। ইংরাজের সহিত যে যুদ্ধ বাধিবে, তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে, এখন নিজের পরিবারে, নিজের দেশের সহিত আগে যুদ্ধ বাধাও। প্রজা-শিক্ষার পূর্ব্বে ঐ প্রজা সভার কোনই মূল্য নাই, কোনই অর্থ নাই। উহার দ্বারা উপকারিতা অতি অল্প। তাহারা কি বুঝে, কি জানে? হইচই করাইয়া বাহাদুরি দেখাইলেই দেশ উদ্ধার হয় না। খাঁটি জিনিষ চাই। খাঁটি জিনিষের জন্য সকলকেই চেষ্টা করা উচিত। বাঙ্গালার জাপানীদিগের অভ্যুত্থান দেখিয়া আমাদের প্রাণে একটু আশার শিখা জ্বলিয়াছে, তাই এত গুলি প্রাণের কথা বলিলাম। প্রাণের সুপ্ত শিরা গুলি একটু জাগিয়াছে, তাই উচ্ছ্বাসে এত কথা লিখিলাম। অনুকরণ ছাড়িয়া, জাতীয় শক্তি গঠনে সকলে চেষ্টিত হউন। জাতীয় গঠনের মূলে

বৈষম্যকে ছিন্ন করিতে হইবে। প্রকৃত প্রেম ও জ্ঞানের প্রাবল্য ভিন্ন তাহা অসম্ভব। জ্ঞান ও প্রেমের মূলে পবিত্রতা চাই। এই সকলকে লক্ষ্য করিয়া, সত্য, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রেমের আদর্শ বিশ্ব-বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া অগ্রসর হউন; নিশ্চয় সুফল ফলিবে। দেশ উদ্ধার রূপ মহাযজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া, কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হউন। এক দিনে নহে, দুদিনে নহে, শত বৎসর পরে তবে সাধনার সুফল ফলিবে। ঈর্ষা ও অহংকারকে দমন করিয়া, স্বার্থ ও যশ মানকে ডুবাইয়া, এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইলে, অবশ্য সুফল ফলিবে। নচেৎ যেমন অন্যান্য সভার দশা হইয়াছে, ইহার দশাও তাহাই হইবে। সম্প্রদায় ভাঙ্গিতে যাইয়া ইহাই আর একটী সম্প্রদায় হইবে,—বৈষম্য নাশ করিতে যাইয়া আরো বৈষম্য সৃষ্টি করিবে। বাহিরের হুজুগের দিকে—প্রশংসার দিকে, ইংরাজ নীতির দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়া সত্য জাতীয় শক্তির মূলে জলসেচনে প্রবৃত্ত হউন। বিলাত-আন্দোলনে কি হইবে, গৃহ যদি শ্মশানই রহিয়া যাইল। ভারত-শ্মশানকে পুণ্য ও পবিত্রতা বলে নবজাতির বাসস্থান করিয়া না তুলিতে পারিলে আর মঙ্গল নাই। এই সব সভাতে অনেক হৃদয়বান লোক আছেন বলিয়া এত কথা লিখিলাম। একটুও যদি কথা গুলি কাজে লাগে: দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। বিধাতা বাঙ্গলার-দেশপ্রাণ-দিগের কাণে এই শুভ বার্ত্তা প্রচার করিয়া মৃতসঞ্জীবনী শক্তিবলে সকলকে দীক্ষিত করুন। তাহাতে শুভ দিনের অভ্যুদয় দেখিয়া আমরা আনন্দে নৃত্য করি। কিন্তু হায়, সে দিন কি আসিবে? প্রতিধ্বনিও নিরাশার সঙ্গীত গাইয়া বলে—হায়, সে দিন কি আসিবে?

আমাদের নিম্নশ্রেণী ও দুর্ভিক্ষ।

অনেক গভীর চিন্তাশীল পণ্ডিতের বিশ্বাস, সমাজের উচ্চতম অংশ উন্নত হইলে, ক্রমে সেই উন্নতি, আপামর-সাধারণের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে সং-ক্রামিত হইয়া পড়ে। কেবল উন্নতি নহে, তাঁহাদের অর্জিত অবনতিও সময়ে নিম্নশ্রেণীকে আক্রমণ করে। উচ্চতম শ্রেণী শিক্ষিত হইলে, তাহা-দেরই প্রসাদে, নিম্ন-শ্রেণী শিক্ষিত হইয়া উঠে। উচ্চতম শ্রেণী যত, নিম্ন-

শ্রেণীকে অধিকার করে । আবার পরাজয়ে দেশের উর্দ্ধতন শ্রেণী নিম্নাব- নত হইলে,—হিন্দুপরাজয় হইলে, নিম্নশ্রেণীর বিজাতিয় ও বিপ্লবভাব হইয়া উঠে । এই সম্বাদ বিষাদের ফলেই, আমাদের দেশের বর্ত্তমান এখনও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন । বাঙ্গালার উর্দ্ধতন ও মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, পূর্ব্বে এই চেষ্টাই ছিল ; ধারণা ছিল, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা কালে নিম্নশ্রেণীকে তুলিতে সক্ষম হইবে । কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইতে না হইতে দেখা গেল, মানবসমাজের এ সাধারণ সত্য, হতভাগা বাঙ্গলার সুফল প্রসব করিল না । উচ্চশিক্ষা পাইয়া কোথায় মধ্যশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে তুলিতে চেষ্টা করিবে, না, দেখা গেল, শিক্ষার জোরে সভ্যতা ও উন্নতি লাভ করিয়া, তাহারা ক্রমে নিম্নশ্রেণীকে আরো ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইলে, দেখা গেল, শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে, ভয়ানক ঘৃণা বিদ্বেষের যুদ্ধ চলিতেছে । শিক্ষিত শ্রেণী, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে দারুণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল । এই প্রকার ভাব দেখিয়া, সহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বলিতে- ছিলেন,—"বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর আবার উন্নতি হইবে ? যাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় জ্ঞান করি,—স্বার্থ সাধনের উপায় স্বরূপ মনে করি, তাহাদিগের আবার গতি ফিরিবে ? সাহেবেরা আমাদিগকে ঘৃণা করে বলিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা নিম্নশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি !! হায়, শিক্ষিত শ্রেণীর এতই অহঙ্কার, এতই অভিমান ; দেশের শক্তি যাহারা, আশা ভরসা স্থল যাহারা, তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন । হায়, এই নগণ্য [illegible]দের আবার উন্নতি হইবে ?" বলিতে বলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল পড়িল, বাকশক্তি রুদ্ধ হইল । বাস্তবিকই দেশের অবস্থা এই রূপ । ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিয়া দেখিলাম, তাঁহার বাক্যের প্রতি অক্ষরে গভীর সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে । এই যে আমরা, নিম্নশ্রেণীর উন্নতির জন্য আজ কাল আন্দোলন করিয়া ফিরিতেছি, আমরা কি নিম্নশ্রেণীর লোক- দিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করিয়া থাকি ? মনে করি কি যে, ইহাদের মধ্যেও আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল গুণ লুক্কায়িত আছে ? মনে করি কি যে, তাঁহাদের মধ্যেও এমন বিশেষ ভাব আছে, যাহা আমাদিগে-

ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। মনে করি কি যে, সমাজে আমাদের যেমন প্রয়োজন, তাহাদেরও তেমনি প্রয়োজন। মনে করি কি যে, তাহাদের শ্রম ব্যতীত কিছু আমরা জীবন ধারণে অসমর্থ। কেবল বিদ্যালয়ে না পাইয়াও কৃষক-নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি শিক্ষিত হইতে, ইহা মনে করি কি? যদি মনে না করি, তবে ইহা নিশ্চয়, তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে আমরা দেখিয়া থাকি, কেবল পৈতৃক-নাম রাখার জন্য, তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকি। হায়, মানুষের সংকীর্ণতা দেখিলে চক্ষের জল সম্বরণ হয় না। যে শিক্ষার শেষ নাই, সে শিক্ষার আবার অভিমান? দুই বস্তুর অনুভব যখন ভাবি, তখন মনে হয়, মানুষ জীবনকালে কি তাই শিক্ষা করিতে পারে!! অনন্ত নক্ষত্রপূর্ণ সান্ধ্য গগনের পানে যখন চাহিয়া দেখি, তখন মানুষের শিক্ষাকে নিতান্তই বিদায় দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষ, দুই জগতের অতি অল্পই শিক্ষা করিতে সক্ষম। মূর্খ ও অজ্ঞানীর নিকটে কি শিক্ষার কিছুই নাই? সমাজে আমার প্রয়োজন, কৃষকের কি প্রয়োজন নাই? আমার নিকট শিক্ষার জিনিস আছে, কৃষকের নিকটে কি নাই? তবে তাহাদিগকে কেন ঘৃণা করিতেছি? তবে তাহাদিগকে কেন আমার ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না? চিন্তা করিয়া বুঝিলাম,—বাস্তবিক কি যেন একটা অব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, যাহাতে নিম্নশ্রেণীর প্রতি একটা ঘৃণার ভাব, একটা বিদ্বেষের ভাব, আমার শিরায় শিরায় জড়িত রহিয়াছে। আমাদের ঘৃণামূলক স্বার্থপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ হইল,—হইবারই কথা। এই প্রকারে, চেষ্টা ও অচেষ্টার সমান ফল ফলিল। অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গেল, তবুও হতভাগ্য, পরমুখাপেক্ষী বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরিল না। মাথায় তৈল নাই, উদরে অন্ন নাই, শরীরে বস্ত্র নাই—অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী একই ভাবে রহিল। শিক্ষিত যুবকদের উন্নতির জন্য দেশে দেশে সভা হইল, বৃদ্ধদের পরিণামে স্বর্গলাভের জন্য সভা হইল, রাজনীতির অধিকার কাড়িয়া লইবার জন্য সভা হইল—জমীদার ও রায়তের উন্নতির জন্য সভা হইল; এমন কি, হতভাগিনী বাঙ্গলার বিধবাদের বিবাহ দিবার জন্য পর্য্যন্ত সভা হইল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত, নিরক্ষর, পরমুখাপেক্ষী, পদদলিত কৃষকশ্রেণীর উন্নতির জন্য বাঙ্গলায় এপর্য্যন্ত কোন সভা হইল না! যে সকল সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইল—তাহাতে সমাজের উন্নতির কথা, রাজনীতি উন্নতির কথা উঠিল,—বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহের সম্বন্ধে এবং কৌলিন্য প্রথার

বিধিকে এবং বাহির হইল,—শিক্ষার জোয়ার বাংলা এ দেশের জাতীয় জীবনে কিন্তু ঐ যে দুঃখী, বলিল—বিচারা কৃষক, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, দুপুরে রৌদ্র কিরণ মস্তকে ধারণ করিয়া, মাঠে পড়িয়া হাড়ভাঙ্গা করিতেছে,—উহার উন্নতির কোন কথা কোন কবিতায় উঠিল না। অন্য-পক্ষে, নিম্নশ্রেণী যে সমাজ রক্ষার প্রধান সহায়, তাহা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিলেন না। গবর্ণমেন্ট ইহা বুঝিলেন। বুঝিয়া, সাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তাহার আয়োজন করিলেন। স্বার্থান্ধ আমাদের তাহাও সহ্য হইল না। সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে কত কথা বলিলাম, কত কথা লিখিলাম। আমরা এমনই স্বার্থপর—লবণের শুল্ক (Salt duty) আপামর-সাধারণের মঙ্গলের জন্য কমিল,—দুঃখী দরিদ্রের একটু শান্তি হইল, আমরা তাহার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া চিৎকার করিলাম। তুলার শুল্ক (Import duty) উঠিয়া গেল, আমরা তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলাম। এ সকল কর (Indirect tax) সাধারণতঃ আপামর-সাধারণকে দিতে হয়। তুলার শুল্ক উঠিয়া গেলে ৷৶০ আনার কাপড় ।৵০ আনায় পাইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সুখী হইবে, ইহাও আমাদের সহ্য হইল না! নিম্নশ্রেণীর সুখ, আমাদের দুঃখের কারণ! অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সময় সময় আক্ষেপ করিয়া বলেন,—সাধারণ লোকের উন্নতি হইতে চলিল, আর দেশে টেকা ভার। এমনই স্বার্থপর আমরা। এ সকল দুঃখের কথা আর বলিব না। দুঃখীদের কথা কে শুনিবে, কাহার কর্ণে এ সকল কথা ভাল লাগিবে? শুনিবার লোক সম্পদশালী বাঙ্গালায় নাই। থাকিলে বাঙ্গালার গতি-মতি ফিরিত। আজ কয়েক বৎসর, দুঃখী প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, গবর্ণমেন্ট কর-আইন সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—তাহার বিরুদ্ধে যা লাগিয়াছে, বাঙ্গালায় এমন লোক অতি অল্প! শিক্ষিত জমীদারদিগের সভাই বল, আর শিক্ষিত মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর সভার নামই কর, সকল সভাই যতঃ কিসে সমস্ত প্রজাদের বাঞ্ছিত মঙ্গল না হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। কোন সভা নীরবে থাকিয়া সাহায্য করিয়াছেন, কোন সভা চেষ্টা করিয়া করিয়াছেন। যাহা হইবার, অবশেষে তাহা হইয়া গিয়াছে। প্রজাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য, পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া অতঃপর বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহারা মফস্বলের বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণী যে উন্নতি পাইবে, এত দিনে তাহার পথ পরিষ্কার হইয়াছে। বিধাতা যাহাদের প্রতি বিমুখ,—

বাহুর তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইবে না, তাহা জানি। কৃষকগণের প্রতি চিকি-ৎসার আর উপায় রহিল না। বিধাতাদের দয়ায়, বিদ্যালয়ের সকলের বিশেষ অন্তরে দুঃখীদের নিকট এক প্রকার বিদায় লইয়াছেন,—আর কে বা আছে, কেবা দুঃখীদের জন্য ভাবিবে? আর কার চক্ষু-জল নিঃস্বার্থ ভাবে আছে, কেবা দুঃখীদের দুর্দশা দেখিয়া কাঁদিবে? আজ দুর্ভিক্ষ, কাল মহামারি, সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া, অসহায়দিগের যেন চিরস্থায়ের কার্য্য সাধন করি-তেছে। দুর্ভিক্ষ দেশে একদিনে হয় না। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ হইতে পারে না;—অনুন্নতিই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ,—অর্থাভাবই দুর্ভিক্ষের মূল বীজ। মনুষ্য যখন উন্নত হয়, তখন নানা প্রকার উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। অনেক সভ্য দেশে তাহাই হইতেছে। বিদেশ সেবা করিয়া, কত দেশের কত লোক বাঁচিয়া যাইতেছে। অনুন্নত বাঙ্গালীর জীবিকা নির্ব্বাহের এক মাত্র উপায়—কৃষি। দুই এক বৎসর স্থান বিশেষে শস্য উৎপন্ন না হইলেই, দেশে সর্ব্বনাশ ও হাহাকার উপস্থিত হয়। ১০ টাকার স্থলে ৩ টাকা মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ অর্থাভাব,—অর্থাভাবের মূল কারণ অনুন্নতি। নিম্ন-শ্রেণীর সাময়িক অভাব দূর করিবার জন্য অনেকে ভাবিতে পারেন, কেহ কেহ ভাবিয়াও থাকেন, কিন্তু কি করিলে হতভাগ্যদের স্থায়ী উন্নতি হইবে, তাহা অতি অল্প লোকেই চিন্তা করেন। দেখিয়া শুনিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন, বাঁচিয়া যাহারা কেবলই কষ্ট পাইবে, তাহাদের জীবন ধারণ বৃথা। মৃত্যুই যেন ইহাদের একমাত্র আশ্রয় ও সুখ শান্তির স্থান; মৃত্যু ভিন্ন যেন আর ইহাদের বন্ধু নাই। সেই মৃত্যু আসিতেছে—দুর্ভিক্ষ ও মহামারি,—অনাবৃষ্টি, ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা। "দুঃখীর কথা, নিরাশ্রয়ের অবলম্বন অনাবৃষ্টি, তবে তুই আয়, তোর সঙ্গে তোর চিরসঙ্গী দুর্ভিক্ষ আসুক। মহামারি তাহারই পরিণামে ঘটুক, বাঙ্গালার বিপন্ন দুঃখী কৃষকশ্রেণী শান্তি-ময়ীর ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করুক, দুঃখীদের বালাই দূরাক; জমীদারের অত্যাচার, শিক্ষিত শ্রেণীর ঘৃণা বিদ্বেষ, ও রাজার অত্যাচার কাতর দুঃখী কৃষকদের চক্ষের জল শোষণ করিতে বিধাতার আদেশে তোরা আসিয়া সহায় হ"—এমনই করিয়া দিন রাত্রি কৃষকেরা আকাশের তলে বসিয়া মৃত্যুকে ডাকিতেছে। বিধাতার কর্ণে বুঝি বা এতদিনে তাহাদের দুঃখের কথা উঠিয়াছে,—তাই আজ এখানে, কাল সেখানে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য উপস্থিত

হইতেছে। মৃত্যু, করাল মুখ ব্যাদান করিয়া বাঙ্গালার অঙ্গে ঘুরিতেছে! শত শত লোক, এই দুর্বলতাপ-ক্লিষ্ট, অনাহার-ক্লান্ত ম্যালেরিয়া-পীড়িত অসহায় স্ত্রী পরিবারদিগকে অক্লেশে মৃত্যুর কল্যাণময় ক্রোড়ে ঠেলিয়া দিয়া, আপনারাও ঢলিয়া পড়িতেছে। দিনে দিনে—কত লোকের হাহাকার উঠিতেছে। তোমরা বল, কেবল আজ, কেবল কাল দুর্ভিক্ষের কথাবার্ত্তা,—আমরা দেখিতেছি—বার মাস অহর্নিশি বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ বিরাজিতেছে,—বারমাস দরিদ্রের পেটের অন্নের জন্য কষ্ট ও চিন্তা;—বারমাস, রোগীর ঔষধের জন্য তাহাদের দারুণ মনের বেদনা। ঔষধাভাবে বাঙ্গালায় প্রতিবৎসর কত লোক মরিতেছে, কেহ কি আজ পর্য্যন্ত তাহার তালিকা সংগ্রহ করিয়াছে?—পথ্য এবং শুশ্রূষার অভাবে কত লোক মৃত্যুর মুখে পড়িয়াছে, কেহ কি চক্ষের জলে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছে? সহৃদয় ব্যক্তি কোথায় যে, এ সকল গণিবে? বাঙ্গালার হিতৈষীগণ, দেশের কোনই অভাব দেখিতে পান না;—জাতীয় ধনভাণ্ডার কি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, ভাবিয়াই অস্থির!! আর সহায় সম্বল না পাইয়া অত্যাচার-পীড়িত, অন্নক্লিষ্ট, দুঃখী বাঙ্গালার প্রজাবর্গ, মৃত্যুকেই সুখ ও শান্তির স্থান বলিয়া বুঝিয়াছে,—মৃত্যুই যেন আরাম স্থল, মৃত্যুই যেন সুখকর স্থান। এ বিষাদ-মাখা চিত্র সমদুঃখী বাঙ্গালীর প্রাণে সহিতেছে না, তাহারা দুঃখীদের জন্য কি যেন করিবেন, ভাবিতেছেন। বাঙ্গালার শিক্ষিতশ্রেণী আজ ব্যথিত অন্তরে ইহাদিগের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। সহৃদয়তার কি মধুর চিত্র! দেখিলেও প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু এই সুখের চিত্র দেখিয়াও, আমাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। তাই পাঠক, অর্থ দিতেছ,—দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছ, ভাল কথা,—কিন্তু ইহাদের পরিণাম কি একবার এই সম্বন্ধে চিন্তা করিবে না? গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, ইহাদিগকে বাঁচাইলেই সকল কর্ত্তব্য শেষ হয় কি না? দশ টাকা, বা পঞ্চাশ টাকা দান করিয়া আজ ইহাদিগকে যেন তোমরা রক্ষা করিলে, কিন্তু কল্যকার কথা কি এই সম্বন্ধে ভাবিবে না? আমরা ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস দেখিয়া তোমাদের প্রশংসা করিব না। শতজীবন ধারণ অপেক্ষা, মৃত্যু, সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। হতভাগ্য, পদ-দলিত, পতনশীল কৃষকেরা কত সাধে আজ শান্তির ধামে চলিয়াছে!! যদি ইহাদের পরিণামের উন্নতির কথা না ভাবিয়া তুমি সাহায্য করিতে আসিয়া থাক, তবে ভাই, তুমি দূর হও। তোমার একটি পয়সাও দান করিবার

অধিকার নাই।—যদি তুমি ইহাদের পরিণামের উন্নতিসাধনকে তোমার জীবনের একটী কর্ত্তব্য বলিয়া এই মুহূর্ত্তে না বুঝিয়া থাক ; বুঝিও থাক, জানিয়াছ।—কাল আবার আসিবে। যদি ইহাদের অবস্থা উন্নত করিতে না পার, চিরকাল এমনই করিয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে,—এমনই করিয়া দুঃখীদের অস্থি মাংস শোষণ করিবে ! দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, কেন বলিতেছি ? চাহিয়া দেখ, ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ চির-আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব শরীরের রক্ত দূষিত, বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কেবল বাহ্য প্রলেপে তাহাকে নীরোগী করিবে, তোমার এ বাসনা কখনই পূর্ণ হইবে না। শরীরের রক্ত পরিষ্কারের উপায় যদি ভাবিয়া থাক, তবে বাহ্য-প্রলেপ দিতেছ, দেও ; নচেৎ অন্ধ, একদেশদর্শী, তুমি অসহায়দিগকে বাঁচাইতে বৃথা যত্ন করিও না। আজ বাঁচে, কাল যে পুন মৃত্যুগ্রাসে পড়িবে, এক দিনের জন্য পশু জীবন যাপনে তাহার কি হইবে ? অত্যন্ত কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আজ বাঙ্গালীর হৃদয়-শক্তির পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে,—আজ বাঙ্গালীর দয়ার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।—জগৎ দেখিতেছে,—আর আশায় বুকে, সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। হয় এই সময়ে, নচেৎ কখনই নহে। শিক্ষিত-শ্রেণীর ঘৃণা বিদ্বেষ ঘুচিয়া গিয়াছে, মনে করিব, যদি দেখি, আজই বাঙ্গালার কৃষকদের শিক্ষার জন্য, গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে, সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, যদি দেখি, আজই সহস্র সহস্র লোক, দুঃখীদের উন্নতির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এক দিনের, এক মুহূর্ত্তের সহানুভূতিতে আমরা ভুলিব না। একদিনের এক মুহূর্ত্তের চেষ্টাকে আমরা অন্যভাবে গ্রহণ করিব,—যদি দেখি, স্থায়ী উন্নতির কামনা কাহারও ভিতরে নাই। শিক্ষিত শ্রেণী—ভাই বঙ্গবাসী, যদি বুঝিয়া থাক—দেশের শক্তি যাহারা, তাহাদিগকে ভাই বলিয়া কোলে তুলিয়া না লইলে তোমার শরীর অঙ্গহীন হয় ;—যদি বুঝিয়া থাক, নিরক্ষর কৃষকদিগের উন্নতি না হইলে সকল প্রকার বল বৃথা ,—যদি বুঝিয়া থাক, পাড়া প্রতিবেশীর হৃদয় মন ভাল না হইলে, তোমার পরিবারের হৃদয় মন কখনই চিরকাল ভাল থাকিবে না ;—সংসর্গ-দোষে সকল মাটী হইবে,—যদি বুঝিয়া থাক, শরীরের এক অঙ্গের ব্যাধি কালে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইবে ;—যদি বুঝিয়া থাক, তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে, যদি দেশের আপামর-সাধারণের নিকট

হইতে শিক্ষিতরা বিষয় গ্রহণ না কর ;—যদি বুঝিয়া থাক, তাহাদের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন সমাজ চলা দুষ্কর ;—তবে এস, সমদুঃখী বঙ্গবাসি, তবে এস। যাহার অর্থ থাকে, অর্থ লইয়া এস ; যাহার শরীর থাকে, শরীর লইয়া, এস। যাহার ভাষা থাকে, সে ভাষা লইয়া এস ; যাহার স্বর থাকে, সে স্বর লইয়া এস। যাহার জ্ঞান থাকে, সে জ্ঞান লইয়া এস। এস, সকলে আজ প্রাণে প্রাণে মিলি। কৃষকদিগকে আজ বাঁচাইব—কাল মানুষ করিব,—বাঙ্গলার চির দুর্ভিক্ষ-কলঙ্ক ঘুচাইব, এই প্রতিজ্ঞা অন্তরে রাখিয়া, এস, সকলে মিলি। পরস্পরের প্রতি যদি কোন ঘৃণা বিদ্বেষ থাকে, তবে এই শক্তি-পরীক্ষার শুভদিনে, সে সকল পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক। গবর্ণমেন্ট কি করিবেন, না করিবেন, তাহার দিকে চাহিয়া প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের ভ্রাতৃদিগকে বাঁচাইব, আমরাই মানুষ করিব ; কর্ত্তব্য আমাদের,—ব্রত আমাদের। ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য আর নাই। ইহাই প্রজানীতি, ইহাই রাজনীতি। ভ্রাতা, ভ্রাতার কষ্ট বুঝিবে না, তবে কে বুঝিবে ? ভ্রাতা, ভ্রাতার অশ্রু মুছাইবে না, তবে কে মুছাইবে ? ভ্রাতা, ভ্রাতার উন্নতির চেষ্টা করিবে না, তবে কে করিবে ? হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, যে যেখানে থাক, আজ ঘৃণা বিদ্বেষ দূরে রাখিয়া এস, সকলে একবার মিলিত হই। পরীক্ষার দিনে যে দূরে থাকিবে, তাহাকে অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ, দেশের কলঙ্ক মনে করিব। অহঙ্কারের সেবা করিতে—ঘৃণা বিদ্বেষের মন যোগাইয়া চলিতেই আমাদের অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, আর না। কৃষক-বন্ধু শিক্ষিত শ্রেণী এস, আজ প্রজাবন্ধু রাজা এস। সকলে একত্রে মিলিয়া—প্রতিজ্ঞা করি,—ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধন না করিয়া ক্ষান্ত হইব না,—যত দিন ইহারা আপনাদের পায়ের উপর আপনারা দাঁড়াইতে না পারিবে, ততদিন শরীরকে বিশ্রাম দিব না। জীবনের মমতা ভাসাইয়া, পরিশ্রম করিলে কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকে ? শুভ ইচ্ছাকে সবল করিলে কিসের অভাব থাকে ? চেষ্টার অসাধ্য কি আছে ? “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,”—প্রতিজ্ঞা কর। যাহার যাহা আছে, ঢালিয়া দেও। নচেৎ এক মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া, আপনার নাম জাগাইবার জন্য, আজ কৃষকদিগকে বাঁচাইতে যদি আসিয়া থাক ;—পরিণামের উন্নতি সাধনের ব্রত যদি না গ্রহণ করিয়া থাক, তবে মনে করিব,—হতভাগ্যদিগের উপকারের পরিবর্ত্তে তোমরা অপকারই করিতেছ ; কারণ, পশু-জীবন যাপন অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। যে দুর্ভিক্ষ বাঙ্গলায় বার মাস বিদ্যমান,

তাহার যদি কোন শক্তি করিতে না পার, তবে বুঝিব, বৃথা হুজুগ করাই তোমাদের ব্রত। দেশকে উদ্ধার করা, অতি কঠিন কার্য্য, অতি কঠোর ব্রত। দেশের উন্নতির কথা লইয়া যাহারা কেবলই আন্দোলন করিতেছেন, কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্তের উপর দরখাস্ত দিতেছেন;—তাঁহারা একবার যদি এদিকে চাহিয়া দেখিতেন, তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট ভিক্ষা না চাহিয়াও, দেশের অনেক কার্য্য করিতে পারিতেন। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর অবস্থা যদি বুঝিতেন, তবে ইংরাজ নিন্দা-নীতি অবলম্বন না করিয়াও, অনেক মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেন। দেশের শক্তি যাহারা, বল যাহারা, তাহাদের উন্নতির কথা ভুলিয়া জাতীয়-আন্দোলন, অসার কল্পনার ক্রীড়া বই আর কি? যদি জাতির উন্নতি চাও—দেশের উন্নতি চাও; তবে সাধারণ লোকের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার জন্য চেষ্টা কর। এই গুরুতর পবিত্র ব্রত যিনি গ্রহণ করিবেন, তাহার জীবনই ধন্য হইবে। জগন্নাথের রথ, সাধারণ লোকেরা না টানিলে কখনই চলিতে পারে না। সাধারণ লোকদিগের উদ্ধার করিতে যাও—সাধারণ লোকদিগের উন্নতির জন্য প্রাণকে আত্মাও—জীবনকে উৎসর্গ কর। দুর্ভিক্ষ ঘুচিবে—মহামারি পলায়ন করিবে—দেশ স্বর্গ হইবে;—ভারত পুণ্যক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হইবে; বঙ্গের নাম জগতে মহীয়ান হইবে।*

আসাম ও বাঙ্গালী।

আসাম প্রকৃতির 'কাম্য কানন'—স্বাধীন জীবের লীলাভূমি। অভ্রভেদী বিশাল বিস্তৃত হিমালয়ের পূর্ব-প্রান্ত-সীমা হইতে কতই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

---

* এই প্রবন্ধটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পর আসামে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল। গালিগালাজ বর্ষণের আর কিছুই বাকী ছিল না। অনেক পত্রিকায় প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। এ সমস্তই মনুষ্যের লক্ষণ। যে প্রবন্ধে কোন আন্দোলন হয় না, সে মৃত প্রবন্ধ। এইরূপ গালি খাইয়া আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি, কিন্তু ইহাদিগের জন্য ভীত বা সঙ্কুচিত হই নাই। সত্য কথা বলিতে গেলেই [illegible] উহাদের মতি থাকিতে [illegible]। আমাদিগকে মকদ্দমা উপস্থিত হইবে, এরূপও শুনা গিয়াছিল। কিন্তু কে আগে কি [illegible] কথা, তাহা বলা নাই। যে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি লিখিত, তাহা সাধারণে [illegible]

পাহাড় শ্রেণী উত্থিত হইয়াছে—তাহাকে কতই অসভ্য স্বাধীন জাতি সকলের বিহার ক্ষেত্র সুশোভিত রহিয়াছে। কামাখ্যা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গ ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইলে, আমাদের কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। কামাখ্যা পাহাড়ের পাদমূলে কলনাদী, স্ফটিকময় ব্রহ্মপুত্র কুল কুল রবে বহিতেছে—তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উমানন্দ পাহাড় আপন মস্তক নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছে!—সোণায় সোহাগা,—রূপে অপরূপ মিশিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে খাসী পাহাড় শ্রেণী, পূর্ব্ব দক্ষিণে খসিয়া পাহাড়শ্রেণীর সুদূরবিস্তৃত ঘন মেঘরাজির ন্যায় মনোহর দৃশ্য, উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের কোট সীমান্তের গগন-ভেদী প্রকাণ্ড পর্ব্বত,—সকলের মধ্যে অশ্বক্লান্ত প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী। মহান এবং ক্ষুদ্র,—বড় এবং ছোট, শাদা এবং কাল, তরল আর কঠিন একত্রে মিলাইয়া প্রকৃতি সেখানে অপরূপ মনোমোহন সাজে সাজিয়া রহিয়াছেন! প্রকৃতিদেবী আপনার অলঙ্কার যেন ক্লান্ত হইয়া আসামে খুলিয়া রাখিয়াছেন! আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারে, এমন কবি দেখি নাই। আমাদের যে সকল মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছি, প্রাণ খুলিয়া, হৃদয় ভরিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি, সে শক্তি নাই। কোন কোন পুস্তক খুলিয়া আসামের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহা যেন আমার নিকট কিছুই-নয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমি আবার চেষ্টা করিয়া অন্যের হাস্যাস্পদ হইব কেন? কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে কে সকল সময়ে প্রশমিত করিয়া রাখিতে পারে? তাই এ চেষ্টা।

আমি বলিয়াছি, আসাম প্রকৃতির কাম্য কানন। আসামে শোভা সৌন্দর্য্যের অভাব কোথাও নাই। যেখানে যাও, যে দিকে চাও, সেই দিকেই অতুল শোভা। শোভার উপরে আরো শোভা,—রূপের উপরে আরো

বুঝিতে পারেন নাই, ইহা দুঃখের কথা; কিন্তু সময়ে তাহা সকলের বোধগম্য হইবে। আশা করি। এই প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার পর শিলংয়ের উন্নতির জন্য অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি সেখানে বাড়ীর জন্য উৎসুক হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; ব্রাহ্মসমাজ হইতে শিলং-মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে, কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও কোন বাঙ্গালী সেখানে যান নাই। সুতরাং এখনও এ প্রবন্ধের প্রয়োজন আছে। আসাম ও বাঙ্গালী নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহা পাঠে কেবল একটি স্থান সংশোধন করার প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে আবার এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করিলাম।

রূপ—ঘনীভূত—বিঘড়িত। ব্রহ্মপুত্র আসামে যে কি অপরূপ লীলা খেলিতেছেন, কি মধুর ভাবই ঢালিতেছেন, কি আনন্দ প্রচার করিতেছেন, যে না দেখিয়াছে, সে তাহা বুঝিবে না। আসামের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত অন্তর্জাহিত ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত, উভয় কূলে পাহাড় শ্রেণী—দূরে এবং নিকটে। কোথাও ব্রহ্মপুত্র পাহাড়ের পদচুম্বন করিতেছেন, কোথাও পাহাড়কে বুকে করিয়া বহিতেছেন,—কোথাও পাহাড়কে আপন অঙ্কে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। পাহাড়ে ও নদীতে এমন কোলাকুলি, এমন চাপাচাপি ভাব আর কোথা আছে? যেখানে উভয় কূলে পাহাড়, সেখানে সঙ্কুচিত হইয়া নদী যেন পাহাড়ের পদ স্নান করিয়া দিতেছেন;—আর যেখানে পাহাড় অনেক দূরে, সেখানে উন্মাদের ন্যায় তরঙ্গ-বিহ্বল হৃদয়কে আরো প্রসারিত করিয়া ছুটিতেছেন;—যেন পাহাড়-বিরহে ক্রোধোন্মত্ত। পাহাড় আর ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন যে সকল স্থান আছে,—তাহা প্রায়ই অরণ্যময়। সর্ব্বত্রই গভীর বনরাজি—বিশাল হইতেও বিশালতর। আসামের গাঢ় বনে বন্য হরিণ, বন্য শূকর, বন্য ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ বা বন্য বরাহ,—এই সকল স্বাধীন জীব তোমার জীবন নাশের জন্য বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবে; কিন্তু লোকের সমাগম বড় একটা দেখিতে পাইবে না। প্রকৃতির যে অমৃতময় ভাণ্ডারে কাম রূপ পাইয়াছিলেন, সে কামরূপময় আসাম আজ লোক সমাগম-হীন, কেবল স্বাধীন অসভ্য জীবের এবং বন্য হিংস্র পশুর আবাস ভূমি। নদীতে স্বাধীন জলচর জীব, অরণ্যে স্বাধীন বন্য জন্তু, পাহাড়ে অসংখ্য স্বাধীন অসভ্য জাতি।

আসাম তিন ভাগে বিভক্ত;—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা প্রদেশ, পাহাড়-প্রদেশ, এবং সুরমা উপত্যকা প্রদেশ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-প্রদেশ সকল আবার উপর আসাম এবং নিম্ন আসাম নামে খ্যাত। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, তেজপুর, শিবসাগর, নওগাঁও, ডিব্রুগড় প্রভৃতি—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভুক্ত। গারো পাহাড়, খসিয়া এবং জৈন্তা পাহাড় এবং নাগা পাহাড়, পাহাড়-প্রদেশ নামে খ্যাত; এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় সুরমা-উপত্যকা প্রদেশ ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন আকা, লুসাই প্রভৃতি নামধারী অসংখ্য অসংখ্য স্বাধীন জীব-নিবাস আছে। সাধারণত আসামের লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অনেক স্থানই জঙ্গলে পরিপূর্ণ;—আবাদ হয় না, চাষ হয় না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভূমিতে যাহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজ

কাল ইংরাজি শিখিয়া, সদাশয়, মিতাচারী হইয়াছেন, কেহ কেহ বা খাটি-কোট্‌ধারী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীই অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন। খুব সচ্চরিত্র জ্ঞানী লোকও দুই চারি জন দেখিলাম, কিন্তু সে যেন সমুদ্রে শিশির বিন্দু! যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা সাধারণত সচ্চরিত্র কিন্তু দেশের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অতি সামান্য। শিক্ষিতের সংখ্যা খুব অল্প। দেশময় অজ্ঞানতা ও অসভ্যতা বিজড়িত। উচ্চ জাতি সকল ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই, বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। বিহু-লেখার কথা শ্রবণ করিলে সকলেরই হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয়। সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলা যায় না। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নীতি-হীন, চরিত্রহীন, ধর্ম্ম হীন,—মনুষ্যত্ব হীন। ব্যভিচার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দোষ বলিয়াই গণ্য নহে;—পিতা কন্যাকে গবর্ণমেন্টের উচ্চকর্ম্ম-প্রাপ্ত বড় লোকের সহবাসে রাখিতে পারিলে সম্মান বোধ করে! পুরুষ জাতি সাধারণত নির্জ্জীব—আশাশূন্য,—স্ত্রীলোকের পদানত। স্ত্রী-স্বাধীনতা আসামের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা উপার্জ্জন করে, পুরুষেরা ঘরে বসিয়া খায়। পাঠকগণ শুনিয়া চমকিত হইবেন, আসামের অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ্য বেশ্যা নাই;—তাহার কারণ, বাড়ীতে অনেকে ঐ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। অবশ্য শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মধ্যে এরূপ দেখা যায় না। অহিফেন সেবনে নিম্নশ্রেণীর পুরুষজাতির চরিত্রের মহত্ত্ব একেবারে লোপ পাইয়াছে। আতিথ্য-প্রথা কোথাও নাই, বন্য জন্তুর হাতে তোমার প্রাণ যায় যাউক, তবু কেহ তোমাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না। তবে গুপ্ত-প্রণয় খুলিতে পারিলে, দ্বার অবারিত। বাঙ্গালীর প্রতি আসামীদিগের ভয়ানক ঘৃণা! ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পূর্ব্বে অনেক চরিত্রহীন বাঙ্গালী কামরূপে যাইয়া ভেড়া হইয়া যে মহা অনিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সে অনিষ্টের কথা ইহারা সহজে ভুলিতে পারিতেছে না। আরও তাহারা এমন বাঙ্গালীর আদর্শ পায় নাই, যাহা দেখিয়া গত কথা ভুলিতে পারে। তাই বিজাতীয় ঘৃণা। আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছিলাম। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা-বাসী নিম্ন শ্রেণীর লোকের চরিত্র-হীনতার কথা শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। তারপরে, যখন শুনিলাম, বাঙ্গালীদিগের প্রতি ইহাদিগের বিজাতীয় ঘৃণা, তখন প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। যে বাঙ্গালীর

সুতরাং ভিন্ন আমাদের আর বলবার পথ নাই, সেই বাঙ্গালীর প্রতি ইহাদের বিজাতীয় ঘৃণা আরো বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট শাসনানুসারে বাঙ্গালী-দিগকে ইস্তফা দিতেছেন, শুনিয়া আরো কষ্ট হইল। আসামী ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে পৃথক করিয়া উভয় জাতির মধ্যে এক গভীর পরিখা খুঁড়িয়াছেন। কূটরাজনীতিজ্ঞ যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাঁহাদের দুই জাতি কোন রকমে এক না হয়। এই সকল দেখিয়া নীরবে অনেক অশ্রুপাত করিয়াছি। কিন্তু সে সকল কথা এখন থাকুক।

আসামে আতিথ্য প্রথা নাই বলিয়া পথে আমরা অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম,—অনেক দিন উদরে অন্ন পড়ে নাই,—অনেক সময় কেবল প্রকৃতির শোভা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। দুঃসহের রৌদ্র-দগ্ধ শরীর লইয়া, ভুবনেশ্বরীর মন্দির, বশিষ্ঠাশ্রম, অশ্বক্রান্ত প্রভৃতি পাহাড় সন্দর্শনে অনেক সময় ক্ষুধায় যে কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। পয়সা দিয়াও অনেক স্থানে কিছুই খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় নাই। প্রাণান্তেও লোকেরা কাহাকেও সাহায্য করিবে না। ব্যবসা বাণিজ্যও ইহারা বুঝে না। খাঁটি আসামীর দ্বারা পরিচালিত দোকান আমরা উপত্যকা প্রদেশে কোথাও দেখিলাম না। পথক্লান্ত বাঙ্গালী পথিক যদি আসামী গৃহীর গৃহে শ্রান্তি দূর করিতে পারিত, তবে অনেক সহৃদয় সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয় যে ইহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামীদিগের নিকট বাঙ্গালীরা যেমন ব্যবহার পায়, বাঙ্গালীরাও আজকাল তেমনই ব্যবহার করে। কেহ কাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, বরং ইহাদিগকে প্রায়ই উপেক্ষা করিয়া থাকে। কেহই ইহাদের উন্নতির কথা ভাবে না। আমাদের উন্নতি কেমনে হইবে, জানি না।

পাহাড়ীদিগের মধ্যে গারো, খসিয়া, নাগারাই প্রধান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরো অনেক সামান্য সামান্য পাহাড়ী জাতি আছে;—ইহারা প্রায়ই নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, সদিয়া হইতে ব্রহ্মকুণ্ড (ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান) তীর্থে যাহারা গমন করেন, তাঁহাদের অনেকেরই ভাগ্যে স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে না। পাহাড়ীজাতিদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজও সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলা যায় না। তবে অনেকটা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গারো পাহাড়, খসিয়া পাহাড় একপ্রকার গবর্ণমে-

গৌর অধীনে আসিয়াছে। নাগা পাহাড় কতকাংশ গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়াছেন, কতক এখনও স্বাধীন। এই সমস্ত জাতি যদিও নামে গবর্ণমেণ্টের অধীন হইলেও, ইহারা এক প্রকার স্বাধীন। খসিয়া পাহাড়ের কথা এই প্রবন্ধে আমরা কিছু বিশেষ করিয়া বলিব। খসিয়া পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে শিলং নামক স্থানে আসামের প্রধান কমিশনারের আফিস্যাদি স্থাপিত। খসিয়া পাহাড় শ্রেণীর গৌহাটির দিকের অংশ অরণ্যময়, বন্য হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ। শিলং পাহাড়ে কেবল অনেক সরল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌহাটী হইতে শিলং ৬৩ মাইল পথ; আবার শিলং হইতে চেরা ৩০ মাইল পথ; এই সমস্ত পথ আমরা হাঁটিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। গৌহাটি হইতে শিলং যাইতে বর্ণিহাট, নংপো, নয়াবাঙ্গলা প্রভৃতি কয়েকটী আড্ডা আছে। প্রত্যেক আড্ডায় গবর্ণমেণ্টের ডাক বাঙ্গালা আছে, এবং ইতর লোকদিগের জন্য এক এক খানি প্রকাণ্ড সরাই ঘর আছে। এই জনপ্রাণীহীন ভীষণ অরণ্যময় পাহাড়ে গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে এইরূপ সরাই স্থাপন করিয়া পথিকদিগের যে কি মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা এক মুখে বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে এইরূপ আড্ডা না থাকিলে কেহ সে ভীষণ পথে চলিতে পারিত না, কেহ বন্য জন্তুর করাল গ্রাস হইতে রজনীতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিত না। অনেকে গৌহাটী হইতে শিলং পর্য্যন্ত টোঙ্গাতে এক দিনে গমন করেন; তাঁহাদের ভাগ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখা ঘটে কি না, জানি না। গম্ভীর নিস্তব্ধ ঘন বৃক্ষরাজির ভিতরে ঝরণার কুল কুল শব্দ, প্রপাতের ঝর ঝর শব্দ, প্রভাত-পক্ষীর মধুর কণ্ঠের স্বাধীন সঙ্গীত—প্রকৃতির মনোহর রূপ দেখিতে দেখিতে, উপভোগ করিতে করিতে যে কখনও সে বিজন পথে যায় নাই, সে নীরব জগতের প্রস্ফুটিত সে গম্ভীর সৌন্দর্য্য কি বুঝিবে? আমরা অনাহার ও অনিদ্রার পথ এই সকলই ভুলিয়াছিলাম—প্রকৃতির সে নীরব অথচ জীবন্ত, জীবন্ত অথচ মধুময় শোভায় মজিয়া উপভোগ করিয়া। কখনও পদতল হইতে শ্বেতাভ পাতলা মেঘ ভাসিয়া উঠিতেছে,—কখনও ঘন গম্ভীর কাল মেঘ জীমূতরবে ডাকিয়া ডাকিয়া চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিতেছে,—কখনও বৃক্ষের ভিতর দিয়া মেঘ-রঞ্জিত শুভ্র সূর্য্যের রশ্মি বৃক্ষে বৃক্ষে পড়িতেছে, কোথাও ঝরণার কল কল নাদ, প্রতিধ্বনি প্রপাতের ঝর-ঝর রব আকাশে উঠিতেছে! পথ-কষ্ট ও দুঃখের কথা, জীবনের সকল কষ্ট, সকল দুঃখ কয়েক দিনের জন্য ভুলিয়াছিলাম, সেই শিলং এবং চেরাপুঞ্জির বিজন পথে।

শিলং পাহাড়ের চূড়ায় আর চড়িতেছি। সেখানে জনমানব নাই, বিহঙ্গও নাই, প্রায় বৃক্ষ নাই, তৃণের অভাব নাই। ঈশ্বরের কৃপায় তিন দিনের দিন আমরা কিরূপ একটা বিশেষ প্রভাব হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শিখরে পৌছিলাম। চতুর্দিকে সরল বৃক্ষ শ্রেণী সোঁ সোঁ করে বায়ু স্বরে বেণুর সুনিবা কত কি যেন মধুর কাহিনী শুনিতেছে,—কত কি বিষাদ ভাব জাগিতেছে,—কত কি সুখের কথা প্রচার করিতেছেন। দুই তিন দিন থাকিয়া আমরা সেখানকার দৃশ্য স্থানগুলি দেখিলাম। বাঙ্গালী এবং আসামী অনেক মনুষ্য সহিত আলাপ করিল। যে কয়েকটি জলপ্রপাত সেখানে গভীর ভাবপূর্ণ জাগিতেছে, তাহা দেখিলাম। শিলং-পিক নামক সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিয়া অনন্ত পাহাড়শ্রেণীর অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিলাম। যেরূপ ব্যক্ত হয় না, যে সৌন্দর্য্য কথায় বলা হয় না, তাহা বাস্তবিকই অনন্ত। পাহাড়ের নিচে পাহাড়, তাহার নিচে পাহাড়, তাহার নিচে আরো পাহাড়, —ক্রমাগত চতুর্দ্দিকে ক্রম-নিম্ন খোলা পাহাড় শ্রেণি শোভা পাইতেছে। পাহাড়ের উপর সূর্য্যের রশ্মি প্রতিফলিত, সকলেরই উপরে বায়ু তীব্রভাবে প্রবাহিত,—তাহার উপরে আমরা। কোথাও বৃক্ষ দৃষ্টিতে পড়ে না, —সব শূন্য, সব অনাবৃত,—সব অনন্ত। অনন্তদেবের অনন্তরূপ সেখানে ফুটিয়া ফুটিয়া যেন পড়িতেছে! দেখিতে দেখিতে মেঘ উঠিল,— অনেক পাহাড়কে ঢাকিয়া ফেলিল। অনেক সুন্দর, দেখিতে দেখিতে মেঘে ডুবিয়া পাহাড় যেমন সমুদ্রের ন্যায় হইয়া যায়; সে দিন তেমন হইল না। সূর্য্যের রশ্মিমাখা বায়ুর সহিত মেঘের ক্রীড়া বড়ই আনন্দপ্রদ বোধ হইয়াছিল। শিলং-পিক দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক ভাব উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে তাহা কিছুই হয় নাই। আমার মন এক স্বাধীন জাতির ভাবী উন্নতির চিন্তায় সর্ব্বদাই নিমগ্ন ছিল। সে জাতির নাম খসিয়া জাতি। খসিয়া পাহাড় শ্রেণী সমস্তই এক প্রকার স্বাধীন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল রাজা আছে, তাহারা অশিক্ষিত এবং অসভ্য, কিন্তু স্বাধীন। তাহারা গবর্ণমেন্টকে কোন প্রকার কর দেয় না, বিচার আচার বিধি ব্যবস্থা নিজেরাই করে, তবে হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার-ভার গবর্ণমেন্টের উপর তাহারা অর্পণ করে। প্রজারা নামত রাজার অধীন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা সকলেই এক প্রকার স্বাধীন। রাজাকে অধিক খাজনা দিতে হয় না,—যাহার যত

ইচ্ছা বোলো পাহাড়ে চাষ করিতে পারে। শিলং নগরের জন্য গবর্ণমেণ্ট কতকটা স্থান রাজার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ;—আর সমস্তই রাজার জমী। শিলং নগরে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে শুল্ক হিসাবে কিছু কিছু দিতে হয়। খসিয়া পাহাড়ে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আলুর চাষ লইয়া থাকে। আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসে গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, কোন স্থান হইতে কৃষকেরা আলু তুলিতেছে, আর কোথাও বা রোপণ করিতেছে। থারিয়াঘাট হইতে চেরাপুঞ্জি পর্য্যন্ত যে রেলপথ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা শেষ হইলে বারমাস কলিকাতায় আলু সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই চাষ করে। কোথাও কোথাও ধানের চাষও হয়। শিলং থাকিতে থাকিতেই, হাটে বাজারে, রাস্তা ঘাটে খসিয়া স্ত্রী পুরুষ দেখিলাম। তাহাদিগের বলিষ্ঠ কর্ম্মপটু শরীর দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ পাইয়াছিলাম। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সবলকায়,—দৃঢ়, কর্ম্মঠ। স্ত্রী পুরুষ সকলেই চাষ বাস করিয়া থাকে, কাঠ কাটে, অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্যই করে। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই, বাল্য-বিবাহ নাই, বিধবা বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত আছে। আসাম-ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় নিম্ন জাতি সকল যেমনই সাধারণতঃ নীতিহীনতার পূর্ণ বিকাশ, খসিয়া জাতি কিন্তু তেমন নহে। ইহাদের নিকট সতীত্বের খুব আদর আছে। দুঃখের বিষয় শিলং নগরে, সাহেব এবং বাঙ্গালীর দোষাদোষে, কোন কোন খসিয়া রমণী বৈদেশিকের ঘৃণিত ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। খসিয়া জাতির বর্ণ উজ্জ্বল—রক্তাভ কাঁচা সোণার ন্যায়। রমণীদিগের মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পুতুল পূজা করে না। রূপান্তরে এক ঈশ্বরকেই মানে। পূজা অর্চ্চনা বড় একটা করে না। ইহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অনেক নিঃস্বার্থ ইংরাজ-মিশনারি খসিয়াপাহাড়ে বাস করিতেছেন। ইহাদিগের চেষ্টায় খসিয়াজাতির অনেকে শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সভ্যতার আস্বাদন পাইয়াছে। অনেকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মও পাইয়াছে। ধন্য খ্রীষ্ট মিশনারির জীবন, ধন্য সহিষ্ণুতা, ধন্য অধ্যবসায়।

আমরা শিলং হইতে চেরাপুঞ্জি যখন রওয়ানা হইলাম, তখন কোন বন্ধু আমাদিগের সহিত দুইজন রমণী-মুটে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদিগের ভাষা আমরা বুঝি না, আমাদের ভাষা তাহারা বুঝে না, অথচ

আমরা অপরিচিত হইলেও ইহাদিগের সহিত চলিলাম। বিশ্বাস এই ছিল যে, ইহারা কখনও প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করিবে না। বন্ধুদিগের সকলেই বলিয়াছিলেন, ইহারা প্রবঞ্চনা করিতে জানে না। শুনিয়াছি, কার্য্যোপলক্ষে খাসিয়া-কয়েদী সরকারী জেলখানা হইতে সময়ে সময়ে পলায়ন করে বটে, কিন্তু কার্য্য শেষ হইলে আপনা আপনি আবার ফিরিয়া আসিয়া থাকে। শিলং হইতে চেরাপুঞ্জির পথ বড়ই সুন্দর—বৃক্ষ হীন, সাড়া শব্দ হীন—প্রকৃতির গম্ভীর নিস্তব্ধ ভাবে পূর্ণ। এমন গভীর জীবন্ত নিস্তব্ধতা কুত্রাপি আর কোথাও দেখি নাই। গিরি সঙ্কটের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঠেকিয়া মধ্যে মধ্যে ঝরণার সোঁ সোঁ শব্দ সে নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিতেছে, শুনা যায়। সে যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমি লিখিতে পারি না। এই পথে দ্বিতীয় দিনে কিছু জনতা দেখিলাম। মফ্রিন নামক স্থানের রাজার বাটীতে নৃত্য হইবে, আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। পথের মধ্যে দেখিলাম, দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, কেহ বা হাটিয়া, কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা লোকের পৃষ্ঠে * মফ্রিনের দিকে যাইতেছে। খাসিয়া রমণীদিগের বস্ত্র ব্যবহার প্রণালী অতি আশ্চর্য্য, অতি পরিপাটী। কোন সভ্য জাতির মধ্যেও এরূপ কাপড় পরার রীতি আছে কি না, সন্দেহ। মস্তক ভিন্ন ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে সুপ্রণালীতে আবৃত। ইয়ুরোপীয় মহিলাগণের বক্ষস্থল আবৃত থাকিয়াও যে প্রকার কুৎসিত রুচির পরিচয় দেয়, ইহারা তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। ইহাদিগের কোন অঙ্গই ঐরূপ কুরুচির পরিচয় দেয় না। রমণীদিগকে প্রফুল্ল, বলিষ্ঠ, সুস্থ, মিষ্টভাষী ও বিনয়ী বলিয়া বোধ হইল। অনেকের নিকট ইহাদিগের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিলাম। ভারতবর্ষের অসভ্য জাতি বলিয়া রমণীদিগকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে, কার্য্য করিতে দেখিয়া প্রাণে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব? দেখিলাম, কোথাও ইহারা কাঠ কাটিতেছে, কোথাও মাটী খুঁড়িতেছে, কোথাও মোট বহিয়া যাইতেছে। আমরা এই আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে, পাহাড়ের উপর দিয়া পথশ্রমে যথা সময়ে চেরাপুঞ্জি পৌঁছিলাম। চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এইখানেই ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের প্রধান আড্ডা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত

* শিলং অঞ্চলে, খাসিয়ারাই সম্ভ্রান্ত লোকের বাহন আছে। ইহারা অর্দ্ধ-চেয়ার পশ্চাৎ দিকে পিঠে বাঁধিয়া তাহাতে বসাইয়া পথিকদিগকে বহন করিয়া লইয়া যায়।

বৃষ্টিপাতের জন্য গবর্ণমেণ্টের আফিসাদি উঠিয়া শিলং গিয়াছে। চেরাপুঞ্জি খসিয়াদিগের প্রধান ভূমি। এখানে খ্রীষ্টানদিগের একটী স্কুল আছে, বাজারবাটী আছে, পোষ্টাফিস আছে, পুলিস ষ্টেসন আছে। ভূতপূর্ব্ব ডাকবাংলা ও পূর্ব্বের ভগ্ন অট্টালিকার অবশিষ্ট অনেক আছে। চেরাপুঞ্জির প্রাকৃতিক শোভা মনোহর। এখানে বার মাস কিছু কিছু বৃষ্টি থাকে। কয়লার খনি, চুণের খনি, চেরাপুঞ্জিতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। চেরাপুঞ্জির অতি নিকটে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মস্মাই-জল-প্রপাত! উচ্চতায় ইহার সমান জলপ্রপাত পৃথিবীতে আর নাই। থারিয়াঘাট হইতে চেরাপুঞ্জি পর্য্যন্ত ট্রাম রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, সত্বরই খুলিবে। স্থানে স্থানে ট্রাম রাস্তা ৫০০। ৬০০ শত ফিট প্রায়-লম্বভাবে উঠিয়াছে। এরূপ ট্রাম পৃথিবীর মধ্যে আর কেবল আল্পস্ পর্ব্বতে আছে। যে সকল পার্শ্বে রাস্তা প্রায় লম্বভাবে উঠিয়াছে, সে সকল স্থানে হাইড্রলিক-প্রেসার দ্বারা গাড়ী টানিয়া তোলা হইবে। ট্রাম রাস্তা খুলিলে চেরাপুঞ্জি একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান হইয়া উঠিবে। চেরাপুঞ্জিতে খ্রীষ্টান মিসনরিগণ প্রভূত কার্য্য করিয়াছেন; অনেক গুলি পরিবারকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একটী নূতন পল্লী সংস্থাপন করিয়াছেন। চেরাপুঞ্জির স্বাধীন রাজার ভ্রাতা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। যাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য। ইহাদের মধ্যে বড় ছোট ভেদাভেদ নাই;—রাজ পরিবারের মেয়েরা পর্য্যন্ত বাজারে যাইয়া ক্রয় বিক্রয় করে। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত অপর খসিয়াদিগের আদান প্রদান এবং আহার বিহার চলিয়া থাকে। খসিয়ারা বরাহ-মাংস-প্রিয়। এইজন্য ইহাদিগের প্রতি কাহারও কাহারও ঘৃণা দেখা যায়; কিন্তু ইহাদিগের স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। খসিয়া রমণীর সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ অনেক বাঙ্গালী ইহাদিগের সহবাস-লালায়িত, কিন্তু সামাজিক শাসনের ভয়ে কেহই ইহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নয়। শ্রীহট্ট-বাসী এক জন সম্ভ্রান্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা কেবল প্রকাশ্যে খসিয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী কন্যা হইয়াছে; আজিও তাহাদিগের বিবাহ হয় নাই। খসিয়ারা বড়ই বাঙ্গালী ভক্ত—বাঙ্গালীদিগকে ইহারা বড়ই শ্রদ্ধা করে। যে সকল খসিয়া শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগের ইচ্ছা, বাঙ্গালীর সহিত আদান প্রদান চলে,—বাঙ্গালীর সহিত বিবাহাদি দিতে অনেকেরই ইচ্ছা। বাঙ্গালীকে

বিবাহ করিতে অনেক অসমিয়ার বাধা আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে প্রকার স্কুল করিয়াছেন, কোন বাঙ্গালী যদি সেই প্রকার জোয়াইতে একটী স্কুল স্থাপন করেন, তবে অনেক বালক বালিকা বাঙ্গালী পড়িতে আসিতে পারে। কলিকাতার, জোয়াইতে বাজার আবশ্যক হইলে, সেখানে একটী বাঙ্গালা স্কুল হয়। আমরা রাজার সহিত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু রাজা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। এই অসভ্য জাতির মধ্যে এমন অনেক বিষয়ের অঙ্কুর লক্ষণ দেখা যায়, যাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, সুশিক্ষিত হইলে, বলে কৌশলে, বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহারা আদর্শ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অবসর শীর্ণ হইয়া পড়িল, ইহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার শিখিতে পারিলাম না। বাল্য বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, ইহাদিগের মধ্যে মনোমত প্রথা মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ-ভঙ্গ প্রথাও প্রচলিত আছে। কিন্তু যতদিন প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ ভঙ্গ না হইবে, ততদিন ইহারা অন্য কাহারও সহবাস করে না। মৃত ব্যক্তির প্রতি ইহাদের বড়ই সম্মান। পরিবারের কেহ মরিলে, যত দিন সমস্ত আত্মীয় বান্ধব মিলিত না হয়, ততদিন তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয় না। এই প্রকারে কখনও কখনও এক বৎসর, কখনও বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত, মৃত-দেহ রক্ষিত হয়। সমাধির উপরে ইহারা বড় বড় প্রস্তর খণ্ড চিহ্ন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারা যুদ্ধের সময় তীর ধনুক ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমার মনে পাহাড় ভ্রমণের সময় এই গভীর প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, এবং আজও তাহা মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে,—আমাদের মধ্যে কেহ কি এমন ব্যক্তি নাই, যিনি আসামের অসভ্য জাতির, বিশেষতঃ এই খসিয়া জাতির উন্নতির জন্য জীবনক্ষয় করিতে পারেন? আমরা আজ কাল বড়ই সাহেব-ঘৃণা শিখিয়াছি, কথায় কথায় সাহেবদিগের নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু এই সাহেবদিগের কত মহাত্মা, জীবনের সকল প্রকার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভারতের যে কত অসভ্য জাতির কত মহৎ উপকার করিতেছেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়! আমাদের অসভ্যজাতি সকলের উদ্ধার করিবার জন্য কত সাহেব মহাত্মা যে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। নাগা পাহাড়ের ডক্টর ক্লার্ক, গারো পাহাড়ের ডাক্তার ম্যাকেঞ্জি, খসিয়া পাহাড়ের ডাক্তার

বর্দ্ধা ইহাদের শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ধন্য ইংরাজ জাতি, ধন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম, ধন্য ব্রিটীশ শাসন।

আমরা আমাদের দেশীয়দিগের জন্য কিছুই করিতে পারি না, আর ইঁহারা, একমাত্র ধর্ম্মের আকর্ষণে, কত দূর দেশ হইতে আসিয়া কি মহৎ কর্ত্তব্য-পালন করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশ লোক সংখ্যার আধিক্যে প্রপীড়িত, কিন্তু আসাম জঙ্গলে পরিপূর্ণ, চাষ করিবার লোক নাই। কেহ মনে ভাবিবেন না, আসাম অনুর্ব্বর ক্ষেত্র। আসামের ন্যায় উর্ব্বর ক্ষেত্র বাঙ্গালায় নাই। এই আসামের অর্দ্ধেকেরও অধিক স্থান অনাবাদী পড়িয়া আছে। খসিয়া পাহাড় অনেক স্থানেই অনাবাদী। আমাদের দেশের কোন কোন মহাত্মা যদি আসামকে জীবনের লক্ষ্য করিতে পারেন, তবে যে সকল দেশেরও উপকার হয়, আমাদের দারিদ্র্যও দূর হয়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, একজন বাঙ্গালীকে দেখিলাম না, যিনি আমাদের উন্নতির জন্য, বিশেষত উর্ব্বর কর্ষিত-ক্ষেত্র খসিয়াদিগের উন্নতির জন্য কিছু করিতেছেন! এ কলঙ্ক, এ দুঃখ আর রাখিবার স্থান নাই। গৃহের পার্শ্বে, বঙ্গের কোলে, আসামের কত অভাব দেখিয়া আমরা কিছুই করিতেছি না! কেবল কথায় কি দেশ উদ্ধার করা যায়? জীবন-রক্ত ঢালিয়া দিয়া যদি আসামের উন্নতির জন্য কেহ চেষ্টা করিতে পারেন, তবে তিনিই দেশ উদ্ধারের বীজমন্ত্র বপন করিবেন। এমন উর্ব্বর অনাবাদি ক্ষেত্র ভারতের আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। এই সময়ে কেহ যদি এই বিভাগে কর্ত্তব্য-চক্ষুকে ফিরান, তবে দেখিবেন, বুঝিবেন, তাঁহার দ্বারা কি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। চেরাপুঞ্জিতে একটী স্কুল স্থাপন করিয়া, খসিয়াদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিতে পারিলে এবং বাঙ্গালীর রক্তে খসিয়ার রক্ত মিশ্রিত হইলে যে বংশ উৎপন্ন হইবে, তাহাদের দ্বারা ভারতের অনেক অভাব দূর হইতে পারিবে। চেরাপুঞ্জির বায়ু কোন অংশে দারজিলিঙ্গ অপেক্ষা মন্দ নহে। ক্ষেত্রের ত কথাই নাই। এই স্থানে যদি ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত বাঙ্গালার দরিদ্র পরিবার সকল যাইয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন, এবং খসিয়াদিগের সহিত সামাজিক আচার ব্যবহারে মিলিত হন, তবে কালে বাঙ্গালীর আদর্শে, ইহাদিগের অনেক উপকার হইবে, এবং কালে ইহাদিগের দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন লোক কোথায়? এমন মহৎ,

সমদুঃখী কে আছেন, যিনি বক্তৃতা ছাড়িয়া কার্য্যে মনোযোগী হইবেন,—যশের আশা ছাড়িয়া জীবনকে নির্জ্জন প্রদেশে ভাসাইবেন,—কল্পিত সুখকে উপেক্ষা করিয়া পরের উপকারে মনোযোগী হইবেন। যত দিন ভারতে এ প্রকার স্বদেশপ্রেমিক লোকের অভ্যুদয় অসম্ভব, ততদিন যেন বাঙ্গালী ইংরাজকে বৃথা ঘৃণা না করে। আমাদের লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই। হায়, যে ইংরাজদের অসংখ্য অসংখ্য মহাত্মা পরের উন্নতির জন্ম অকাতরে জীবন দিতেছেন, তাঁহাদের সংস্রবে কি ভারত কখনও দীক্ষিত হইবে না? ইংরাজের দোষালোচনা লইয়াই কেবল যে রহিল, সে-আর এই জাতির মহত্ত্ব কি বুঝিবে? অসার কথা সর্ব্বস্ব বক্তৃতাকে দিক্‌ অসার রাজনীতির আন্দোলনকে শতধিক্‌!

স্বামী ও স্ত্রী।

স্বামী ও স্ত্রী, সৃষ্টির এক অপূর্ব্ব জিনিস। অপূর্ব্ব—স্বামীর নিকট স্ত্রী, এবং স্ত্রীর নিকট স্বামী। এই উভয়বিধ জিনিসেই সৃষ্টিরক্ষের মূল নিহিত।

* এই প্রবন্ধটী লইয়াও কিছু আন্দোলন উঠিয়াছিল। প্রবন্ধটিতে কেবল আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ দুঃখ করিয়াছেন। আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত করাই আমার লক্ষ্য। সমাজে যে কুনীতি দুর্নীতি প্রবাহে চলিতেছে, তাহাই যে চিত্র করিতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই। সমাজের অনেকেই মিথ্যা কথা বলেন, সুতরাং মিথ্যা কথারই অনুকীর্ত্তন করিতে হইবে কি? আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত করাই আমার উদ্দেশ্য, এবং তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কথা—কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, প্রবন্ধটিতে (Conservative) অনুদার-শ্রেণীর মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একথাটিও সত্য। স্বাধীন প্রণয়ের (Free love) যাহারা পক্ষপাতী, তাহারাই উদারনৈতিক (liberal)! এসম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বলিবার নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, প্রবন্ধটিতে কুরুচি আছে। আমি কিন্তু সে কথাটা বুঝিলাম না। রুচি—একমাত্র উদ্দেশ্যের ভাবভেদের উপর নির্ভর করে। শরীরতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা স্ত্রী এবং পুরুষের জননশক্তি সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহা কিছু কুরুচি নয়। কদর্য্য ভাব উদ্দীপিত করিতে যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহারাই কুরুচির প্রশ্রয় দেন। আমি তাহা করি নাই। এ সকল বিষয়ের অবতারণা করিতে গেলে কোন কোন অপরিহার্য্য কথা না বলিয়াই থাকিতে পারা যায় না। যাঁহারা তাতে "কু" দেখেন, তাঁহাদের মনেই আশঙ্কা আছে। এই বিন্দু-বারি-পূর্ণ পৃথিবী তাঁহাদের বাসের অযোগ্য। কেন? তাহা বুঝাইয়া বলিবার আর দরকার কি? যাঁহারা সত্য-বিবাহের

এই উভয়বিধ মিলিনেই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সংসার-গরল-সাগরে অমিয়া ধারা, প্রয়োজন-দগ্ধ-শুষ্ক-মরুভূমিতে এক মাত্র শান্তির ধারা—স্বামী ও স্ত্রী। উভয় উভয়ের দ্বারা জীত, উভয় উভয়ের দ্বারা বশীকৃত, উভয় উভয়ের দ্বারা উপকৃত। স্বর্গের মন্দাকিনী, জীবন-উৎসের একটী মধুর ধারা,—দাম্পত্য প্রেম। স্বর্গ, মর্ত্ত্য,—আকাশ পাতাল—সব বাঁধা এই মধুর প্রেমের ডোরে। মানুষের মনুষ্যত্ব—ইহারই চরম ফল।

ফুল ফুটে কেন ?—পাখী গায় কেন ?—ঝরণা চলে কেন ?—চাঁদ হাসে কেন ?—মলয় বহে কেন ?—এ সকলের এক উত্তর, এ সকলের প্রয়োজন আছে। পুরুষের হৃদয় কঠিন কেন ?—নারীর হৃদয় কোমল কেন ?—উভয়ের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য কেন ? উভয় উভয়ের নিকট মধুর কেন ?—উভয় উভয়কে চায় কেন ? পৃথিবীতে রিপুর সৃষ্টি কেন ? ইহারও একমাত্র উত্তর, প্রয়োজন আছে। সৃষ্টি, বিকাশের জন্য লালায়িত। এ সকলেরই উদ্দেশ্য—সৃষ্টিবিকাশ সাধন করা। কাহার ইঙ্গিতে, কে জানে, সকলই ক্রমাগত সেই বিকাশের পথে ছুটিতেছে। পরস্পর সকলে ক্রমাগত সৃষ্টি-বিকাশেরই সহায়তা করিতেছে। দাম্পত্য-প্রেম, সৃষ্টি বিকাশের মূল বিন্দু।

কি জানি কেন, মানুষ, সময়ে সময়ে সৃষ্টি-বিধানের অতীত হইতে চায়। কি জানি কেন, মানুষ প্রতি ঘটনায়, প্রতি কার্য্যে, প্রত্যেক বিধানে ঈশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে চায় না। উষ্ণ রক্তের জোরে মানুষ মনে করে, সৃষ্টি-বিধানকে অতিক্রম করিয়া বুঝি পবিত্র থাকা যায়। দাম্পত্য-প্রেমকে যাহারা সৃষ্টির অপরিহার্য্য বিধান বলিয়া না বুঝিয়া ঘৃণা করে, বা উপেক্ষার চক্ষে দেখে, তাহারা শ্মশানের জীব—মরুভূমির বালুকণা, পৃথিবীর পাপের ভাণ্ডার। তাহারা করিতে না পারে, এমন কোন কার্য্যই নাই। ভালবাসা—তাহাদের নিকট স্বপ্ন। ভালবাসা তাহাদের নিকট প্রহেলিকা। ভালবাসা—তাহাদের নিকট তুচ্ছ। সন্তান-বাৎসল্য এবং দাম্পত্য প্রণয়ই রিপু বা রক্তমাংসপূর্ণ সংসারে—প্রেমের আদর্শ। এই উভয়বিধ ভালবাসাকে যাহারা ঘৃণা করে, তাহারা অহঙ্কার-স্ফীত মানবশরীরে পশুবিশেষ। তাহাদিগকে মানুষের আদর্শ ভাবিয়া ভুল করিও না।

পক্ষপাতী, তাঁহারা যে এ প্রবন্ধটিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের জন্য আমার কিছুই করিবার বা বলিবার নাই।

প্রেমে যাঁহার হৃদয় মত্ত—প্রকৃত ভক্তির পাত্র তিনি। ভক্তি, প্রণয়ীর হৃদয়-উৎসের মধুর ফল।

কিন্তু এখানে একটী কথা আছে। যাঁহারা বিশ্বপ্রেমাবতার রূপে জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহুকে প্রশস্ত করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, উদার বিশ্বজনীন প্রেম-প্রচারই যাঁহাদের লক্ষ্য,—বিশ্বজনীন প্রেমেরই বিকাশ যাঁহারা, তাঁহাদিগকে প্রেম শিক্ষার জন্য গৃহ বা পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রেম শিক্ষার জন্য ম্যাট্‌সিনি বা যিশু-খ্রীষ্টের যে বিবাহরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা মনে করি না। প্রেমের লক্ষ্য অনন্ত,—দাম্পত্য-প্রেম যখন অনন্ত প্রেমের পথ খুলিয়া দিয়াছে, তখন চৈতন্যকে যে আবার গৃহে বদ্ধ থাকিতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। এই সকল মহাত্মারা প্রেম-স্বর্গের ফুল—প্রেমই তাঁহাদের সৌরভ, প্রেমেরই বিকাশ তাঁহারা। কিন্তু মনে রাখিবে—এ জগতে ম্যাট্‌সিনি, খ্রীষ্ট বা চৈতন্য—সকলেই নয়।

মানুষ বড়ই মূর্খ—মানুষ প্রেমে স্বার্থ-বীজ রোপণ করে। যে প্রেমে স্বার্থ আছে, সে প্রেম প্রেমই নয়। প্রেমের পথ, আত্ম বিসর্জ্জন। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে স্বার্থ মৃত। প্রেমের অনুরোধে, বাধ্য-বাধকতায় মানুষ যেখানে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতে পারিয়াছে—আপনার জন্য আর যেখানে কিছুই নাই, অহঙ্কার যেখানে বিসর্জ্জিত হইয়াছে,—সেইখানেই প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হইয়াছে। স্ত্রীর স্বামীতে, স্বামীর স্ত্রীতে যেখানে বিসর্জ্জিত, সেইখানেই দাম্পত্য-প্রেমের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, স্বতন্ত্র-বোধ রহিয়াছে, স্বাধীনতা রহিয়াছে যেখানে, সেখানে বিবাহ হয় নাই; সেখানে দাম্পত্য প্রেম নাই। ভারতবর্ষ দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ বলিয়া খ্যাত। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা ইহারা মানব-সমাজে নরদেহে দেব-কন্যা, ইহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম জগতের আদর্শ। কিন্তু প্রেমের জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ, এ দেশেও, পুরুষের ভাগ্যে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। এই জন্যই দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য্য অপরিবর্দ্ধিত থাকে নাই। এ দেশের রাধিকা এবং ভগবতী—প্রেমেরই রূপান্তরিত দুটী স্বর্গীয় ফুল; তাই তাঁহারা আদর্শ।

দাম্পত্য-প্রেম শূন্য যে বিবাহ পৃথিবীর বায়ুকে কলুষিত করিয়াছে, তাহা নরকের জিনিষ। তাহা রিপু-সেবার উপকরণ মাত্র। সমাজের

এবম্বিধ সাইদেশ-প্রথার কোনই মূল্য নাই। প্রকৃত সতীর হৃদয়ের কথা—"এ হৃদয় তোমার, এদেহ তোমার, এ সর্ব্বস্ব তোমার, স্বামি, আমি তোমারি, তুমি আমার, হৃদয়ের দেবতা, আমি চিরকাল তোমার দাসী।" প্রকৃত স্বামীর তিরোধানে সতীর জীবন ভার বোধ হয়—বেহুলা, সাবিত্রী প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। প্রকৃত স্বামীর কথা, "সতি, তুমি ফুলের সুবাস, চক্ষের অঞ্জন, হৃদয়ের ভূষণ, আমি চিরকাল তোমার অস্তিত্বেই জীবিত। তোমারই অভাবে আমি মৃত, তুমিই আমার হৃদয় রাণী।" সতীর অভাবে মহাদেবের উন্মত্ততা বড়ই স্বাভাবিক, বড়ই মধুর চিত্র। এক বৃন্তের দুটী ফুল, এক শাখায় দুটী পাখী, এক নদীতে দুটী তরঙ্গ। যেখানে একটী নাই, সেখানে অপরটীও নাই,—থাকিয়াও যেন নাই। দাম্পত্য প্রেমটা যে কি, তাহা লোকে বুঝিতে বড়ই ভুল করে। স্বামীর অভাবে স্ত্রীর, এবং স্ত্রীর অভাবে স্বামীর বাঁচিয়া থাকা বা মরিয়া যাওয়ার অর্থ সমান। সেখানে বা এখানে—যেখানেই থাকুক, দুয়ের মন-মিলন চাইই। মনে মনে মিলন, শরীরে শরীরে মিলন,—একটুও স্বতন্ত্র-বোধ নাই—দুই মিলিয়া একীভূত। একীভূত দুটী হৃদয়। অদর্শন—প্রেমিকের পক্ষে অসহ্য। ভগবানগত প্রাণ যার, ভগবানের অদর্শন সে সহিতে পারে না। স্বামীপ্রাণা স্ত্রী স্বামীকে বা স্ত্রীপ্রাণ স্বামী স্ত্রীকে ভুলিয়া মোটেই থাকিতে পারে না। ভোলা অসম্ভব। ভুলিয়া যাওয়াই যেন পাপ। জীবন মরণ আর কি?—স্মৃতিতে রাখিলেই জীবন, ভুলিলেই মরণ। স্বামীকে ভুলিয়া ব্যভিচারিণী স্ত্রী;—ঐ দেখ নরকে ডুবিতেছে! মৃত স্ত্রীকে ভুলিয়া ঐ দেখ স্বামী কোন্ পাপে ডুবিয়া মরিতেছে! পাপেই মানুষের মরণ। পুণ্যাত্মা মরিয়াও জীবিত। স্বামীকে ভুলিয়া সতী স্ত্রী থাকিতে চায় না, থাকিতে পারে না; স্ত্রীকে ভুলিয়া প্রকৃত স্বামী জীবিত থাকিতে বাসনা রাখে না। শ্রীহরি এবং চৈতন্যের মরণ-অদর্শন-জনিত। দর্শন, চোখেও হয়, মনেও হয়। চোখে বা মনে বিদ্যমান থাকিলেই হইল। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম যেখানে, সেখানে স্বামীর অভাবে স্ত্রীর মৃত্যু, স্ত্রীর অভাবে স্বামীর মৃত্যু—অবশ্যম্ভাবী। স্বামী মরিয়াছেন, অথচ স্ত্রী বিদ্যমান আছেন, ইহা ভুল কথা। স্বামী যেখানে নাই, সতীও সেখানে নাই, জীবিত থাকিয়াও নাই। সতী যেখানে নাই, স্বামী সেখানে তিরোহিত। ইহাই স্বাভাবিক। একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। স্বামীই অবলম্বন সতীর, সতীর অবলম্বন স্বামী। স্বামী-শূন্য সংসার

সতীর নিকট শ্মশান! সতী স্বর্গে গেলে স্বামীর মনও স্বর্গ চায় বা স্বর্গে যায়। স্বামী স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সতী সংসারে মনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি না। "স্বামী গিয়াছেন, গিয়াছেন, তাহে আমার কি, আমি সংসার করি"—এরূপ কথা সতীর নয়। সতীর ইচ্ছা সেখানে নাই। ইচ্ছা করিয়া মরা অবশ্য পাপ। ইচ্ছা বা কামনা-বিরহিত সতী, কে জানে কার ইঙ্গিতে, এখানে মন বাঁধিতে পারে না। হাজার চেষ্টা কর, কিছুতেই তার মন বাঁধিতে পারিবে না। সে তোমার সংসার আর চায় না। সে ঐ আকাশে, ঐ বিশ্বপিতাতেই ডুবিতে চায়। ইহাও ঈশ্বরেরই বিধান। স্বামী গিয়াছেন, সেও ঈশ্বরের বিধান, স্ত্রী যে পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী হয়, সেও ঈশ্বরের বিধান। তিনিই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সতীকেও লইয়া যান। সংসার কে করিবে, পুত্র কন্যা কে পালন করিবে, এ হিসাব সতী গণিতে বসিবে না। প্রাণের আবেগ লঙ্ঘন করিয়া সে কেমনে থাকিবে? সে থাকিতে পারে না। তার ইচ্ছা সেখানে নাই। সতীর স্বামী ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং স্বামীর তিরোধানে সতীর আর কি থাকে? একের তিরোধানে অপরের অস্তিত্ব বিদ্যমান যেখানে, সেখানে দাম্পত্য-প্রেমের অভাব; সেটা দূষিত রিপুসেবার উপকরণ মাত্র। প্রকৃত বিবাহ জীবনে একবার মাত্র হয়। বিপত্নীক বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহেরই অঙ্গ বিশেষ। ইহা অত্যন্ত দূষিত। সমাজে প্রকৃত বিবাহ হইতেছে না বলিয়া, সমাজের কলঙ্ক অপনয়নের জন্য এ সকল রিপুমূলক বিবাহের অস্থায়ী উপকারিতা স্বীকার করিতে চাও, কর, কিন্তু ইহাকে প্রেমের আদর্শ বলিয়া কখনই ভুল করিও না। যত দিন প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের সৃষ্টি না হইতেছে, তাবৎ এই সকল বিবাহ অপরিহার্য্য। অপরিহার্য্য বলিয়াই কিন্তু আদরের জিনিস নয়। যে বিবাহে প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের উদয় হয় নাই, অথচ রিপুর চরিতার্থ হইতেছে, সে বিবাহ আরো ঘৃণার জিনিস। বাল্য বিবাহ বিবাহই নয়, সুতরাং বাল-বিপত্নীক বা বালবিধবা কুমার কুমারীর পুনর্ব্বিবাহ সর্ব্বদাই যুক্তিসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি নাই, এবং থাকিতে পারে না। আর্য্য সমাজ-সংস্কারকদের অগ্রণীগণও এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। এক সতী, এক স্বামী, ইহাই আদর্শ। বহু বিবাহ, দাম্পত্য প্রেমের বিরোধী কথা

মানুষের স্বার্থ-দ্বেষ না তিরোহিত হইলে, প্রকৃত প্রেম-তত্ত্ব উদিত হয় না। একবার স্বার্থ অস্তে ডুবিলে আর কি বাকী থাকিবে যে, অপরকে দিবে? মানুষের যেমন দুটী মাতা নাই, দুটী পিতা নাই, সেইরূপ দুটী স্ত্রী থাকাও অসম্ভব। এক এক জনের ভিতরে ভালবাসার এক এক রূপ বিকশিত। মরণেই আত্মার শেষ নয়, সুতরাং অনন্ত কাল স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ। মৃত-স্বামী-পুত্র স্ত্রীর বিবাহ এবং মৃতা স্ত্রী-পুত্র স্বামীর বিবাহ, উভয়ই ঘৃণার জিনিস। প্রেমের চক্ষে সুন্দর কুৎসিত ভেদাভেদ নাই, সব সমান। দাম্পত্য-প্রেম যাহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত, সে অন্য রমণী বা অন্য পুরুষের প্রতি কখনই কুটিল নয়নে তাকাইতে পারে না। তাহার নিকট একমাত্র সুন্দর তাহার স্ত্রী, বা তাহার স্বামী। সমাজ দাম্পত্য-প্রেমহীন হইয়া পড়িয়াছে, বাল্য বিবাহকে বিবাহ নামে অভিহিত করা হইতেছে, বিবাহটা রিপু-সেবার একটা উপকরণ হইয়া উঠিয়াছে, এই গুরুতর বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের দুই ভিন্ন বিধান সমাজে চলিতেছে বলিয়াই বিধবা-বিবাহের সপক্ষে কথা বলিয়া থাকি। দাম্পত্য-প্রেমহীন বাল্য-বিবাহের স্রোত প্রবাহিত থাকিয়া সমাজকে কলুষিত করিতেছে বলিয়া পুনর্বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে, নচেৎ পুনর্বিবাহ কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। প্রকৃত বিবাহ একবার ভিন্ন আর হইতে পারে না। বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই আদর্শ বিধান। কিন্তু যত দিন বাল্য বিবাহ প্রচলিত, এবং পুরুষের বহু বিবাহ স্রোত প্রবাহিত, ততদিন সে কথা খাটে না। পুরুষের বহুবিবাহ উঠিয়া গেলে, এবং বাল্য-বিবাহ নিবারিত হইলে যদি প্রকৃত ভালবাসা-মূলক আদর্শ-বিবাহ প্রচলিত হয়, যদি প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের অভ্যুদয় হয়, তবে বিধবা বিবাহের কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। বহুবিবাহে সমাজ এবং দেশের ভয়ানক দুর্গতি হইতেছে। কৌলিন্যের সৃষ্টি, লম্পটের সৃষ্টি, বিবাহ-শিথিলতার চরম ফল। বিবাহ-শিথিলতা বা বাহুল্যে দাম্পত্য-প্রেম তিরোহিত হইয়াছে। তাহাতে সতীদাহ নিবারণ হইয়াছে যে দিন হইতে, সেই দিন হইতে বিবাহ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে, দাম্পত্য প্রেমের মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছে *।

* পত্রের পর্বটি এবং পূর্ব্বের কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম না করিলে এ কথাটিতে কোন কোন লোকের মস্তিষ্ক শিহরিয়া উঠিবে! আত্মহত্যা, অবশ্যই পাপ, যখন লোক ইচ্ছা করিয়া মরে; আত্মহত্যা তখন পুণ্য, যখন ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া লোক মরে, অর্থাৎ যখন মানুষের ইচ্ছা আর থাকে না। স্ত্রী ও ঈশ্বরের ইচ্ছা-বর্জিত মৃত্যু যে অন্যায় তাহাতে সন্দেহ, এ কথা আমরা

অথবা দাম্পত্য-প্রেমের তিরোধান বুঝিয়াই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ-রূপ-কলঙ্ক নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং বেণ্টিঙ্ক সে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন প্রকৃত সতী ছিল না বলিয়াই, তাঁহারা এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, নচেৎ ইচ্ছা-বর্জ্জিত আত্মত্যাগ নিবারণ করে, কোন্ আইনের সাধ্য? তখন সতীদাহ হইত না, চিতা-গ্নির দাহ হইত, তাই আইন এ কার্য্যে সফল-কাম। আজও যে বেণ্টিঙ্ক এবং রাজা রামমোহন রায়কে এরূপ পূজা করা হইয়া থাকে, ইহাতেও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, আজও দাম্পত্য-প্রেমের পুনরুত্থান সাধন হয় নাই। পাশ্চাত্য জ্ঞান এবং সভ্যতা, আর্য্য বিবাহ-প্রথাকে যে বড়ই কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতায় এসম্বন্ধে যে কি মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, এক মুখে তাহা বলা যায় না। হা ভারত! হা দাম্পত্য-প্রেম! হা সতীত্ব! হা স্বামীত্ব!

বিবাহ-শিথিলতার আর একটী প্রধান কারণ, বাল্যবিবাহ, এবং বিবাহ-চাঞ্চল্য। মানুষের বাল্যলীলা দেখিয়া ভাবী জীবন-গতি নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। বাল্য-কালে শিশু বালক বালিকার মন অপরিপক্ক। অপরিপক্ক মন লইয়া যখন তাঁহারা অভিভাবকগণের উত্তেজনায় পরিণীত হয়, তখন বরকন্যা পরস্পর পরস্পরকে একটী খেলার সামগ্রী মাত্র মনে করে। "দেখিতে দেখিতে ভালবাসা গাঢ় হইতে পারে,—এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমমূলক। খেলার সামগ্রীর প্রতি যেমন ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা, বস্তুত এদেশের বালক বালিকারা সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা লইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হয়। তারপর যখন শরীরের সহিত মন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে মন মিলে না। উভয়েরই জীবন-গতি সময়ে সময়ে উভয়ের প্রতিকূলে দাঁড়ায়। পরস্পরের জীবন তখন

বাঁচিবই বাঁচিব। *জীবন এবং মরণ, বিরাগীর নিকট উভয়ই সমান। বাঁচাই বা কি, মরাই বা কি? বিরাগী বাঁচিতেও ইচ্ছা করেন না, মরিতেও চান না। তাঁহার একমাত্র কামনা—ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তাঁর ইচ্ছা বুঝিয়া যে থাকে, সেও স্বর্গের পুতুল; তাঁর ইচ্ছা বুঝিয়া যে মরে, সেও স্বর্গের কুসুম। "Let thy will be done"—একথা বলিয়া যাহারা অপরিহার্য্য বিধানে যে মরণকে স্পর্শ করিতে পারে, সে ত বৈকুণ্ঠের জীব। মরণকে যাহারা আত্মার শেষ সীমা মনে করে, তাহারা অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুকেও ভীষণ বিভীষিকা দেখে। প্রকৃত সতী, বা প্রকৃত বিরাগীর পক্ষে জীবন মরণ দুই সমান। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া যে প্রাণ দেয়, সে স্বর্গের দেবতা, পাপী কখনই নয়।

পরস্পরের নিকট ভারস্বরূপ মনে হয়। এক জনের মাত্র অহনে অপরের আর অভিলাষ থাকে না। এদিকে পাশ্চাত্য-সভ্যতা অবিবেক-শিক্ষা দিতেছে, প্রাণ না চায়, স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর। বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা আর্য্য-আইন-বিরুদ্ধ, সুতরাং তখন যুবক যুবতীরা মনে মনে মন ভাঙ্গিয়া আপন আপন খেয়ালের পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। ভুক্ত বিবাহে তখন দারুণ গরল উৎপন্ন হয়। গৃহে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। বৈরিতার বল পুষ্ট হয়। লম্পটতার পঙ্কিল স্রোত দেশে প্রবাহিত হইতে থাকে। বাল্যবিবাহ দেশের এক বিষম অনিষ্ট সাধন করিতেছে। মন-মত বিবাহ না হওয়ার দরুণ, কোথাও বিবাহটা কেবল রিপু-সেবার উপকরণ রূপে ব্যবহৃত, কোথাও বা গৃহকার্য্যের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—ব্যভিচার বা রিপুদোষ। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রেমহীনতা। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—হৃদয়হীনতা। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—পশুত্ব। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের অভাবে পিতা পুত্রকে ভালবাসে না, পুত্র পিতাকে নরকের দেবতার সহিত তুলনা করে, শ্রদ্ধা করে না, পূজা করে না। এই প্রকারে সমাজের পবিত্র স্বর্গীয় সম্বন্ধগুলি পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে অপবিত্র রূপ ধারণ করিতেছে। ইহারই পরিণাম—গৃহ-বিবাদ, বা স্বার্থ-সাধনের জন্য আত্মীয়তা-বিসর্জ্জন। এ সকল যখন উপস্থিত হয়, তখন দেশ নরকের অভিনয় দেখাইয়া মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে। তখন যে মানুষের চেহারা যে কিরূপ কদাকার হয়, মানুষ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। এইরূপ বিবাহ যাহাতে প্রচলিত না হয়, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই তৎপক্ষে চেষ্টা করা উচিত। এরূপ বিবাহকে বিবাহ নামে অভিহিত করাতেও পাপ আছে। বরং এরূপ বিবাহ-ভঙ্গের আইন বা সামাজিক নিয়ম থাকা উচিত। কিন্তু খুব সাবধানে এ বিচার করা উচিত। বিবাহ-ভঙ্গ (Divorce.) প্রথা খুব-সতর্কতার সহিত অবলম্বিত না হইলে সমাজের আরো অনিষ্ট হয়। বাল্যবিবাহ প্রথা তুলিয়া দিয়া আদর্শ-বিবাহ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। আদর্শ বিবাহের পর আর বিবাহ-ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত রাখা মোটেই উচিত নয়। বিবাহ-ভঙ্গ প্রথায় মুসলমান সমাজ, খ্রীষ্টান সমাজে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আর্য্যসমাজ হইতে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে পারিলে, আদর্শ বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, বিবাহ-ভঙ্গ প্রথার কোন রূপেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

আর এক প্রকার বিবাহ-প্রথা সমাজে দেখা দিয়েছে, তাহাকে বিবাহ-চাঞ্চল্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বালকদিগকে একটু সতর্ক করিয়া দিয়াছে, বালকেরা সাধারণত আর ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহিত হয় না। ১৬ বৎসরের পর তাহাদিগের একটু বিবাহ-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে থাকে। এই সময়ে বিবাহের প্রস্তাব হইলে, তাহারা হিতাহিত জ্ঞান-শূন্যের ন্যায় কেবল বাহ্য রূপ দেখিয়া মজিয়া পড়ে। ভিতরের গুণাগুণ বিচার নাই—বাহিরের রূপই এই সময়ে প্রধানত বিবাহের উপকরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৬।১৭ বৎসরের বালক মানসিক সৌন্দর্য্য কি বুঝে? আজানু-লম্বিত কৃষ্ণবর্ণ কেশবিন্যাস, গোলাপী গণ্ড, উজ্জ্বল নাসিকা, ঈষৎ বঙ্কিম ভ্রু, মধুর কটাক্ষ, মধুর হাসি, হাসিতে অমৃত, অধরে কোমলত্ব, এই সকলই বালকের মন কাড়িয়া লয়। বালক তখন অধীর হইয়া পড়ে। শিক্ষা বা উন্নতির পথে অর্গল পড়িয়া যায়। শিক্ষালয় কর্কশ হইয়া পড়ে, গৃহ বা শ্বশুরালয় মধুর হইয়া উঠে। পত্রের পর মধুর পত্র প্রেরিত হইতে থাকে। এই প্রকার বিবাহ-চাঞ্চল্যে কত বালক যে অপাত্রীর সহিত পরিণীত হইয়া শেষে অনুতাপ করিয়াছেন, কে তাহার গণনা করিতে পারে? যৌবন যখন ফাঁকি দেয়, চাঁদমুখ যখন নিষ্প্রভ হয়, সুধা যখন গরল হয়, অসময়ে সন্তান প্রসবে বালিকার সোনার রূপ যখন মিলিয়া যায়, হায়, হায়! তখন কত যুবক, গৃহকে, স্ত্রীকে যে জীবনের ভার মনে করে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? মন তখন অন্যত্র গিয়া পড়ে, অন্য যুবতীর মধুর কটাক্ষ তখন বড়ই মিষ্ট!! এইরূপ বিরক্তি উদয়ে স্ত্রী এবং স্বামীর মন যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন ভালবাসা বিজলীর ন্যায় আকাশে বিলীন—মানুষ তখন পশু। বিবাহ তখন ভঙ্গ; বিষপ্রয়োগে তখন যদি স্ত্রী বা স্বামীর প্রাণ বহির্গত নাও হয়, তবে অন্তর্বিষ গরল পানে হৃদয় পুড়িয়া যখন ভস্ম হয়, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না। এইরূপ বিচ্ছেদে কত সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়া গিয়াছে, কত সোনার অট্টালিকা পিশাচের নৃত্য-নিবাস হইয়া রহিয়াছে! বঙ্গভূমি এইরূপ জীবন্ত পিশাচের ক্রীড়াক্ষেত্রে আজ মলিন। বঙ্গদেশ এইরূপ পিশাচের নৃত্যে আজ নিস্তেজ ও হীনপ্রভ!!

সামাজিক যত জটিল প্রশ্ন আছে, আমাদের মতে তন্মধ্যে বিবাহ-প্রশ্ন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই প্রশ্নের সম্যকরূপ মীমাংসার উপরই সমাজের উন্নতি

সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। দুই আত্মার একত্বসাধন, এ বড়ই শক্ত কথা। এই সাধনে অসিদ্ধিই যে বর্তমান সমাজের শিথিলতা বা চরিত্রহীনতার প্রধান কারণ, এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। অথচ অনেকেই এই বিষয়ে উদাসীন। কি উপায় ধরিলে, স্ত্রী ও স্বামীর একীকরণ সাধিত হইতে পারে, এ কঠিন প্রশ্নের মীমাংসার উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যত দিন সদুপায় আবিষ্কৃত না হইবে, ততদিন উচ্ছৃঙ্খল সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই।

আজ কাল মানুষ বড়ই স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা নহে—স্বেচ্ছাচারিতা। এই স্বেচ্ছাচারিতা-মূলক স্বাধীনতাপ্রধান যুগে—বিবাহরূপ অধীন শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে এক শ্রেণীর লোকের মন চায় না। একথাও স্থানে স্থানে উঠিতেছে যে, বিবাহ-প্রথা তুলিয়া দিয়া স্বেচ্ছা-ভালবাসার * প্রথা প্রতিষ্ঠিত কর। এ সকল পাশ্চাত্য কুশিক্ষার একদেশদর্শী মত সকলের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করাই উচিত। এই ঘৃণিত মতের আলোচনাতেও পাপ আছে। প্রেমশিক্ষা মানবের একমাত্র লক্ষ্য। প্রেম-বিকাশের প্রধান আশ্রয়, পিতা মাতা, ভাই, ভগিনী, এবং সকলের উপরে স্ত্রী এবং স্বামী। এ সকল ভালবাসার উৎকর্ষ সাধন ক্ষেত্র—পরিবার। পশুসমাজে পরিবারের মধুরতা নাই। পশুসমাজে পুত্রই সময়ে মাতার স্বামী হয়। পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, স্বামী স্ত্রী—এ সকল মধুর সম্বন্ধ উঠিয়া যাইলে মানুষের প্রধান লক্ষ্য, সমাজের মুখ্য পরিণাম—ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই সকল সম্বন্ধের মধুরতা—সম্পূর্ণরূপে বিবাহরূপ অধীন শৃঙ্খলে নিবদ্ধ। বিবাহরূপ অধীনতা মানিও না,—পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্বামী স্ত্রী—এ সমস্ত সম্বন্ধ তখন ছিন্ন;—তখন মানুষে আর পশুতে কোনই পার্থক্য নাই। এই সকল ঘৃণিত অসার কথার আর অধিক সমালোচনা করিতে চাহি না, আমরা এই পর্যন্ত বলি, যে কারণে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিবাহ প্রথা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, সেই সকল কারণ আমাদের দেশে উপস্থিত হইলে, এ দেশের দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। হতভাগ্য ভারতের দুর্দিন আরো নিকটবর্তী হইয়া আসিবে।

* স্বেচ্ছা-ভালবাসা—Free love এর বাঙ্গলা অনুবাদ। শরীরের সহিত, রিপুর সহিত যদি সম্বন্ধ না থাকে, তবে স্বেচ্ছা-ভালবাসাকে প্রেমের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যায় বটে।

সেখানে—মুখে স্বাধীনতার কথা, পতিতের ও সমাজ কর্ত্তৃত্বের সমুখ মুখই বলিবে। জীব বা স্বাধীন—কেবল মুখেই। অধীনতা—অনু অধীনতা—তবেই মনের মধুরতা ফুটে। প্রেমের বিকাশ কেবল—অধীনতায়। অধীনতার যে বিষ দেখে, সে ও দাম্পত্য প্রেমের মহত্ত্বের ভিতর মধ্যে ডুবিবেই; তাতে যেন মুক্তি হয়? প্রেমের মূলেই অধীনতা। নির্ভর এবং বিশ্বাসেই অধীনতার প্রাণ। যেখানে বিশ্বাস এবং নির্ভর নাই, —সেখানে অধীনতা নাই, সেখানে প্রেমও নাই। ভালবাসা ত্যাগ বই আর কিছুই নয়। মা সন্তানকে ভালবাসে, তার অর্থ কি, না ত্যাগ?—তার অর্থ, আপনাকে ভুলিয়া সন্তানের জন্য খাটিয়া খাটিয়া দেহ বিসর্জ্জন দেওয়া। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, তার অর্থ কি, ত্যাগ? অর্থ, স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্ত্রীর প্রাণ বিসর্জ্জন। অধীনতা ভিন্ন প্রেম নাই। ভগবৎ-ভক্তি, সেও অধীনতা; স্বামী ভক্তি, সেও অধীনতা; মাতৃ ভক্তি, সেও অধীনতা; দেশ ভক্তি, সেও অধীনতা। "আমি তোমারি, তুমি যা বলিবে, প্রাণ দিয়াও তাহা করিতে পারি"—এ ভাব না হইলে ভালবাসায় মধুরতাই হয় না। রাধিকার প্রেম দেখ। রাধিকা কলঙ্কিনী, তার কুল নাই, মান নাই, জাতি নাই, ধর্ম নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, শ্যামের জন্য সর্ব্বস্ব সে ঢালিয়া দিয়াছে। রূপের জন্য নহে—গুণের জন্য। বাঁশরীর স্বর—রাধার প্রাণে সদাই যেন বাজিতেছে, সে আর কত স্বর শুনিয়াছে, কিন্তু ঐ শ্যাম-বাঁশরীর মধুর-ধ্বনি কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। আর কিছুতেই তার মন নাই, আর কিছুই তার নিকট সুন্দর নয়। ঐ শ্যামরূপই তার প্রাণের আরামের বস্তু। কাল কিছু দেখিলেই তার প্রাণ অস্থির হয়—সে জলের মধ্যে মেঘের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সখীকে কাঁদিয়া বলে—"জলের মধ্যে মেঘ লুকায়ে রয়েছে মণি; আবার ঘাটে পথে সমান হলো, প্রাণ বাঁচানের উপায় কি?" যেখানে সেখানে রাধা ঐ কৃষ্ণ রূপই দেখে, ঐ শ্যাম-বাঁশরীর স্বরই শুনে! ঐ স্বরই সে শুনিবে, ঐ চরণেই সে পড়িয়া রহিবে। মার, কাট, যাহা ইচ্ছা কর, কিছুতেই শ্যাম-প্রণয়ের বিরাম নাই। কৃষ্ণ-প্রাণ, কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ-নাম—কৃষ্ণ-জীবন, রাধিকার। প্রেমের টানে রাধার সকল বিসর্জ্জিত হইয়াছে। এই সতীর ভালবাসায় আধ্যাত্মিকতা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ভগবানের উপর যখন এই রূপ প্রেমের উদয় হয়, তখন মানুষ দেবতা হয়, তখনই প্রকৃত ভক্তির অভ্যুদয় হয়। এক প্রেমের

জন্য রাধিকা কলঙ্কিনী; টাকার জন্য নয়, যশের জন্য নয়,—মানুষের একমাত্র লক্ষ্য মধুর প্রেমের জন্য রাধা মজিয়াছে, ডুবিয়াছে, কুল ছাড়িয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় অবশ্য দাম্পত্য প্রেম নহে, তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে এবং তাহা প্রচারিত হইয়াছে। মহাদেব এবং ভগবতীর প্রেমের গভীর অর্থও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, প্রমীলা, বেহুলা ও মন্দোদরী প্রভৃতি মহিলাগণের সতীত্ব বা গভীর প্রেমের ইতিহাস এখনও উজ্জ্বল। মরণের ভয় নাই, দস্যুর ভয় নাই—অরণ্যের ভয় নাই—স্বামীর জন্য সতী অভয়া। স্বামী লখিন্দরের মৃত শরীর লইয়া সতী বেহুলা অকূলে ঝাঁপ দিয়াছেন, স্বামীকে বাঁচাইবেন, তবে ছাড়িবেন। ক্রমে মৃত স্বামীর শরীর পচিয়া উঠিল, কৃমি কীট জন্মিল, কিন্তু বেহুলা-প্রেম তবুও অবিচলিত? বেহুলা তখনও অকুণ্ঠিত ভাবে দুর্গন্ধময় স্বামীর শরীরকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন;—তখনও কীট এবং মাছি বাছিয়া ফেলিতেছেন! সীতা, সাবিত্রীর কথা আর কি তুলিব! তাঁহারা ত অরণ্যবাস বা যমকেও ভয় করেন নাই! স্বর্গ, তুমি এই খানে। স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ তখনই, যখন প্রণয়ে স্বার্থ নাই। ভারতে আর কি সে স্বর্গের আবির্ভাব সম্ভব হইবে না? বর্ত্তমান যুগের লোকেরা একথার উত্তর দিতে অসমর্থ।

স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, যতদূর সম্ভব, পঙ্কিল হইয়া গিয়াছে! রিপুর উত্তেজনা মিটিয়াছে, ভালবাসা বাড়িয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, কিন্তু ভালবাসা আরো গভীর হইয়াছে,—এ দৃশ্য আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রী চলিয়া গিয়াছেন, স্বামী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া মৃত শরীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, কিম্বা স্বামীর স্বর্গারোহণে স্ত্রী আরো গভীর, আরো ভালবাসা, আরো পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, এ দৃষ্টান্ত অতি বিরল! ভালবাসা যেখানে, স্বর্গ সেখানে। এক জনকেও যে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছে, অনন্ত প্রেমের বীজ তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে। কিন্তু কই, সেরূপ গভীর নিঃস্বার্থপ্রেমিক ব্রহ্মচারী কোথায়? ইন্দ্রিয়-যোগ ঘুচিয়া যায়; স্ত্রী এবং স্বামীর সম্বন্ধ যেন আর নাই! চতুর্দ্দিকে এইরূপ দৃশ্য। এই যে স্বার্থমূলক, ইন্দ্রিয়মূলক প্রণয়, ইহাকে কখনই প্রেম বলিয়া ভুল করিও না। ইহা আসক্তি, ইহা মোহ, ইহা নরক, ইহা পশুত্ব। সংসারে পশুত্বের অভিনয়—প্রেমহীন রিপু পরিচালনায়। প্রেমের বিকাশ মানুষের লক্ষ্য, কিন্তু রিপুর বিকাশ নয়। রিপু ত দশ দিনের বই নহে;

প্রেম অনন্ত কাল স্থায়ী। অনন্ত-স্থায়িত্বের সহিত ক্ষণস্থায়িত্বের কিছু যোগ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু ক্ষণস্থায়িত্বই লক্ষ্য নয়। স্ত্রী ও স্বামীদের লক্ষ্য—অনন্ত প্রেম-সাধন। যে প্রেম নিতি নিতি নূতন হয়, যাহাতে পুরাতনত্ব মোটেই নাই, সেই অনন্ত প্রেম সাধন। যেখানে মানুষ এ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, মানুষ সেখানে পশু, পরিবার সেখানে নরক। সেখানে মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্ব রাজত্ব করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধ রিপু-পরিচালনার উপকরণ বই আর কিছুই নয়। এই পশুত্ব সমাজে প্রশ্রয় পায়, ইহা কখনই সঙ্গত নয়। এই পশুত্বের স্রোত প্রতিরোধ করিবার মানসে যাহারা বিবাহ-বন্ধ ব্রত বা কুমারিব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ, স্বীকার করি; কিন্তু মহৎ নয়। এই সৎ ব্রত গ্রহণ করিলেই সমাজ পবিত্র হইবে না। বরং আরো উক্ত অসভ্যতা বৃদ্ধি পাইবে। বিবাহ-প্রথা, যাহাতে দাম্পত্য প্রেম সাধনার উপযোগী হইতে পারে, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহারই সহায়তা করা উচিত। বিবাহরূপ বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে প্রেম-শিক্ষা একরূপ অসম্ভব; সুতরাং ইহাকে ঘৃণার চক্ষে বা উপেক্ষার চক্ষে না দেখিয়া ইহাকে সংশোধন করা উচিত। বিবাহের মূলে বিশ্বশক্তি বিকশিত, তাঁহাকে ভুলিয়া প্রেম সাধন হয় না। স্ত্রী এবং স্বামীর মনকে বিশ্বশক্তিতে মজাইয়া দেওয়া চাই। সেই শক্তিকে বুঝিতে না পারিলে মানুষের সাধ্য কি, রিপু ভুলিয়া প্রেমের সেবা করিবে? সেই প্রেমই আসল প্রেম, দাম্পত্য প্রেম, যাহার লক্ষ্য সেই শক্তি। সেই প্রেমের সাধনায় জয়ী হইলে রিপু পরিচালনা হয়, হউক, কিন্তু প্রেমের পূর্ব্বে রিপুর কথা উঠিলেই বিপদ। প্রকৃত প্রেম, বাহ্যরূপ চায় না। প্রেম কেবল ভিতরের রূপ বা অনন্ত সৌন্দর্য্য-পিপাসিত। ভিতরের শক্তি ভুলিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিবাহ যত দিন নিবদ্ধ, ততদিন প্রেমের জন্য মানুষ বিবাহিত হইতেছে না, নিশ্চয় বুঝিবে। যে যুবক কেবল নারীদের রূপ দেখিয়া মজিতে চায়, সে ধর্ম্ম বা নীতি, প্রেম বা পুণ্য, এ সকলের কিছুই ধার ধারে না। সে কেবল পাশব বৃত্তি পরিচালনা করিতে চায়। এরূপ বিবাহ পশুত্বেরই প্রশ্রয় দেয়। এরূপ বিবাহের পোষকতা করা কখনই উচিত নয়। দাম্পত্য-প্রেমের পরিচয় যে বিবাহে পাওয়া যায় না, যে বিবাহের মূল লক্ষ্য ধর্ম্ম সাধন নয়, সে বিবাহে কাহারো যোগ দেওয়া উচিত নয়। রূপজ-মোহ বড়ই অনিষ্টজনক। হায়, আমি কত বন্ধুকে যে এই মোহে পড়িয়া

প্রাণ বা মনুষ্যত্ব হারাইতে দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছি, পৃথিবীর অধিবাসী তাহার কিছুই জানে না। কত বড় পণ্ডিতের পতন হইতেছে, এই রূপজ-মোহে। দিনে দিনে কত মহত্ত্ব, কত জ্ঞানত্ব, কত মনুষ্যত্ব—এই মোহে যে ডুবিয়া যাইতেছে, কে গণিতে পারে? কত দেবত্ব, পশুত্বে পরিণত হইয়া যাইতেছে, এই রূপজমোহের ছলনায়! অতএব সাবধান, আপনার জন্য সাবধান, সমাজের জন্য সাবধান! তাই, আপনি মজিও না, সমাজকেও মজাইও না। প্রেমের পথে যাইতে চাও, ভাল কথা, অগ্রসর হও; কিন্তু আপনাকে ডুবিয়া পরীক্ষা করিয়া লইও, রিপু এবং বাহ্যরূপ ভুলিতে পারিতেছ কি না, পরীক্ষা করিবে—স্বার্থের অঙ্কুর ডুবাইতে পারিয়াছ কি না, পরীক্ষা করিবে, বিশ্বশক্তিকে রমণীর হৃদয়ে দেখিতে পারিতেছ কি না? যদি না পারিয়া থাক, অগ্রসর হইও না। বিসর্জ্জন না দিলে, জীবন পাইবে না। স্বামীত্বকে ডুবাইতে না পারিলে স্ত্রীত্বে মিশিতে পারিবে না। স্বামী আপনার মহত্ত্বে কেবল স্ত্রীর মহত্ত্ব বসাইবেন। স্ত্রী আপন গুণ ভুলিবেন, কেবল স্বামীর গুণ দিবানিশি স্মরণ করিবেন। স্বামীত্ব, স্ত্রীত্বে এবং স্ত্রীত্ব স্বামীত্বে যখন ডুবিবে, তখনই একাত্মক প্রেম উদ্ভূত হইবে। তাহাই স্বর্গের মন্দাকিনী। তাহাই সংসারে শান্তি-সলিল, তাহাই মানুষে অমিয়া-ধারা। তাহাই মানুষের লক্ষ্য। তাহারই ভিতরে বিশ্বপতি শক্তিরূপে বিরাজিত। তাহারই ভিতরে ভগবতী বিশ্ব-বিকাশের মূল বীজ রোপণ করিতেছেন। যদি তাই, এরূপ প্রেমের অঙ্কুর হৃদয়ে দেখিতে না পাইয়া থাক, সাবধান,—সাবধান!! সন্তান উৎপাদন—প্রেমের ফল না হইয়া যখন রিপুর ফল হয়, তখন মাতৃ ভক্তির স্থানে সন্তানের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এই ঘৃণার উদ্রেকের সহিত মাতার মাতা পরম মাতার প্রতি বালক বালিকার অবিশ্বাস জন্মে। জগৎ আপনি উদ্ভূত হইয়াছে, হইতে পারে, এই বিশ্বাসই সন্তানের মনে তখন আশ্রয় লয়। এইরূপ অবস্থার বিশ্বাসহীনতা, প্রেম-হীনতা যে কতদূর প্রশ্রয় পায়, তাহার পরিচয় আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ সমূহ। ধর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া মানব কোথায় রিপুকে আরো ভুলিবে, আরো ভুলিবে, না দিন দিন আরো আঁটিয়া ধরিতেছে। এক একজন লোকের দশ পনরটী সন্তানই উৎপন্ন হইতেছে! এক বিবাহের পর পর কত বিবাহই হইতেছে! অথচ দাম্পত্য-প্রেমের পরিচয় আদবেই পাওয়া যাইতেছে না। স্ত্রীবিয়োগে অমনি দশটী সন্তান লইয়া স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতেছেন! কোন কোন সমাজে

কয়টী সমাজে কত বিধবা স্ত্রীও দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতেছেন। মুসলমান সমাজের দুর্গতি, এবং পাশ্চাত্য সমাজ সমূহের শিথিল অবস্থা যখন স্মরণ হয়, তখন শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে;—বিধবা বিবাহের পক্ষে আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। মূল কথা, স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধে যতদিন সংসারের অতীত মিলন, বিপুল উত্তেজনা থাকিবে, ততদিন কিছুতেই সংসার মধুময় হইবে না। বাল্যবিবাহ যে কারণে দোষের, যৌবন চাঞ্চল্যবিবাহও সেই কারণে দোষের। সমাজের বিবাহ প্রথার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ থাকিতে দাম্পত্যপ্রেম-মূলক বিবাহ অসম্ভব, ইহা এক শ্রেণীর লোকের চিন্তা করা উচিত; রূপজ-মোহ থাকিলে যৌবন বিবাহ বিঘ্নকারক, ইহাও আর এক শ্রেণীর লোকের চিন্তার বিষয়। মধ্যের টানে, ধর্ম্মের মায়ায় মোহিত হইয়া যতদিন স্ত্রী পুরুষে মিলিতে না পারিবে, ততদিন বিবাহে কেবল গরলই উৎপন্ন হইবে। স্ত্রীর এবং স্বামীদের মূলে সংসারের অতীত কিছু বিদ্যমান। সেই সংসারাতীত কিছুর পানে দৃষ্টিকে না ফিরাইয়া যাহারা সংসারের চোখ লইয়া ওদিকে চাহিবে, এবং মজিবে, তাহারা আপনারা ত গেলই, সমাজকেও ডুবাইয়া যাইল। স্বামীর ভিতরে, স্ত্রী যদি স্বামীর স্বামীকে না দেখেন, তবে প্রকৃত স্বামী-সেবা অসম্ভব; আর স্বামীও যদি স্ত্রীর হৃদয়ে শক্তিরূপিণীকে না দেখেন, তবে স্ত্রী-সেবা তাহা অসম্ভব। উভয়ের মূলে যে অদ্বিতীয় শক্তি বিদ্যমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করা চাই, নচেৎ বিবাহ নরক। উভয়ের মধ্যে স্বর্গের অমিয়া ধারা ঢালিয়া দিয়া যিনি পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে টানিতেছেন, বাঁধিতেছেন, মিলাইতেছেন, তাঁহাকে যে না দেখিল, তাঁহার এ পথে আসা বিড়ম্বনা মাত্র। এই মিলনের মূলে স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান। দুটী নদীকে মিলাইয়া এক করেন—তিনি। তাঁহারই অজস্র করুণাপ্রবাহ এখানে প্রবাহিত। তাঁহার করুণাতেই স্বামী স্ত্রীর উপযোগী, স্ত্রী স্বামীর উপযোগিনী,—হৃদয়ে হৃদয়, চোখে চোখ, প্রাণে প্রাণ। একের কোলে অপরের মস্তক, একের দেহে অপরের দেহ। একের জীবনে অপরের জীবন। স্বাধীনতায় অধীনতা, জ্ঞানে প্রেম, প্রেমে কর্ম্ম। ত্রিমিলন, মধুর মিলন। বিবাহ—মধুর মিলন। এই রূপ স্বর্গের দিকে চক্ষুকে ফিরাইয়া, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ যখনই লক্ষ্য পাবে, এই বিবাহের মধ্যে পা

বেজিতেছে, তখন স্বর্গ হইতে কল্যাণাশীর্বাদ বর্ষিত হইতেছে ; মধুর উলু-
ধ্বনিতে দেশ পূর্ণ হইতেছে—প্রেমের সতীকে ধরা প্লাবিত হইয়াছে ;
বিশ্ব-পুরোহিত এইরূপে দুটী হৃদয় মিলাইয়া এক করিয়া দিতেছেন। এই
আদর্শ-বিবাহ যাহাতে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণপণে সকলের সে জন্য
চেষ্টা করা উচিত। শিশু-বিবাহ যাহাতে দেশে প্রশ্রয় না পায়, তজ্জন্য সক-
লের বিশেষ চেষ্টা করা আরো উচিত। বিবাহ যদি স্বর্গের পরিবর্তে নর-
কের চিত্র আঁকিল, তবে সে বিবাহে প্রয়োজন কি ? বিবাহ যদি দাম্পত্য
প্রেমের শোষণ নাশ করিয়া স্বেচ্ছাচারের বিজয় নিশান উড়াইয়া দেশকে
রিপু-প্লাবনে ডুবাইতে লাগিল, তবে সে বিবাহের কে আদর করিবে ?
দেশ ডুবিয়া গিয়াছে ! পাশ্চাত্য শিথিল-বিবাহ প্রথা বঙ্গ সমাজের অণুতে
অণুতে প্রবেশ করিয়াছে ! রিপুর অত্যাচারে পুরুষ এবং স্ত্রী পশুতে পরিণত
হইয়াছে ! হায় ! সোণার ভারতের আজ কি দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে !
ব্যভিচার প্রণয়ের মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, বহুবিবাহ দাম্পত্য-প্রেমের নামে
পোষিত হইতেছে। ধর্মের পুণ্যপ্রবাহে দেশ আমূল ধৌত না হইলে, এই
পঙ্কিল সমাজের উদ্ধারের আর উপায় নাই। যত দিন পর্য্যন্ত ভারতসন্তান
ধর্মে অনাস্থাবান, ততদিন সমাজরক্ষার আর উপায় নাই।

সংসারে যখন আদর্শ-বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন মানুষ আধ্যা-
ত্মিক জগতের এক গভীর সত্য-ধামে উপনীত হইবে। সংসারের স্বামীত্ব এবং
স্ত্রীত্ব—স্বর্গের মধুর সম্বন্ধ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জগৎ বিধাতার
আদেশ বর্ত্তমান। প্রকৃত সতী, এবং প্রকৃত স্বামী—সংসার-সংগ্রামে জয়ী
হইয়া দেখেন—বিশ্বেশ্বর স্বামীরূপে হৃদয়-সতীকে আলিঙ্গন করিতে বাহু
বিস্তার করিতেছেন। সংসার তখন নিবিয়া গিয়াছে,—লজ্জা তখন ভাগি-
য়াছে, নব প্রাণে সতী স্বামীকে পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় আলিঙ্গন করিতেছেন !
কি মধুর চিত্র ! স্বর্গ অবতীর্ণ ! মন্দাকিনী প্রবাহিত ! সতী তখন মহাদেবের
জন্য দক্ষেরগৃহে প্রাণত্যাগ করিতেছেন ;—মহাদেব তখন উন্মত্তের ন্যায়
সতী-দেহ স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতেছেন !! সে মহানন্দে পৃথিবী নাচিতেছে।
রাধিকা তখন কুল ছাড়িয়া কৃষ্ণরূপ-কলঙ্কে ঝাঁপ দিয়াছে। তোমার সংসার
থাক্, তোমার সুখ থাক্,—রাধা সে সব কিছুই চায় না। সে স্বয়ং বিধাতার
প্রেমে তখন উন্মাদিনী। আইন কানুন, সমাজ শাসন, সব তুচ্ছ কথা।
বাঁধিয়া ধরিয়া কাহাকেও কুলে রাখা যায় না, সংসারে বাঁধা যায় না। যে

স্বামী পরিত্যক্তা বিধুকেই তোমরা কত জনিয়া স্বামী ভিন্ন অন্যের পূজা করিবে না,—অন্য কাহাকে স্থান দিবে না। সতী আর স্বামী, হৃদয়ে এক জন, [illegible] যদি থাকে। [illegible] সেখানে। সেখানে অভাব নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই—সতী আর স্বামী পরস্পরে সেবা করিতে থাকে। সেখানে নিত্য রাসলীলার উৎসব হইতেছে। সমানে সেখানে [illegible] ভগবানের আবির্ভাব হইলেই মর্ত্ত্যে বৈকুণ্ঠ এবং স্বর্গ অবতীর্ণ হয়।

বুঝিলে, পাপের নরক-ক্ষেত্র কোথায়,—আর? উহাই সংসারে—পবিত্র পরিবারে বা স্বামী স্ত্রীর মধুর মিলনে। মানুষ যদি বৈকুণ্ঠবাসী হইতে বাসনা থাকে, একবার আদর্শ স্বামী, বা আদর্শ স্ত্রী হইবার জন্য প্রার্থনা কর। কেবলই যাগযজ্ঞ লইয়া, কেবলই যোগে পড়িয়া, কেবলই বিষ্ণুর সেবা করিয়া যদি দিন কাটাইবে, তবে নিশ্চয় ঐ নরকের অন্ধকারে তোমার পরিণাম। আদর্শ ধরিবে না, তবে কি নরকে ডুবিয়া মরিবে? হায়, তবে কি নরকে পচিয়া মরিবে? আদর্শ যাহা, তাহারই সাধনা কর। আদর্শ যাহা, তাহাই ধরিতে চেষ্টিত হও। নরকে জন্মিয়া যদি নরকেই থাকিবে, তবে আর ছাই কি হইবে! হায়—তবে আর মানুষের কি হইবে?

পাপের অনন্তত্বে আমি।

পৃথিবীর উত্তাপ এড়াইবার জন্য আমি ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। নিস্তব্ধ গহ্বরেই মস্তক রাখি, আর সুশীতল বট-ছায়াতেই বিশ্রাম লই, কিছুতেই পৃথিবীর কোলা-হল—পৃথিবীর উষ্ণ নিঃশ্বাস—দ্বেষাবিদ্বেষের দারুণ উত্তাপ আমাকে পরি-ত্যাগ করিল না। এখন আমি কোথায় যাই—এখন আমি করি কি? পৃথিবীতে এমন সুহৃদ কে আছে, যে কষ্ট স্বীকার করিয়া বলিয়া দিবে, আমি কি করি?

আমার অবস্থা, ভাই পাঠক, তোমাকে কিছু খুলিয়া বলিতেছি। আমি বড় পাপী। আমার প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি প্রশ্বাসে, প্রতি শোণিত বিন্দুতে বিন্দুতে পাপ,—কেবল পাপ—অনন্ত পাপ বিমিশ্রিত—বিজড়িত। যেটিকে যখনই পাপ বলিয়া বুঝিতেছি, তখনই সেটিকে পরিত্যাগ করিতেছি বটে—

কিন্তু একটী পরিত্যাগ হইতে না হইতে দশদিক হইতে দশটী আসিয়া বেড়িতেছে। যত পরিত্যাগ করি—ততোধিক আক্রমণ। একটী যাইতে, দশটী আসে। দশটী যায় ত শতটী আশ্রয় লয়। এমনই করিয়া আমি যতই পাপাঙ্কুরদিগকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, রক্তবীজের গোষ্ঠি ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অনন্ত পাপ-কুণ্ডে—অনন্ত অভাব-সাগরে আমি পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এই বিশাল অনন্ত অভাবের হস্ত হইতে যে আমি রক্ষা পাইব, আমার সে আশা কখনও ছিলনা, আজও নাই। এই ত আমার অবস্থা। কিন্তু কাহার অবস্থা আমার ন্যায় নহে? যতই পাপ-বোধ জন্মিবে, ততই নূতন পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আজ একটীকে পাপ বলিয়া বুঝিতেছি, কল্য দশটী বুঝিব—দশটী বুঝা শেষ হইতে না হইতে শতটী। পাপ-বোধ একবার জন্মিলে আর তাহার শেষ নাই। কিন্তু এই ত অবস্থা চরিত্র-পাপ-কীট আমরা বহিয়াছি, আমরা আবার কত অহঙ্কারে মত্ত! ছোট পাপী আবার অহঙ্কারস্ফীত বক্ষে কত বড় পাপীর প্রতি ঘৃণা-কটাক্ষপাত করিতেছে। পাপীদের আবার বড় ছোট কি? বরং ইহাই ঠিক, যে বড় ধার্ম্মিক, সে আপনাকে বড় পাপী মনে করে, কারণ তাঁহার পাপ-বোধ সকলের অপেক্ষা অধিক। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাপার সেরূপ নহে। একটু ধর্ম্মের বাতাস গায়ে লাগাইয়া পাপীই, পাপীকে ঘৃণা করিতেছে! অমুক ব্যভিচারী,—অমুক পরনিন্দুক—অমুক কপটাচারী, এই প্রকার কত ভেদাভেদের সৃষ্টি করিয়া কত দম্ভ—কত ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু একবারও ভাবিতেছি না যে, আমার পাপ-বোধই অন্যের পাপ-বোধের কারণ নহে। আমি আজ যেটীকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছি, অন্য সকলেও যে ঠিক সেইটীকেই পাপ বলিয়া বুঝিতেছে, ইহা ঠিক নাও হইতে পারে। উন্নতির তারতম্যানুসারে পাপ-বোধের তারতম্য জন্মিবেই জন্মিবে। পিতৃগণ যাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আমি হয়ত সে সকলকে বর্ত্তমান অবস্থায় পাপ বলিয়া মোটেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। এই প্রকারে এমন অনেক পাপ আছে, যাহা তুমি ও আমি দুই ভিন্ন চক্ষে দেখিতেছি। এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা তোমার ও আমার নিকট দুই বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মানুষের রুচি, প্রবৃত্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, বুদ্ধি ও ধারণা শক্তিও তেমনি পৃথক পৃথক। মানুষের উদ্দেশ্য পৃথক, কর্ত্তব্য পৃথক, মত পৃথক। পৃথকত্ব ঘুচিয়া যাইবে যে দিন, সেই

কিন্তু তোমার পাপ আমার নিকট পাপ বলিয়া বোধ হইবে ও হইতে পারে, সচেৎ নহে। তুমি বলিবে, কেন, এমন ত অনেক পাপ দেখিতেছি, যাহাকে তুমি ও আমি এক বাক্যে পাপ বলিতেছি। আমি বলি, তাহা অসম্ভব। পৃথিবীর তীক্ষ্ণ শাসন—ঢাকঢাকা-ঢাকঢাকি ভাব প্রভৃতি সকল ভুলিয়া যাও, তবে বুঝিবে, বাস্তবিক পৃথিবী যাহাকে পাপ বলিতেছে, তাহা তোমার আমার নিকট সকল সময়ে পাপ নাও হইতে পারে। পৃথিবীর প্রচারিত পাপকেই যে সকলে পাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, সে কেবল ভয়ে; পাপবোধে নহে। যে পাপে বোধ জন্মে, সে পাপে লিপ্ত হইতে আর মানুষের সাধ থাকে না। পাপ বোধ জন্মে না, অথচ মুখে পাপ স্বীকার করে বলিয়াই মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। পাপ-বোধ না হইলে, পাপ, মানুষের নিকট পাপ নহে। এমন কোন ঘটনা নাই, যাহা সকল সময়েই পাপ। যাহাতে মানবের আত্মার অপকার হয়, তাহাই পাপ। কোন্‌টী কখন কাহার নিকট পাপ, তাহা বিবেক স্পষ্ট বলিয়া দেয়। আমার বিবেক যাহাকে পাপ বলে না, সময় বিশেষে তোমার বিবেক তাহাকে পাপ বলে বলিয়াই তাহা পাপ নহে। হিন্দু এবং খ্রীষ্টানের বিবেক কত বিভিন্নপথগামী! সুধা, এক সময়ে সুধা, এক সময়ে গরল। গরল, আবার ঘটনা পরম্পরায় এক এক জনের নিকট সুধার ন্যায় হইতেছে। মুখে পাপ বলা, ও অন্তরে পাপ-বোধ এক কথা নহে। আবার বলি, পাপ-বোধ জন্মিলে, মানুষ আর সে পাপে কখনই লিপ্ত হইতে পারে না। যতদিন যেটীর পাপ-বোধ না জন্মে, ততদিনই সেটীকে মানুষ আদর করে; যখন পাপ-বোধ তখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে। অন্তরে সাধ থাকিলেই পাপ বোধ হয় না। পৃথিবীর সাধু লোকেরা মিথ্যা কথা বলাকে পাপ বলিয়া গিয়াছেন। আমিও বলিতেছি, মিথ্যা বলা পাপ। বলিতেছি বটে, কিন্তু কাজের বার হাজার মিথ্যা কথা বলিতেছি। এই যে আমি মিথ্যা কথাকে পাপ বলিতেছি, ইহাই পাপ-বোধ নহে। পাপবোধ ভিতর হইতে যখন জন্মে, তখন মানুষ আর তাহাতে লিপ্ত থাকিতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি, পৃথিবীর লোকেরা যে ব্যাখ্যা করিতেছে, আমার নিকট তাহা পাপ হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর লোকদিগের নিকট তাহা পাপ নাও হইতে পারে। চৈতন্য আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন, তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তবে হয়ত বুঝিতেন যে, আমি যাহা করিতেছি, সে সকলই পাপ কার্য্য। কিন্তু

না বুঝিয়া আমি যাহা করিতেছি, তাহা আমার পাপ কার্য্য নহে। আমি যাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা না করাই আমার ধর্ম। না করাই কি ? যে বিষয়ে পাপ বোধ হয়, সে বিষয়ে লিপ্ত থাকা মানুষের পক্ষে কিছু কঠিন। যেখানে বোধ নাই, সেখানে পাপও নাই। অজ্ঞান অবস্থায়, অবোধ অবস্থায় মানুষ যাহা করে, তাহা কখনই পাপ হইতে পারে না। পাপ ঘটনা নহে, পাপ মনের একটী অবস্থা মাত্র। উন্নতির তার-তম্যানুসারে মনের অবস্থা ভিন্ন রূপ হয়। বিবেক তখন উজ্জ্বল হয়। এই মনের অবস্থা যাহার যেরূপ, সে পাপকেও সেইরূপ দেখে। যে পাপ, এক-জনের নিকট মহা পাপ; তাহাই একজনের নিকট পুণ্য হইতে পারে। হইতে পারে নহে, তাহা পৃথিবীতে অনেক স্থলে পুণ্য হইতেছে। সরল বিশ্বা-সের জন্য মানুষ কখনও দায়ী হইতে পারে না। বিবেকের স্পষ্ট আদেশে যে যাহা সরল ভাবে বুঝিতে পারে, তাহা পালন করিলেই তাহার পুণ্য হয়। যে পাপে বোধ জন্মে, সেরূপ পাপে মানুষের আর মন যায় না বটে, কিন্তু আরো দশটীকে তখন পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে। তুমি অধিক পাপী, কি আমি অধিক পাপী, তাহা তোমার আমার ভাবিবার অধিকার নাই—ভাবিবার শক্তি নাই। কারণ তোমার পাপ আমার নিকট পাপ বলিয়া বোধ নাও হইতে পারে, এবং আমার পাপ তোমার নিকট পাপ বলিয়া বোধ নাও হইতে পারে। স্থির ভাবে যখন ভাবিয়া ও চিন্তা করিয়া দেখি, তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না। সামান্য দৃষ্টান্তেই আমরা পরাস্ত হইয়া যাই। আমরা সকলেই অন্নাহার করিতেছি, কিন্তু এই অন্নাহারে তোমার শরীরে যে উপকার হইতেছে, আমারি শরীরেও যে ঠিক তেমনই হইবে, কোন বিজ্ঞান তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। যে ঔষধ খাইয়া তোমার প্রকৃত উপকার হইতেছে, সেই ঔষধ সেবনেই আমার অনিষ্ট হইতে পারে—ইহা প্রতি দিনের ঘটনা। এই জন্যই বিজ্ঞান আজও এ সকল বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিল না,—এই জন্যই চিকিৎসাশাস্ত্র আজও অস-ম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে। আমরা এই হিসাবে জগৎকে দেখিলে, পাপী আর পুণ্যাত্মা, এই ভেদাভেদ আর থাকিতে পারে না। কে সাধু কে অসাধু, কে পাপী, কে পুণ্যাত্মা, মানুষ আপন বুদ্ধিতে তাহা ঠিক রূপে কখনই বুঝিতে পারে না। পাপীই সময়ে মানুষের নিকট পুণ্যাত্মা হইতেছে, পুণ্যাত্মাও পাপী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এই রূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া, মানুষ,

কেবল অন্যায়েরই পূজা হইতেছে, কেবল অবিচারেরই জয় দিতেছেন; সৃষ্টির দিন, পৃথিবী কখনও এই অন্যায়ের পূজা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এই অন্যায়ের জয়ের প্রভাবেই কোন মানুষ ঈশ্বরের অবতার হইয়া পূজা পাইল, কোন মানুষ মানুষের শোণিত-পাত করিয়া রক্তপিপাসা নিবৃত্তি করিল। জড়-পূজার দিন, মানুষ পূজার দিন চলিয়া যাইতেছে, লোকের বলে, কিন্তু কোথায় যাইতেছে? প্রকারান্তরে, জড়পূজা, মানুষ পূজা অন্তরে ভিতর প্রভাবেই রাজত্ব করিতেছে। মানুষ, যতদিন আপন বুদ্ধির বিচারে পাপী ও পুণ্যাত্মা, সাধু ও অসাধুর বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে, ততদিন এভাব থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে, এমন একদিন আসিবে, যখন এই অন্যায়, এই অবিচার, এই অসত্যের পূজা পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইবে। যখন বড় ছোট, পাপী পুণ্যাত্মা, এরূপ ভেদাভেদ আর মানুষ গণিবে না;—যখন সকল বস্তুতেই ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে;—যখন প্রত্যেক আপন বুদ্ধিতে অন্য জনের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বয়ং ভাল হইবার জন্যই ব্যস্ত থাকিবে;—যখন মানুষ অন্যের চক্ষের ভুল না দেখিয়া নিজের ভুল দেখিতেই ব্যস্ত থাকিয়া জীবনকে শেষ করিতে পারিবে। যখন লোক বিপদ-বিঘ্ন ও অভাব-সাগরের মধ্যে পড়িয়া যায়, তখন আর কি কিছু বিচার করিবার অবসর থাকে?—পাপ বোধ জন্মিতে জন্মিতে যখন মানুষ পাপের অনন্তে নিমগ্ন হইয়াছে, বুঝিতে পারে, তখন অসম্পূর্ণ মানুষের অন্য আর কিছুই গণনার বাসনা থাকে না। তখন কেবল মনে হয়—কেমনে উদ্ধার পাইব, কেমনে রক্ষা পাইব? অকূল সাগরে পড়িয়া কে কবে অন্যের কথা ভাবিতে পারিয়াছে? পাপ বোধ জন্মিলে, নিশ্চয়ই পাপকে অনন্ত বলিয়া মনে হয়। একটু একটু জ্ঞান হইতে হইতেই তবে জ্ঞানকে অনন্ত মনে হয়। পাপ-হ্রদকে অতলস্পর্শ বলিয়া যে না জানিয়াছে, তাহার পক্ষে অন্যের উদ্ধারের চিন্তা সম্ভবপর হইতে পারে, স্বীকার করি। কিন্তু যে জানে, সাগরে ডুবিলে আর উঠিবার শক্তি নাই, সে নিজে ডুবিয়া কখনই অন্যের চিন্তা করিতে পারে না। পাপে ডুবিয়া পাপী অন্য পাপীর পাপ কি গণিবে? কোন পাপ বোধ জন্মিলে সে পাপ করা যেমন অসম্ভব, অন্য পাপীর কথা ভাবাও তেমনি অসম্ভব। এই পৃথিবীকে অভাবের গভীর সাগর বলিয়া যে না বুঝিয়াছে, সে অন্যের অভাব দেখিতে পারে, কিন্তু যে বুঝিয়াছে, সে আপনাকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত

থাকিবে। কে তুলিবে, কে উদ্ধার করিবে,—প্রতিক্ষণ কেবল এই চিন্তা। অকূল পাপ-সাগর—কূল নাই, কিনারা নাই! কেমনে উঠিব, কেমনে বাঁচিব, কেমনে জীবন পাইব—পাপীর পাপ-বোধ জন্মিলে কেবল এই চিন্তা দিবানিশি জাগিবে। আমার বড় দুঃখ, আমি ঠেকিয়া, ঠেকিয়াও শিখিতে পারিতেছি না। পাপ-সাগরে পড়িয়াও অন্যের পাপ দেখিয়াই ফিরিতেছি। ধরি ধরি, ধরিতে পারি না। পাই, পাই, শিখিতে পারি না। পৃথিবীর সকলকে আদর করিব—সকলকেই বিশ্বেশ্বরের ছবি বলিয়া ভাবিব,—সকলকেই মঙ্গলময়ের সৃষ্ট বলিয়া মনে করিব, ভাবি, কিন্তু আবার সংসারের উত্তাপে পড়িয়া সব গোলমাল হইয়া যায়! ঘৃণা বিদ্বেষের জীবন উত্তাপে আমার প্রাণ যায়—জীবন যায়—সব যায়! অহঙ্কার, আত্মাভিমানে—আমার জীবনতরু পরিবর্জ্জিত হইল! অনন্ত পাপে ডুবিয়া আমি মারা যাই! কি করিলে আমি এই সংসার-উত্তাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব, বুঝি না। পাপ-অন্ধকারে পড়িয়া আমি নিজে নিরুপায়, কিন্তু তবুও অন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি! এ রোগের ঔষধ কি? উপায় এক ছিল, এক ঔষধ ছিল, তাহা আমি ধরিয়াও ধরিতে পারিলাম না। বৃথা আড়ম্বরে, বাহ্য আন্দোলনে মাতিয়া আমার সোণার চাঁদকে হৃদয়ে পাইয়াও ধরিতে পারিলাম না। আমার পরশমণিকে প্রাণে পাইয়াও পুষিয়া রাখিতে পারিলাম না। যাঁহাকে পাইলে সব অভাবের অভাবও দূর হয়, আমি তাঁহাকে ভুলিয়া কেমন মলিন হইয়া বিষাদের সঙ্গীত গাইয়া গাইয়া ফিরিতেছি, ভাই পাঠক, তুমি একবার দেখ। এই পতিত, গলিত, ঘৃণিত সন্তানের উদ্ধারের জন্য সকলে একবার প্রার্থনা কর।

হতাশ-কাহিনী।

"I affirm with the greatest seriousness that the union of the soul with this terrestrial body is never better than the dissolution of them."—*Plato.*

"Though he slay me, yet will I trust in Him." "Islam means in its way Denial of Self.—Annihilation of Self."—*Carlyle.*

ধূ ধূ করে পথ—সীমা নাই, রেখা নাই, গাছ নাই, পাতা নাই—কিছুই নাই;—কেবল অনন্ত,—কেবল আঁধার, কেবল শূন্য,—কেবল—ভয়ানক নীরবতা। আমি কেমনে একাকী চলিব, তা কিছুই বুঝিতেছি না। একা

জল খাইয়াছি—খাইয়াই বিপদে পড়িয়াছি। এখনে আর মনের মানুষ জুটিতেছে না—কেহ সাথী নাই, কেহ অবলম্বন নাই—অকূল পাথার,—বিপদ সাগরে যাহারা কাছে ছিল, তাহারা যেন কোন্ স্বার্থ-খাঁচার মুখ ঢাকিয়া লুকাইয়াছে! যাহারা আসিতেছিল, তাহারা পথ ভুলিয়াছে,—কে জানে কোথায়, তাদের হাসিমাখা মুখ লুকাইয়াছে! তাহারা আর এ হৃদয়ের মুখ দেখিবে না,—তারা এপথের সাথী হইবে না! ভালবাসা নিবিয়াছে,—আসক্তি ফুরিয়াছে—খেলার মত্ততা ছুটিয়াছে—এখন অশ্রু মুছিয়া লইয়া অসহের তীরে বসিয়া দিবানিশি ভাবিতেছি—কেমনে এই অকূল পাথার পার হইব? সম্মুখে যে দুই একটী ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণা জ্বলিতেছিল, দেখিতে দেখিতে, চোখের নিমেষে, হায়, তাহা নিবিয়া গিয়াছে! কোথায় গেল, কোথায় গেল, বলিয়া ক্রমাগত খুঁজিতেছি, কিন্তু কিছুতেই খোঁজ পাইতেছি না। স্বর্গের চাঁদ অস্তমিত হইয়াছে—পূর্ণাশা ফুরাইয়াছে; পশ্চাতে কেহ নাই, সম্মুখে কেহ নাই। কাকে ধরিয়া চলিব, বা কার [illegible] হৃদয়ে অপেক্ষা করিব? অতীত যাহা, তাহা ফিরিবে না, ফুরাইয়াছে যাহা, তাহা আরই আসিবে না; যেটেই আসিবে কি না, তাহাই বা কে জানে? আমি অকূল অজ্ঞাত অসীম পাথারে পড়িয়া দিবানিশি ভাবিতেছি,—আমি ধরি কি?—আমি করি কি?

আমি চাই কি?—একটু হৃদয় চাই, একটু ভালবাসা চাই! এমন একটু হৃদয় চাই, যাতে আমার দুঃখের কান্না, সুখের হাসি, রোগের জ্বালা, শোকের বিষ ঢালিয়া শান্তি পাই। এমন একটু হৃদয় চাই, যাতে আমার এই চিন্তা-পীড়িত মাথাখানি রাখিয়া শীতল করিতে পারি। এমন একটু হৃদয়ের নিরাড়ম্বর গভীর ভালবাসা চাই,—যার চোখে চোখ রাখিলে প্রাণ জুড়ায়, শরীর শীতল হয়। আমি এমন একটী প্রেমের প্রতিমা চাই, যার কাছে প্রাণের কথা বলিলে প্রাণের জ্বালা দূর হয়,—যার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করিলে কথা সজীব হয়, চিন্তা বাঁচে, ভাব রক্ষা পায়। আমি এমন একখানি সরল ভালবাসাময় হৃদয় চাই, যার ভিতর দিয়া যাইলে অনন্ত প্রেমের তীরে পৌঁছা যায়,—যাকে এবং জগৎকে অন্তর-হৃদে [illegible] পাপের সুখ, স্বর্গের চিন্তা-শিশুগুলি ভালবাসা-জলসেচনের অভাবে [illegible] একে একে ঝরিয়া পড়িল! আমি বাঁচি কি লইয়া? এমন একটী বন্ধু, এমন একটী ভাই, এমন একটী ভগ্নী, এমন একটী গুরু, এমন একটী স্ত্রী, এমন একটি

পুত্র, এমন একটী কন্যা চাই—যাদের লইয়া আমি অনন্তের পথে হাসিমুখে নিভয়ে চলিতে পারি। চাই—একটী আদর্শ পরিবার। এমন একটী পরিবার—যাতে এই সকলের মিলন হইয়াছে। সকল যেখানে একাত্মক। সব সেখানে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। কোথায় বলত? মায়ের হৃদয়ে। আমি মায়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চাই। আমি মা-শূন্য পরিবার,—স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নী লইয়া এই অকূলপাথারে কি করিব? তারা যে, মরণের কথাই বলে! তারা ত বিপথই দেখাইয়া দেয়। তাই আমি সব ছাড়িয়াছি, অথবা আমাকে সব ছাড়িয়াছে! আমি মাকে চাই, আর মা-ময় প্রকৃতি চাই! মাতৃহীন শিশু কেমনে সংসার করিবে, তা বল? যার সংসার নয়, তার আর কে আছে? তাই বুঝি আমি একাকী।

মা-ময় প্রকৃতি, কথাটা বড় সহজ, কিন্তু সাধন বড়ই কঠিন। মাকে কে পাইবে? যে পৃথিবীকে তুচ্ছ করে?—যে পৃথিবীর ভালবাসা ভুলিয়া থাকে?—না, কখনই নয়। পথ—এই সংসার,—এই অনন্ত প্রকৃতি, এই অকূল সংসার-পাথার। এই অকূল পাথার উত্তীর্ণ হইলে তবে ত মায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে প্রকৃতিকে ঘৃণা করে, তুচ্ছ করে—মা তার নিকট হইতে অনেক দূরে;—অনন্তের পরে অনন্ত, তারও পরে, তারও পরে।

আমি বলিতেছিলাম;—আমি অনন্ত সংসার-পাথারে একাকী। সত্যই তাই। সেই জন্যই আনন্দময়ী মা আমার অনেক দূরে। তাঁর সে শুভ্র জ্যোতি দেখি না, সে স্বর্গের কান্তি ছুঁইতে পাই না। আমার ন্যায় পৃথিবীর পোনে ষোল আনা লোকের এই অবস্থা। তাই পৃথিবীতে এত অবিশ্বাস প্রাধান্য করিতেছে। মাকে যে, দেখে নাই, সে কেমনে বলিবে যে, মা আছেন? তাই ত লোক নাস্তিক, তাই ত লোক সন্দেহবাদী। হিন্দু নাস্তিক, মুসলমান নাস্তিক, খ্রীষ্টান নাস্তিক, বৌদ্ধ নাস্তিক, ব্রাহ্ম—নাস্তিক। নাস্তিক অপেক্ষাও ইহারা নাস্তিক। ইহারা মাকে না দেখিয়াও মায়ের কথা বলে—সুতরাং ইহারা মিথ্যাবাদী নাস্তিক। কেন বলিতেছি বলত? মাকে দেখিতে হইলে প্রকৃতি-সাধনে সিদ্ধিলাভ করা চাই। কে প্রকৃতিকে আপন বুকের ভিতরে পুরিতে পারিয়াছে? কে প্রকৃতিকে আপন শোণিতে মিশাইতে পারিয়াছে? কে প্রকৃতিকে লইয়া দিবানিশি ছলাচলি করিতেছে? কে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া, বান্ধব, বন্ধুর, ভগ্নীর সাধনের জন্য দিবানিশি চেষ্টা করিতেছে? কার আদর্শ বন্ধু আছে, আদর্শ স্ত্রী আছে,

আদর্শ নিকট আছে? যাহা কিছু আছে, সে ত স্বার্থের খোলস ;—স্বার্থ-পূর্ণ, ভালবাসা-শূন্য মৃতজীব। মৃতদেহের কথা বলিও না। কে আদর্শ দেখিয়াছে, পুলকিত-প্লাবিত হইয়াছে? কেহই নয়। আদর্শ কিছু নাই ;—দুনিয়াতে এই কথা, সমাজে এই কথা, দেশে এই কথা, রাজ্যে এই কথা। ভালবাসাটা স্বার্থসিদ্ধির একটা উপায় স্বরূপ হইয়াছে। কর্ম্মের পথে, কই কোন্ ভালবাসা সাহায্য করে? কে সহায়? কে আশ্রয়? যাকে তুমি বন্ধু বলিতেছ, সে তোমারই সর্ব্বনাশের জন্য গোপনে গরলমাখা শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়াছে! যাকে তুমি ভাই বলিতেছ, সে তোমার স্কন্ধের উপর চড়িয়া তোমার শোণিত শোষণেরই চেষ্টা করিতেছে! যাকে তুমি স্ত্রী বলিতেছ, সে গোপনে হৃদয় প্রাণ অন্যের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে! হৃদয়ে কলহ, সমাজে কলহ, দেশে কলহ। কলহের বীজই চতুর্দ্দিকে। তুমিও কাকে প্রাণ দেও নাই, তোমাকেও কেহ প্রাণ দেয় নাই। প্রাণ-বিনিময় স্থগিত হইয়া গিয়াছে ;—সে ব্যবসা আর চলে না। সে বিনিময়ের বাজারে তালা বন্ধ রহিয়াছে। পাষাণ-হৃদয় মানবেরা যে নূতন স্বার্থের বাজার বসাইয়াছে, সেখানে কেবল গরলের খেলা বসিয়া গিয়াছে। সেখানে হিংসা এবং আত্মপূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হায়, পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থা!

কিন্তু একটা অবস্থার দুই দিক দেখা উচিত। অন্য তোমার হইয়াছে কিনা, এই কথা ভাবিবার পূর্ব্বে, ভাবিয়া দেখ ত তুমি অন্যের হইতে পারিয়াছ কি না?—আপনাকে অন্যে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছ কি না? যদি না পারিয়া থাক, তবে অন্যকে পাইবে, সে আশা কেন? দেও নাই, তাই পাও নাই। আমিও দেই নাই, তাই আমিও পাই নাই। যদি প্রাণ তোমাকে দিতে পারিতাম, তবে তুমিও তোমার প্রাণ আমায় দিতে, নিশ্চয় দিতে। আমি যদি দেশের হইতাম, তবে দেশও আমার হইত। আমি যদি প্রকৃতির হইতাম, তাহা হইলে প্রকৃতিও আমার হইত! কিন্তু হায়, তাহা ত হইল না! কই, পারি কই? অনিমেষ নয়নে ঐ চাঁদতলা, নক্ষত্র ভরা আকাশের পানে, ঐ অতুল শোভা-ভরা বাগানের পানে চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে পারি কই? কই, তোমাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে দিবানিশি আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারি কই? কই, দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া করিয়া আমিত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি কই? পারি নাই, আমাকে ডুবাইতে, আমি পারি নাই। পারি নাই, বলিয়াই পাই

নাই। আমি ভালবাসা-শূন্য, স্নেহ-শূন্য, ভক্তিশূন্য—তাই এ জীবন-সাহারায় একাকী। বড়ই দুর্দিন উপস্থিত। আমারও যে দশা, তোমারও সেই দশা, সমাজেরও সেই দশা। আমিও আপন মহত্ব ভুলিয়া অন্যের মহত্বের পূজা করিতে পারি না; এ যে পোড়া সমাজে, পোড়া দেশে জন্ম লইয়াছি, এ সমাজে, এদেশেও সে আদর্শ পাই না। নিরাশার গভীর চতুর্দিক। আদর্শ সমাজও পাই না, আদর্শ মানুষও পাই না। আমি করি কি, আমি করি কি!

হিন্দুসমাজ, মুসলমান সমাজ, খ্রীষ্ট সমাজ,—সব নাস্তিক—কারণ অতি অল্প সমাজেই আদর্শ পরিবার আছে। সব সমাজেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। আদর্শের মূল কোথায়? আদর্শ স্বরূপা মা যে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হন নাই,—সে পরিবার আদর্শ নয়। যেখানে মা—যেখানে বিভিন্ন পথাবলম্বী ভাই ভগ্নী সব একীভূত—সব মিলিত, সেই আদর্শ-পরিবার। কিন্তু সে স্বর্গের চিত্র এ হতভাগ্য দেশে নাই। হিন্দুর ঈশ্বর যেন মরিয়া গিয়াছেন, —তাই হিন্দু সমাজের অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! ধর্ম্মের নামে নাস্তিকতা, কপটতা, প্রবঞ্চনা প্রশ্রয় পাইতেছে;—মেকি টাকা বাজারে বাজারে চলিয়া যাইতেছে। যাদের এক বিন্দু ধর্ম্মে মতি নাই, এক বিন্দু ভালবাসা নাই, পাষাণ দিয়া যাহারা হৃদয় বাঁধিয়াছে, পরনিন্দা প্রচার যাদের ব্যবসা, তাহারাই আজ হিন্দুধর্ম্মের পাণ্ডাগিরি করিতেছে! মুসলমানের মহম্মদ ও আল্লা বিস্মৃতিতে ডুবিয়াছে;—তাই সে সমাজে কেবলই কাটাকাটি রক্তারক্তি চলিতেছে! খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট আঁধারে মুখ ঢাকিয়াছেন, —তাই খ্রীষ্টানের বুকে বিনয়ের পরিবর্ত্তে কেবলই শোণিত-পিপাসা বাড়িতেছে! কি জানি কেন, এই ভারতে ধর্ম্ম এখন একটা পোষাকের মত হইয়া উঠিয়াছে। তারপর হিন্দুর, মুসলমানের ও খ্রীষ্টানের ঘনীভূত হইয়াছে যে পবিত্র(?) ধর্ম্মসমাজে, তাহারও শোচনীয় অবস্থা দেখ। দশ জন লোক, এক মুঠ লোক, কেহ কারও মুখ দেখিবে না। একের মহত্ব অপরের অসহ্য, একের ঐশ্বর্য্য অপরের চক্ষের শূল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান;—আপন ব্যক্তিত্ব লইয়া ব্যতিব্যস্ত। বরং বাহিরের লোকের প্রশংসা করিব, তবুও ভিতরের লোকের গুণ স্মরণ করিব না। কেশবচন্দ্রের জন্ম স্মরণার্থ সভা করিব না, বরং খ্রীষ্টের জন্ম করিব;—কত উদারতা! এখানে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর নামে প্রভুত্ব, একাধিপত্যই বিস্তৃত হইতেছে। তাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, কেহ

তাহাকে দেখে না, কেহ তাহার সহিত কথা কহে না, কেহ তাহাকে বলে না। আপনি উঠিয়া আপনিই বসে। কেহ তাহাকে কোন দেয় না। আপনার পায়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ কখন চলিতে পারে? অন্যের সাহায্য ভিন্ন কে অগ্রসর হইতে পারে? সংসারের পথে কেহ পারে না, ধর্মপথেও পারে না। এই উভয় পথেই পরস্পরের সাহায্য চাই। সাহায্য ভিন্ন জ্ঞানী, প্রেমিক, কর্মী, এ কিছুই হওয়া যায় না। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম ভিন্ন বিশ্বাসও পাওয়া যায় না;—এ সকলের অভাবে বিশ্বাস কল্পনায় পরিণত থাকে। পথই এই। প্রকৃতিই পথ। প্রকৃতির সাহায্য পদে পদে চাই। লোকের সাহায্য, লোকের পদে পদে চাই। লোকের মহত্ত্ব স্মরণ না করিলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না।* চাই না?—বিনয় ও বিশ্বাসের পূর্ণ বিকাশ খ্রীষ্টের সাহায্য ভিন্ন কে বিনয়ী হইতে পারে? প্রেম-শিরোমণি চৈতন্যের সাহায্য ভিন্ন কে প্রেমিক হইতে পারে? ইঁহাদের জীবন মানবের অনন্ত শুভ উদ্দেশ্য ছিল। মিল, কাণ্ট, বেকন, ডারউইন, হক্সলী, স্পেন্সর—এ সকলের অভ্যুদয়ে জগতের মহা উপকার হইয়াছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ, মিল্টন, শেলি, কীটস—এ সকলের দ্বারাও উপকার হইয়াছে। পৃথিবীর সকলের দ্বারাই সকলের উপকার হইতেছে। সকলেই কি শিল্পী হইতে পারে? সকলেই কি কবি হইতে পারে? সকলেই কি দার্শনিক হইতে পারে?—না, তা নয়। একজন যাহা, অপরে তাহা হইতেই পারে না। যে আমেরিকায় যাইবে, তাহাকে কলম্বসের নিকট কৃতজ্ঞতা-কর দিতেই হইবে। যে বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হইতে চাহিবে, তাহাকে খ্রীষ্ট ও চৈতন্যের নিকট মস্তক অবনত করিতেই হইবে। এক একজন মহাপুরুষ এক এক পথ আবিষ্কারের জন্য জন্মেন, অথবা এক এক বিভাগের পূর্ণ বিকাশ, বা সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ—এক একজন। মহাপুরুষ? ভুলিও না। মহাপুরুষ সকলেই। আপন আপন বিশেষত্বে সকলেই মহাপুরুষ। কিন্তু এক বিষয়ের বড় ছোট গণনা করা যায়। সকল শিল্পীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সকল কবির মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি,—ইহা বলা যায়। সকলেই কিন্তু কাপড় কাচিবে না, সুতরাং ধোপার আদর থাকিবে। সকলেই কবিতা লিখিবে না, সুতরাং কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবির আদর থাকিবে। সকলেই

* "He is himself made higher by doing reverence to what is really above him."—*Carlyle.*

বর্দ্ধিত হইবে না, সুতরাং খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ, মহম্মদ এবং চৈতন্যের আদর থাকিবে। সকলেই বিজ্ঞানের চর্চা করিয়া মাথা ঘুরাইবে না, সুতরাং নিউটন এবং ডিকেন্সের আদর থাকিবে। এক এক বিভাগের আদর্শ এক একজন। কেহ প্রেমের অবতার, কেহ জ্ঞানের অবতার। এক এক বিষয়ের পূর্ণ বিকাশ এক এক জন। যত বিভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকল বিভাগের একজন আদর্শ মহাপুরুষ—অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত লোকের অভ্যুত্থান হইতে পারে, এবং জগতে তাহা হইয়াছে। তাঁহারাই আদর্শ। আদর্শ কিন্তু সকলে সব বিষয়ে হইতে পারেন না। এক এক বিষয়ে এক এক জন আদর্শ। আদর্শ পুরুষের অভ্যুত্থান এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়ম-বহির্ভূত নয়। এক কাজ করিতে করিতে, এক পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একজন সকলের উপরে উঠিয়া গেল। পৃথিবীর কথাই বলিতেছি। এক এক পথ অনুসরণ করে—কত শত সহস্র লোক। কিন্তু সেই পথে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এক জন। অনেকে নৌকা পথে চলিয়াছে, কিন্তু সকলেই আমেরিকা আবিষ্কার করে নাই। কত জন কতবার আতা-পতন দেখিয়াছে, কিন্তু সকলে কিছু মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যাহা তুমি আমি প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি, প্রত্যহ দেখি, তাহার ভিতর হইতেও কবি কত কি বাহির করেন। এক এক সময়ে সমাজে এক এক প্রকার বায়ু (atmosphere) প্রস্তুত হয়, সেই বায়ুতে ডুবিয়া মজিয়া এক এক জন মহাপুরুষ ভুষ করিয়া, কার ইঙ্গিতে যেন জাগিয়া উঠেন। দেশের অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। এক এক জনের দ্বারা এক একটি সত্যের দ্বার খুলিয়া যায়। ইহাকেই অবতার বলে। বায়ু প্রস্তুত হইলেই মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইবে। সেই বায়ু—অভাব মূলক। অভাব, অভাব, কেবল অভাব—এই রূপ বায়ু যখন উঠে—তখনই কোন খ্রীষ্ট, কোন বুদ্ধ, কোন মাটসিনি, বা কোন গ্যারিবল্ডির অভ্যুত্থান হয়।* ইহাদিগের মহত্বকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা সৃষ্টি-বিধানের নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝে না। যাহারা মহতের মহত্ব বুঝে না, তাহারা অতি নীচ।† কেবল বুঝিলেও কিছু হয় না। মহত্বকে জীবনগত করা চাই। যাহারা তাহা না পারে, তাহাদের পতনের দ্বার উন্মুক্ত

* "Nature, when she adds difficulty, adds brain."—*Emerson.*

† "No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men."—*Carlyle.*

অভাব হইতেই প্রকৃতি,—প্রকৃতি থাকিলেই অভাব আছে। প্রকৃতি ত আর পূর্ণ নয়। অভাব ছিল বলিয়াই তাহা পূরণের জন্য জগতের নানা বিভাগে মহাপুরুষগণের উৎপত্তি। যাহা কিছু এই জগতে আছে, সকলই কোন না কোন অভাব পূরণের জন্য বা কোন সত্য আবিষ্কারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেই জন্য, সকলেই কিছু কিছু বিশেষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এক বিষয়ে সকলেই আদর্শ নয়। খ্রীষ্ট জগতে একজন, বুদ্ধ একজন, ম্যাটসিনি একজন। যে অভাব-বায়ুতে ইঁহাদের জন্ম, সে অভাব-বায়ু আর প্রবাহিত হইবে না, সুতরাং তাঁহাদের ন্যায় লোকের আর অভ্যুত্থান হইবে না। অভ্যুত্থান হইবে যাহার—সে নূতন। নূতন যুগে, নূতন আদর্শ জগতের জন্য প্রতি মুহূর্তে চাই। অভাব নিত্য নূতন, প্রকৃতিও নিত্য নূতন। সেই জন্যই দিনে দিনে, যুগে যুগে নূতন মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইতেছে। তাঁহারা কে বড়, কে ছোট, সে বিচার চলে না। এক বিভাগের লোকদের মধ্যে কেবল তুলনা চলে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের লোকের মধ্যে তুলনা অসম্ভব। এই যে দুর্ভিক্ষ, এই যে অভাব-সাগর, এই যে প্রেমহীনতা, এই যে অকূল পাথার সম্মুখে এবং পশ্চাতে—ইহার ভিতর হইতেও নূতন মহাপূর্ণ বীরের অভ্যুত্থান হইবে। আদর্শ ভিন্ন মানুষ টিকিতে পারে না। আদর্শ চাইই। আদর্শ প্রেম চাই, আদর্শ ভালবাসা চাই, আদর্শ মানুষ চাই। এমন আদর্শ সম্মুখে থাকা চাই, আমি যখন প্রলোভন এবং পাপে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, তখন যে আমাকে তুলিতে পারে,—যাকে আশ্রয় করিয়া, যার মুখের দিকে চাহিয়া রক্ষা পাইতে পারি। একই বিষয়ে আমাদের চেয়ে যে উন্নত, সে বিষয়ে সেই আমার আদর্শ। পূর্ণ আদর্শ অসম্ভব। কিন্তু মাকে বলিবার কিছু, এই অনন্ত প্রকৃতি। সন্তানকে বলিলে মাকে পাওয়া যায়, আবার মাকে দেখিলে সন্তান আপনার ভাই হয়। মা ভিন্ন ভ্রাতৃমিলন অসম্ভব। প্রকৃতি-মিলন ভিন্নও ভ্রাতৃ-মিলন অসম্ভব। মিলন চাইই। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সকলেই সকলের আদর্শ। সুতরাং মিলন চাইই। মিলনের জন্য আদর্শ ধরা—চাইই। এক সময়ে যার পক্ষে তাই সহায়, অন্য সময়ে, মা প্রকৃতির সহিত মিলনের সহায়। তত্ত্ব প্রকৃতি, নয় মা। একজনকে চাইই। মা ও প্রকৃতিকে যদি আদর্শরূপে মানুষ না ধরিতে পারে, তবে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আদর্শ যখন সম্মুখ-স্থাপিত, তখনই মানুষের পতন। এই

কথায় বলবে সবক যযাতি বাক্য দিতে বিচারাম। এবং সৎসর্গে স্বর্গ, অসৎ সংসর্গে নরক, এটী একটী প্রাচীন কথা। আদর্শ না পাইলে মানুষের পতন অনিবার্য্য। এই দুর্দিনে আদর্শ মানুষের একান্ত অভাব। অথবা আদর্শ বুঝিতে পারে, এমন লোকের আরো অভাব। তাই সমাজের এত দুর্দশা। ঈশ্বর-গত-প্রাণ মানুষ দেখি না। সমাজের বড়ই অভাব। অভাবের সাগর উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহার ভিতর হইতে যে আবার কোন আদর্শ পুরুষের অভ্যুত্থান হইবে না, কে বলিতে পারে? ইতিহাস পাঠ বৃথাই হইবে, যদি বর্ত্তমান শতাব্দীর দূষিত বায়ু পরিশোধনের জন্ত আবার নব আদর্শ অভ্যুত্থিত না হয়।

কিন্তু আমি এখন করি কি? আদর্শ মানুষের বরন সৃষ্টি হইবে, তখন হইবে, আমি এখন করি কি,—এখন করি কি? যে প্রেম সাগরে ডুবিলে মানুষ হওয়া যায়, সে সাগরে ডুবিতে পারি না, কারণ আমার প্রকৃতি-সাধন হয় নাই। আদর্শ বন্ধু নাই, আদর্শ গুরু নাই, আদর্শ ভাই নাই, আদর্শ ভগ্নী নাই। সঙ্গাই নাই। যা আছে, তাতে আমার দিন চলে না। আদর্শ স্ত্রী নাই, আদর্শ পুত্র নাই—আমার গভীর ভালবাসার সে সব কিছুই নাই। অথবা আমি কাহারও ভিতরের আদর্শ চিত্র ধরিতে পারিতেছি না। এই সমস্ত দৃষ্টিকে আমি অকূল পাথার করিয়া তুলিয়াছি। সকল থাকিতেও আমার যেন কেহ নাই—আমি কাহারও মহত্ব বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যখন কারও নই, তখন কে আর আমার হইবে? একাকী আসিয়াছি—একাকীই অকূল পাথারে পড়িয়া কাঁদিতেছি। কই—সে ভালবাসা কই,—যার জন্ত ধন প্রাণ মান সকল ডুবাইতে পারি? কই, সে প্রেম কই—যার জন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিতে পারি? প্রেম অনন্তের পথ দেখায় কই?—সে অনন্ত কই? ডুবিতে ডুবিতে আরো ডুবি কই?—মজিতে মজিতে আরো মজি কই? আমিত ডুবে না ও সমস্ত ঘুচে না, স্বার্থ মিটে না। তবে আর কি হইবে? দেখি, দেখি, দেখি,—আরো দেখি, আরো দেখি, আরো দেখি,—এমন করিয়া অনিমেষ নয়নে কাহাকেও ত দেখিতে চাই না। আমাকেও ত কেহ তেমন করিয়া দেখে না। শুনি শুনি, আরো শুনি, আরো শুনি—এমন করিয়া কই, আমি ত কাহারও সুধা-বিনিন্দিত মধুর কথা বা সঙ্গীত শুনিতে চাই না। দেখিতে দেখিতে, শুনিতে শুনিতে পাগল হই কই? আকাশের চাঁদ, বাগানের ফুল, ফুলের

দুর্বলা, পাদাহত জননী, অনাথা বধূদিগকে দেখিতে দেখিতে আহ্লাদ হয় কই ? অতের বসন ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয় কই ? তেমন কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনার স্বার্থ, সুখ, মান ভুলিয়া দিন কোটি ভ্রাতার মুখ মিলাইতে পারি কই ? আমি অহংবর্জিত হই কই ? তাহাতেই আমি জীবিত রহিয়াছি। তাই আমি আজ এমন একাকী অকূল পাথারে পড়িয়া কাঁদিতেছি। নচেৎ এই মন প্রাণ পূর্ণ করা আমার হইত, তাই জগৎ সকল আমাকেই ধরিয়া রাখিত, আমার মরণ হইত। আমি যখন কাহারও নিকট ধরা দেই নাই,—আমাকে যখন আমি বিক্রয় করিতে পারি নাই, তখন নিরাশ ক্রন্দন আমার চির সম্বল। আমি আর কিছু আশা করিতে পারি না। কেহ আমার হাতে আসিত না; আমি একাকী এই পাথারে পড়িয়া কাঁদি। আমি যখন মরণের পরিবর্তে সুখ-বাসা কোন দিতে পারি নাই—হিংসার হিংসা, স্বার্থে স্বার্থ, মিথ্যার মিথ্যা দিয়াই যখন ব্যবসা চালাইয়াছি;—অপ্রেমের পরিবর্তে অপ্রেম দিয়াছি, প্রহারের বদলে প্রহার করিয়াছি, তখন আমার আর আশা কোথায় ? আমি যখন একটী প্রাণেরও অন্তস্পর্শ অনন্তে আত্ম মিশাইতে পারি নাই—তখন আমার কথা আর মুখে তুলিও না। প্রবঞ্চক, কপটী, প্রেম-কৃপণ হতভাগ্য ব্যক্তি-কে কেহ ছুঁইও না। মুখে ও ভিতরে যার দুইরূপ, তার পরিণামে আর কি হইবে ! এই অকূল সংসার-পাথারে ক্রন্দনই আমার সম্বল। তবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাই। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যাই। অনন্ত প্রেমসাধন, তা এই প্রেম-কৃপণের হইবে না। এই অনন্ত প্রকৃতি সাধনে এই হতভাগ্য সিদ্ধি পাইবে না। এই স্বাধীনতার যুগে আমি আত্ম হারাইয়া অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে ডুবিতে পারিব না। সুতরাং মাতৃদর্শন আমার কপালে নাই। অবিশ্বাসই আমার পরিণাম। অপ্রেমই আমার শ্মশানের সম্বল। অভক্তিই আমার চিতার আরাম। আমি কাঁদিতে আসিয়াছি—কাঁদিয়াই যাই। আমি মরিয়া যাইলে—তোমরা সকলে আমার শ্রাদ্ধের দিনে একবার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের বিশ্ববিজয়িনী (?) সঙ্গীত তুলিয়া আনন্দের ধ্বনি করিও। তাহাতেই আমার মুক্তি, এবং বৈকুণ্ঠ মিলিবে। হতভাগার পরিণাম আর কি হইবে ?